রাখিস মা রসেবশে

রাখিস মা রসেবশে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শিবরাণী প্রকাশনী

৮বি/২ টেমার লেন,

কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৬২

প্রকাশক
শিবরাণী প্রকাশনী
৮বি/২ টেমার লেন
কলকাতা — ৭০০০০৯

মুদ্রক
শ্রীবিকাশ দত্ত,
নিউ ভোলাগিরি প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

যাঁর কথা তাঁকেই দিলাম
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণকমলে

রাখিস মা রসেবশে

ডাণ্ডা বনাম ঠাণ্ডা

আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাবর্গ দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আবার আপনাদের সামনে নিজেকে নিবেদিত করছি। ইতিমধ্যেই রস অনেক মরে এসেছে। এখন কষ বেরচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, চুল উড়ু উড়ু, চোখে সরষে ফুল। একান্ন দিন উপবাসের পর যেমন চেহারা হওয়া উচিত। আখমাড়াই কলে বুদ্ধিজীবীর নিষ্পেষণ। এদেশে কী একটি কলই চলছে ? পেষাই কল। আরও একটি কলও মনে হয় সমান শক্তিতে চলেছে, সেটি গ্যাঁড়াকল।

কী মূর্খ আমরা। আমরা না কি বুদ্ধিজীবী। এটি কার সার্টিফিকেট ? নিজেকেই দেওয়া নিজের সার্টিফিকেট। সেদিন অ্যাকসান শেষ করে, গুগ্‌লু তার নিজের ডেরায় বসে, হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে হাসতে হাসতে দোস্তদের বলছিল, 'ওই তো বুদ্ধিজীবীদের আলুর মত, বেলের মত মাথা, আর এই তো আমার পাশে শুয়ে আছে লোহার রড। ফটাফট্‌ চালিয়ে দিলুম, এক ডজন ভস্‌কে গেল। কী যেন বলে গুরু ! পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড। বেঁচে থাক আমার ডাণ্ডা। দশ মিনিটে সব ঠাণ্ডা। গুগ্‌লুর চ্যালারা হ্যা হ্যা হেসে রাত কাঁপিয়ে দিল।' আর ঠিক সেই সময়ে দেশের মন্দিরে মন্দিরে আরত্তির শঙ্খঘণ্টা বাজছিল। ভক্তেরা চোখ বুজিয়ে মনে মনে বলছিলেন, 'মা আমার মঙ্গল করো, পরিবারের মঙ্গল করো।' এঁদের মধ্যে গুগ্‌লুর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীও ছিলেন। তাঁর নিমীলিত কামনা, 'মা একটি সুসন্তানের জননী করো।' দেশের ঘরে ঘরে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত চলেছে। মায়ের কোলের কাছে বসে শিশু দুলে দুলে পড়ছে। সেই সাবেক কালের শিক্ষা। সেই নীতিহীন মূর্খ মানুষদের হাতে তৈরি শিক্ষাদান পদ্ধতি। যাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞানের অবাস্তব সব কথাবার্তা বলতেন। মানুষের মধ্যে দেবভাবাপন্ন মানবাত্মার অনুসন্ধান করতেন।

দেবতা আবার কী জিনিস গুরু ? এক ডাণ্ডায় যে জিনিস রাস্তায় শুয়ে পড়ে দোআনি খোঁজে তার মধ্যে দেবতা ? গুগ্‌লুর খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি। শোনও বন্ধুগণ, লেখাপড়া করিব মরিব দুঃখে, মানুষ মারিব খাইব সুখে।

পাওয়ার মানে কী—শক্তি। শক্তি মানে কী—'মাসল্‌স' আর মার। বিদেশে

হলে পেশীর প্রয়োজন ছিল। সে দেশের দেবতা অরণ্যদেব। এ দেশে পেশীর প্রয়োজন নেই। অন্তত এখনও নেই। পরে কী হবে কে জানে ? নিরীহ বাঙালী এখনও চোখ বুজিয়ে মন্দিরের সামনে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দকে এখনও ভুলতে পারেনি। দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে, কালীঘাটে, অন্যান্য তীর্থস্থানে মানুষ কাতারে কাতারে ছুটে যায়। শিশুটিকে মানুষ করার সময় রবীন্দ্র, বঙ্কিম, সুভাষ, সি· আর· দাশ, রাসেল, আইনস্টাইন, রাদারফোর্ডের কথাই মনে পড়ে। কখনও বলতে ইচ্ছে করে না, ওরে তুই গুগ্‌লু হ। এমন কী গুগ্‌লুর স্ত্রীও তাঁর ছেলেকে বলেন না। অতএব এই ভেতো বাঙালীকে দাবিয়ে রাখার জন্যে স্যাণ্ডো আর ভীমভবানী হবার প্রয়োজন নেই। তার জন্যে আবার সাবেক প্রথায় সাধনার প্রয়োজন। এখন একটা ডাণ্ডা আর কাঁচা খিস্তিই যথেষ্ট। ওই পাওয়ারেই সব থমকে যাবে।

ভয় নেই 'গুগ্‌লু-রাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। প্রচার মাধ্যমকে আর একটু পাওয়ারফুল করা দরকার। প্রচারের জন্যে অবশ্য প্রেস চাই। লেখা পড়া জানা লোকেরও প্রয়োজন হবে। ডাণ্ডায় মাথা ভাঙ্গা যায়, লেখার জন্যে চাই কলম। সে কলম আবার ধরতে শিখতে হবে। ডাণ্ডাধরা হাত থেকে কলম যে কেঁপে পড়ে যাবে। শুধু অশালীন ভাষা আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে ইমেজ তৈরি হলেও, ভাষায় ধরে রাখতে না পারলে ভেঙ্গে পড়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। পর্নোগ্রাফির জন্যেও ভাষা চাই, অক্ষরজ্ঞান চাই, প্রেস চাই। কী হবে গুগ্‌লু! এ সমস্যার কী সমাধান ?

আর এক সমস্যা এই মাটিতে যাঁরা আগে এসে, আগে চলে গেছেন, যেমন, ধরো রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, তাঁরা যে একটা শক্ত ঐতিহ্য তৈরি করে রেখে গেছেন, সেই ঐতিহ্যকে তোমার ওই চোলাই মারা মুখের কাঁচা ভাষা, আর তোমার ওই মানুষমারা হাতে ধরা খেঁটে লাঠিতে ভেঙে ফেলা যাবে না যে মানিক। অনেকেই চেষ্টা করেছিল ফেল করেছে গুরু। বিদেশী রণাঙ্গনে সর্বাধুনিক সমরসজ্জা নিয়ে পশুশক্তি মানুষের দেবতাকে হত্যা করতে এসে নিজেই প্রাণ হারিয়েছে। গুগ্‌লু ইতিহাস অবশ্য তোমার সাবজেক্ট নয়। তুমি তো কাল কা যোগী। কোমরে বাঁধা পাওয়ারের পাইপলাইন। টান পড়লে নাচো, আলগা হলে চোখ উলটে পড়ে থাক। দুটো কী দুশো মানুষের গলা টেপা যায় ; কিন্তু যুগযুগ ধরে লক্ষলক্ষ মানুষের জীবন দিয়ে গড়া, ন্যায়, নিষ্ঠা, নীতি, সত্যের মূর্তিকে কী ভাবে হত্যা করবে ? সে যে অমর।

তবে হতাশ হয়ো না। সাধনায় কী না হয়! হরবোলা দেখেছ তো! সবরকম



ডাকই ডাকতে পারে। আর কাজটা যখন গড়ার নয় ভাঙার, স্তব্ধ করার, কণ্ঠরোধ করার তখন পারলেও পারতে পার। উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবার ব্যাপারে বাঙালীর বেশ প্রতিভা আছে। গুগলু, তোমার মনে নেই, অথবা তুমি তখন মায়ের কোল আলো করে জন্মাওনি, নবদ্বীপ হালদার ছিলেন নাম করা কমেডিয়ান। তাঁর একটা গান ছিল, 'লাগ লাগ লাগ লাগিয়ে বসে আছি'। নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে এই গানটি গাইতে হয়। যদি পাবা যায়, সব দিকে আগুন লাগাও। প্রভুর আশীর্বাদে সবই সম্ভব। শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি, লাগাও আগুন। সংবাদ মাধ্যম! দাও টুঁটি টিপে। কৃষি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, যানবাহন! দাও বন্ধ করে। সব স্তব্ধ! চারপাশ সুনসান। বসে থাকো প্রেতের মত।

তারপর, তোমারই পুত্র যখন জিজ্ঞেস করবে, বাবা, তুমি কী করেছ?

খিস্তি করে বলবে, কেন ? তোর জন্ম দিয়েছি।

তারপর ?

নিরস্ত্র সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধকে ইট মেরে থেঁতো করেছি।

তারপর ?

সারাদিন পথের ধারে লোহার রড ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছি শিকারের আশায়

তুমি শিকারী, না ব্যাধ ?

আমি হেড হাণ্টার। যে সব মাথায় এখনও অল্পবিস্তর শুভবুদ্ধি আছে, সেইসব মাথায় ডাণ্ডা মারাই আমার পেশা।

এর পরিণাম ?

ওই যে, লাগ, লাগ, লাগ, লাগিয়ে বসে আছি।

ডাণ্ডার শক্তি বেশি না কলমের শক্তি বেশি, এই পরীক্ষায় যে রস ঝরছে তার রঙ লাল।

সোডার বোতল, অ্যাসিডবাল্‌ব আর থান ইট সময়কে স্তব্ধ করতে পারেনি। সময়কে পেছনো যায় না। সময়ের ধর্মই হল এগিয়ে চলা। সত্যের ধর্মই হল প্রকাশিত হওয়া। যত রক্তই ঝরুক শুভচেতনার ধমনী রক্তশূন্য হবে না। যে পতাকা ডাণ্ডায় ওড়ে না, মানুষের মনে ওড়ে, তা কোনও সময়েই নামানো যায় না।

গুণ্ডুলুস্তানের স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন হয়েই থাক। রাত যত গভীরই হোক ভোর তো হবেই। সূর্যকে তো ঝাণ্ডার ডাণ্ডা দিয়ে পশ্চিম আকাশে দাবিয়ে রাখা যায় না। দুর্ভাগ্য ! কে পড়বে ! তাহলে গল্পটা বলি। চোখের ডাক্তার একের পর এক কাঁচ পাল্টাচ্ছেন আর জিজ্ঞেস করছেন, কী এবার পড়তে পারছেন ? এবার স্পষ্ট ? 'না।' সে কী মশাই ! শেষে জানা গেল রুগী পড়তেই জানে না। স্বামীজীর দুটি লাইন দিয়ে শেষ করি, '**Once more the doors have opened. Enter ye into the realms of light, the gates have been opened wide once more.**

তালি বাজাও

কী চাই ? অর্থ। প্রথমে তাই চেয়েছিলাম। এখন আর চাই না। অর্থ দিয়ে সুখ আর শান্তি কেনা যায় না। জীবনেব সার সত্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে বহুকাল আগে বলা হয়ে গেছে :

যাবদ্ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বতং হি দেহিনাম।
অধিকং যোঽভিমন্যতে স স্তেন দণ্ডমর্হতি ॥

ঠিক সেইটুকুই চাইবে যাতে তোমার নিজের ভরণপোষণ চলে যায়। সেই পবিমাণ অর্থেই দেহধাবীর ন্যায্যে অধিকার। তার বেশি যে চাওয়া এবং পাওয়া তা একপ্রকার চৌর্যাপবাধ, দণ্ডনীষ তো বটেই। ভাগবতকার কী মার্কস পড়েছিলেন ?

আর কী চাও তাহলে ? যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ? বড় গুরুপাক বস্তু। সহজে হজম করা যায় না। ধরে রাখার জন্যে অনেক ডন বৈঠক মারতে হয়। হজমী গুলি খেতে হয়। জ্ঞানী মানুষ বলেছেন,

প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা।

তাহলে কী চাও তুমি ? শান্তি। খাই না খাই একটু শান্তি চাই। শান্তি ? শান্তি পাবে কোথায় ? আধুনিক সভ্যতা কলের গাড়ি দেবে, পাখার বাতাস দেবে, কলের জল দেবে, টিনের দুধ দেবে, কলের গান দেবে, চিতার বদলে বৈদ্যুতিক চুল্লী দেবে। দেবে না শান্তি। ঘিনঘিনে অশান্তিতে জীবন ছেয়ে যাবে।

তবু এসেছি যখন তখন মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ কাবাবাস সহ্য করতেই হবে। কী ভাবে ? স্বামী সত্যানন্দ বলছেন, 'যার কোন সুখ বোধ নেই তার কখনও দুঃখ হয় না। তাই সর্বাবস্থায় সুখের অন্বেষণ কোরো না, তা'হলে তোমার দুঃখও আসবে না।'

প্রত্যাশাই হতাশার দরজা খুলে দেয়।

যেমন রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে খেঁটেধারী জনাদশেক আমারই জাতভাই আমাকে ধরে পেটাচ্ছে। তিন হাত দূরে পুলিশ। ফুলিশ আমি পুলিশ পুলিশ

বলে চিৎকার করছি। তিনি নিমীলিত নয়নে আমার দিকে একবার শুধু কৃপা-দৃষ্টি দিলেন। যার অর্থ হয়তো, কী রে পাগলা, তোর আড়ংধোলাই হচ্ছে। আহা, বাছা আমার! তা ব্রেশ ব্রেশ ব্রেশ। স্বজাতির স্নেহে নিমেষে আমার জিওগ্রাফি পালটে গেল। তালিমারা আমি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ফোলা ঠোঁট অভিমানে আরও ফোলাচ্ছি, এর নাম প্রশাসন, এর নাম আইনকানুন! এই আমি শহরে বাস করছি! এই হল গণতন্ত্র!

অভিমানের চশমা পরে জগৎ দেখলে প্রকৃত জগৎকে কী দেখা যায়! যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁরা বলবেন, 'তুমি তো আচ্ছা গবেট হে! গণতন্ত্র-মনতন্ত্র বলে কী সোরগোল তুলেছ!'

'কেন এই যে বলে, **For the people, of the people, by the people.**'

'ওটা তুমি শুনেছ। লেখাটা পড়েছ? লেখা আছে **Far the people, off the people, buy the people.** তার মানে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে। অনেক দূরে, একটা বাড়ি। সেই বাড়িতে অনেক চেয়ার। সেই চেয়ারে বিভিন্ন বিশ্বাস আর মতবাদের একদল মানুষ। তাঁরা তোমাব সঙ্গে একই বাসে বা ট্রামে বা ট্রেনে গুঁতোগুঁতি করে, হাঁচরপাঁচর করে অফিসে ছোটেন না। তোমার মত মাসের শেষে ব্যাগ উল্টে, চোখ কপালে তুলে শিবনেত্র হয়ে মাসপয়লার অপেক্ষায় বসে থাকেন না। এগার সেমি বৃষ্টিতে হাবুডুবু শহরে, স্ত্রীপুত্র পরিবারের হাত ধরে ডাঙ্গায় এসে লঙ্গরখানার খিচুড়ির অপেক্ষায় তাল





তোবড়ানো সানকি পেতে রক্তরাঙা চোখে দিনের পর দিন বসে থাকেন না। অসুস্থ হলে হাসপাতালের আউটডোরে এসে কোঁত পাড়েন না। তোমার সঙ্গে একই বাজারে থলে হাতে বিড়বিড় করেন না। পটল একশো গ্রাম, উচ্ছে পঁচিশ গ্রাম, আলু পাঁচশো না এক কেজি! সপরিবারে সকালের বাজারে গিয়ে মৎস্যদর্শন করেন না। ওই দ্যাখ ছোট খোকা রুই। হ্যাঁগা ভেরির ট্যাংরার চেকনাই দেখে রাখো। কাটোয়ার ডাঁটা দিয়ে ভাত মারার সময় মনে পড়ে যেন। তাঁদের চেহারা তুমি কাগজে আর টিভির পর্দা ছাড়া কোথাও দেখতে পাবে না। কেউ তোমার রকে এসে বসবেন না। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে যদি কোনও দিন দেখা করতে যাও, দেখবে চোখ কাকে বলে! মুখের সে কী গাম্ভীর্য। গলায় মেঘের গর্জন। এ তোমার সেই ভোটের আগের চেহারা নয়। সেবা করার সুযোগ দিন। আমরা আনিব নতুন প্রভাত। শুনেছিলে। সে প্রভাত আর আসেনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোজ নিজেকেই বলো সুপ্রভাত।

Off the people, তফাৎ যাও ভেইয়া। ওই যে পিলিপিলি করে পিপীলিকার স্রোত চলেছে, ওই স্রোতে গা ভাসাও। আমাদের স্নেহসম্ভাষণ শোনার বাসনা! তবে জনসভায় এসো। শুনতে পাবে। হাওয়ায় হাত ঘুরিয়ে তোমাব জন্যে আমি চাঁদ ধরে আনবো। আর **Buy the people**. কিছু মানুষকে কিনে ফেলতে হবে। একা কীর্তন জমে না। দোহার চাই। রাধার অন্তরে কী ব্যথা, বলে কীর্তনীয়া ছেড়ে দিলেন, দোহার খপ করে ধরে নেবে। ঢুলে ঢুলে, দুলে দুলে বলবে, অন্তরে কী ব্যথা, ওরে রাধার অন্তরে কী ব্যথা!

স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, রাষ্ট্রের কর্ণধার, আইনের প্রতিনিধি, কোনও দিক থেকেই কোনও প্রত্যাশা রেখো না। নিজের দুটি পায়ের ওপর নিজের দুটি কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস কোরো না। এ কথা সেই কথামালার ভাল্লুকও বলে গিয়েছিল।

দুই প্রাণের বন্ধু অরণ্যের পথ ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল দূরে একটা ভাল্লুক আসছে। দুই বন্ধুর এক বন্ধু তড়াক করে একটা গাছে উঠে পড়ল। আর এক বন্ধু গাছে উঠতে জানে না। কোনও উপায় না দেখে সে মড়ার মত পথেই শুয়ে রইল। হেলতে দুলতে ভাল্লুক এল। পথে শুয়ে থাকা মানুষটিকে বারকতক শুঁকে চলে গেল। ভাল্লুক জ্যান্ত শিকার ছাড়া স্পর্শ করে না। সে ভাবলে এ তো মরেই গেছে। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে না যখন। ভাল্লুক চলে যাবার পর অপর বন্ধু গাছ থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'ভাল্লুক কী তোমাকে কিছু বলে গেল?'

'হ্যাঁ ভাই বলে গেল। বলে গেল, বিপদের সময় যে তোমাকে ছেড়ে পালায়, সে তোমার বন্ধু নয়। তাকে কোনও দিন বন্ধু বলে বিশ্বাস কোরো না।'

আমরা এখন যে কালে বাস করছি, সে কালে ওই ভাল্লুকের নীতিবাক্য মেনে না চললে হতাশা আরও বাড়বে। এ হল যে যার আখের বানাবার কাল। নিজেদের ভবিষ্যৎ চুলোয় যাক। দেশ গোল্লায় যাক। সেই গল্পটি মনে পড়ছে : সোরেন কিরকেগার্ডের বিখ্যাত একটি প্যারেবল বা নীতি গল্প। আধুনিক কালকে যাঁরা হুঁশিয়ার করতে চান তাঁদের কী হয়!

রঙ্গমঞ্চের পেছন দিকে আগুন লেগে গেছে। ক্লাউন মঞ্চে বেরিয়ে এসে দর্শকদের বলছে আগুন লেগে গেছে। সকলে ভাবলে, বাঃ এ বুঝি আর এক ধরনের তামাশা। তারা খুব হাততালি দিতে লাগল। ক্লাউন আবার বললে, আরে মশাই আগুন লেগেছে। দর্শকরা আরও জোরে বাহবা বাহবা করে উঠল। পৃথিবী এই ভাবেই একদিন শেষ হয়ে যাবে, আর সকলে বিরাট কোনো তামাশা ভেবে অনবরত তালি বাজিয়ে যাবে।

বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে

মহাশয়, দ্বাদশটি সমজাতীয় প্রাণী ভূপাতিত অনুরূপ একটি প্রাণীর নিম্নোদরে অমন পর্যায়ক্রমে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে কেন ? ইহা কী জাতীয় নৃত্য ? ভরতনাট্যম অথবা কত্থক কিম্বা কুচিপুড়ি। ইহা স্বপ্ন না বাস্তব ?

বৈদান্তিক : মহাশয়, উষাকালে মনুষ্যজাতীয় প্রাণী বিংশ শতকের শেষপাদে এরূপ বিজাতীয় আচরণ কেন করিবেন ? আমার মনে হয়, ইহা স্বপ্ন, অথবা মায়া। আমাদের উভয়েরই চক্ষুদ্বয়ে শেষ প্রহরের স্বপ্নের ঘোর লাগিয়া আছে। কাপদ্বয় উষ্ণ চা নামীয় পানীয় উদরে প্রবেশ না করিলে এ ঘোর কাটিবে না।

মহাশয়, আমাদের হস্তধৃত এই লৌহজালিকা ও ক্ষুদ্র বংশদণ্ড ইহারাও কী মায়া ?

বৈদান্তিক : বৎস, চক্ষু উন্মীলন করিয়া নিয়ত আমরা যাহা দেখি সবই মায়া। আমরাও নাই, উহারাও নাই। চক্ষুদ্বয় মুদিত কর। দেখ সবই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মহাশয়, প্রাণীটি যেরূপ চিৎকার পাড়িতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে মরিয়া না যায় !

বৈদান্তিক : বাতুল, তোমাকে আমি এতাবৎ যাহা যাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছি তাহা সবই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তুমি উন্নত মনুষ্য না হইয়া ক্রমে ক্রমে নিকৃষ্ট গর্দভে পরিণত হইতেছ। এ জগতে মাসান্তিক বেতন ছাড়া সবই মায়া।

মহাশয়, যাহারা আইনশৃঙ্খলা অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া অষ্টপ্রহর হরিনাম সঙ্কীর্তন করিতেছে তাহারাও কী আমার ন্যায় গর্দভ ?

বৈদান্তিক : তুমি গর্দভ হইয়া স্বজাতিকে চিনিতে পারিতেছ না ? হায় ! এতকাল এই মূর্খকে আমি কী শিখাইলাম রে বাপ্। উহারা ক্ষীরিভূত গর্দভ। বৎস ! আইন কাহাকে বলে ?

মহাশয়, যাহা ভঙ্গ করা যায় তাহাই আইন।

বৈদান্তিক : উত্তম বলিয়াছ। যাহা ভঙ্গুর তাহার কোনও মূল্য আছে ?

না মহাশয় তাহার কোনও মূল্য নাই। যেমন মনুষ্যজীবন, ক্ষণভঙ্গুর। মারিলেই মরিয়া যায়।

বৈদান্তিক : তাহা হইলে তর্ক-শাস্ত্র কী প্রমাণ রাখিতেছে ? মনুষ্য ও মনুষ্যসৃষ্ট আইন উভয়ই মায়া। আছে ভাবিলে আছে। নাই ভাবিলে নাই। অস্তি আর নাস্তির খেলা।

মহাশয়, তাহা হইলে এ জগতে কী আছে ?

বৈদান্তিক : একটি মাত্র বস্তু বর্তমান, তাহা হইল হুকুম।

মহাশয়, হুকুম কাহাকে বলে ?

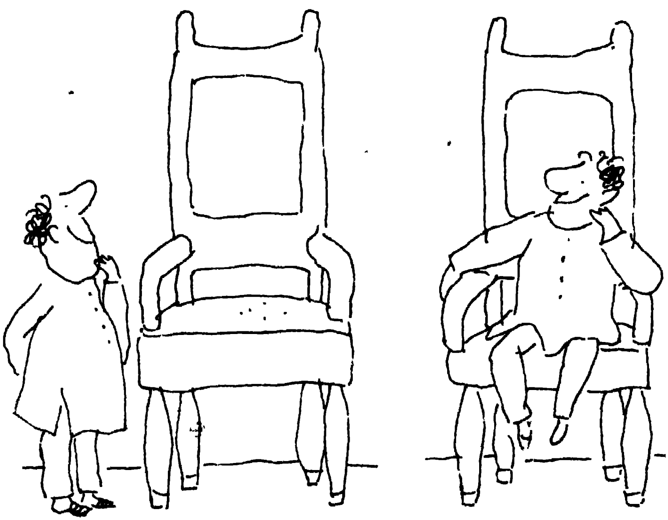
বৈদান্তিক : আসন হইতে উচ্চারিত প্রণবমন্ত্রের নাম হুকুম।

আসন তো নিষ্প্রাণবস্তু, তাহা কি রূপে হুকুম ছাড়িবে ?

বৈদান্তিক : গোবৎস ! আসন কখনও শূন্য হয় না। কেহ না কেহ আসীন থাকিবেই। বৃদ্ধ হইয়া মরিতে চলিলে এখনও ইহা বুঝিলে না !

আসনে আসীন হইবার উপায় আমার অবগত হইতে ইচ্ছা করে।

বৈদান্তিক : উহা রাজনীতির বিষয়, বেদান্তের নহে। তবে সাধারণ বুদ্ধি হইতে বলিতে পারি আসনে চড়িতে হয়। আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হয়, তাহার পর পড়িয়া যাইতে হয়। উত্থান ও পতন, পতন ও উত্থান, ইহাই হইল বিধির বিধান।



মহাশয়, ইনি কোন বিধি ? কোন্ মন্দিরে তাঁর অবস্থান ?

বৈদান্তিক : বৎস, তোমার ন্যায় বহু অজ একত্রিত হইয়া হয় গজ, সেই গজাননকে বাক্যের দ্বারা তুষ্ট করিয়া আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। তাহার পর বাহুবলে আসন রক্ষা করিতে হয়। বৎস ! দেবতা কাহাকে বলে ?

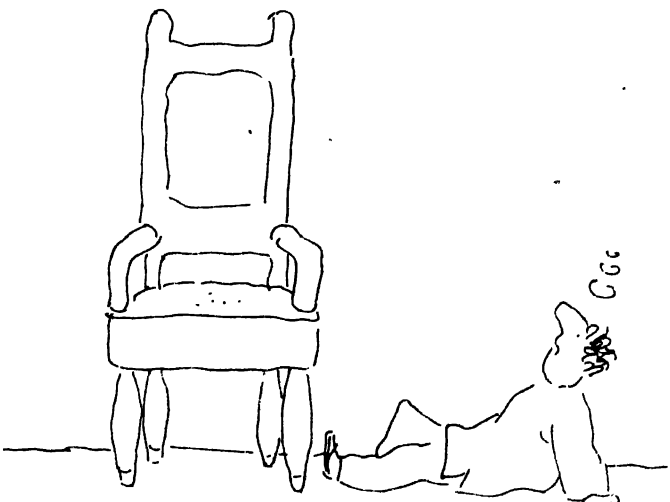
মহাশয়, বিপদে যাহাকে মনে পড়ে, অভীষ্ট লাভের জন্য যাঁহার স্মরণ মনন, অতঃপর যাঁহাকে আর ধুনা গঙ্গাজল দিবার কথা স্মরণে থাকে না, তিনিই দেবতা।

বৈদান্তিক : উত্তম বলিয়াছ। সব দেবতার ন্যায় গণদেবতারও অনুরূপ হাল হইলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। দেবতার বরাতে সাধারণত কাঁচা কদলিই জুটিয়া থাকে।

যাহাকে চলিত বাঙলায় কাঁচকলা বলা হইয়া থাকে ?

বৈদান্তিক : হাঁ বৎস। ইহাই আমাদের শাস্ত্রসম্মত পারলৌকিক আহার। পিণ্ড সহযোগে তিল ও কাঁচকলার মণ্ড। পুরোহিত আমাদের সন্তানকে বলিবেন, বলো, সোপকরণ পিণ্ডং অহং দদামি। চক্ষু মুদিত করিয়া কল্পনা করো, তোমার পিতৃদেব জ্যোতির্ময় শরীরে পিণ্ড ভক্ষণ করিতেছেন।

মহাশয় এই মুহূর্তে আমাদের শরীর হইতে জ্যোতি কী নির্গত হইতেছে ?



বৈদান্তিক : না, জ্যোতি নির্গত হইবে মৃত্যুর পর।

মহাশয়, এক্ষণে চক্ষু কী উন্মীলিত করিব ? মায়িক দৃশ্য কি অন্তর্হিত হইয়াছে ?

বৈদান্তিক : অগ্রে তুমি চক্ষু খুলিবে, না আমি খুলিব ?

উভয়ে একই সঙ্গে খুলিয়া দেখি মায়া অপসৃত হইয়াছে কী না ?

বৈদান্তিক : ওয়ান টু, থ্রি।

মহাশয়, উহারা ভূপাতিত ব্যক্তিটির কণ্ঠলগ্ন যে বাক্সটি ধরিয়া টানাটানি করিতেছে উহা কী বস্তু ?

বৈদান্তিক : উহা মায়াযন্ত্র। মায়ার ছায়া ধরিয়া রাখার ম্লেচ্ছ কায়দা।

সম্যক উপলব্ধি হইল না।

বৈদান্তিক : তুমি একটি নিদারুণ গবেট। ধরো কোথাও বন্যা হইয়াছে। বন্যাও মায়া।

সেই মায়ার ছায়া চিত্ররূপে ওই হতচ্ছাড়া যন্ত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশিত হয়। অবৈদান্তিক গর্দভগণ, তৎক্ষণাৎ লাফাইতে থাকে, বন্যা হইয়াছে বন্যা।

মহাশয় ওই যন্ত্রে আমরাও কী ধৃত হইতে পারি ? আর অবৈদান্তিকের দৃষ্টিতে আমরা মায়া হইতে বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়া নিষ্ক্রিয়তার জন্য উপহাস্যাস্পদ হইব না কী ?

বৈদান্তিক : হইলেও কিছু করিবার নাই। বেদ যাহাকে মায়া বলিয়াছে তাহাকে কায়া ভাবিবার দুঃসাহস আমার নাই।

মহাশয় ইহাতে সাহসের কী প্রয়োজন ?

বৈদান্তিক : শুনহ বৎস। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবই মায়া, কেবল চাকুরিটা ছাড়া। সেটি খোয়াইলে তোমার কোনও সম্বন্ধীই মাসের পর মাস ভরণপোষণ করিবে না। তখন আর মায়া দেখিবে না, চক্ষে সরিষার কুসুম দেখিবে।

অতঃপর ?

অতঃপর স্ট্যাচু হইয়া যাও।

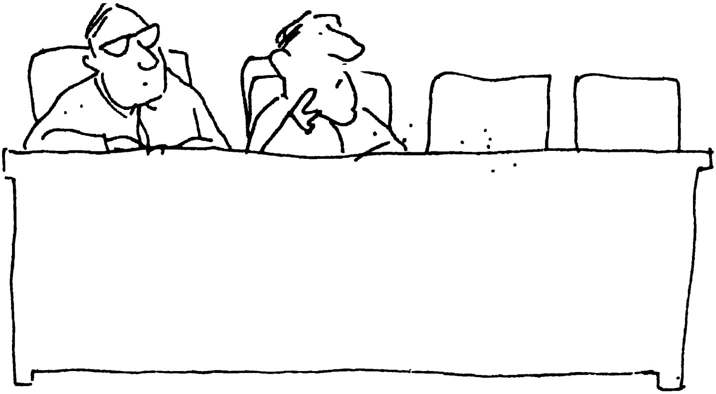
ছাতা আছে মাথা নেই

আমরা আর বেঁচে নেই। বেঁচে আছে একটি মাত্র প্রশ্ন—কী হবে ? ছাত্রের প্রশ্ন, লেখাপড়া করে কী হবে ? সময়ের অপচয়, অর্থের শ্রাদ্ধ। চাকরি মিলবে না। এ দেশে একটিমাত্র জীবিকায় সোনা ফলবে, সেটি হল গুণ্ডামি। যদ্দিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, দাপটে বাঁচবে। মিউ মিউ করতে হবে না। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক কর। সিমেন্ট ব্ল্যাক কর। ওয়াগন ভেঙে ফাঁক কর। নির্বাচনের সময় বুথ দখল কর। 'টেরারে'র ব্যবসায় ভাল কামাই। পাড়ার মানুষ দাদা বলে ভয় ভক্তি করবে। দাদার দাদারা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাবে। দোকানদার ছুটে এসে পায়ের ধুলো নেবে। শেয়ানার দেশে শেয়ানে শেয়ানেই কোলাকুলি হয়। অনর্থক শেলী, বায়রন, কীটস, শেকসপীয়র, কান্ট, হেগেল, হিউম, নিৎসেকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করে কী হবে ! জিও, পিও, ফুস্, ফিনিশ।

গৃহীর প্রশ্ন, কী হবে বেঁচে ! শুধু শুধু জায়গা জুড়ে বসে থাকা। র‍্যাশানের বোগড়া আলোচাল ধ্বংস করা। দিনগত পাপক্ষয় ছাড়া আর কী হবে ?

শিক্ষকের প্রশ্ন, কী শেখাব ? কে শিখবে ? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন রণক্ষেত্র। রুটিন অতি চমৎকার। প্রথম ঘণ্টায় ভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষকে শিক্ষকে ফিস্ট ফাইট। দ্বিতীয় ঘণ্টায় শিক্ষকদের পক্ষাবলম্বী ছাত্রে ছাত্রে সঙ্ঘর্ষ। অন্তে ঘণ্টাবাদন, কুরুক্ষেত্রে দিবসের শান্তি। দেয়াল লিখন আর পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। গেটে ছাত্রদের জমায়েত। জ্বালাময়ী ভাষণ। বিশেষ আকর্ষণ, বোমা বিস্ফোরণ। নিজেদের সমস্যা তো আছেই, গোদের ওপর বিষফোঁড়া, আন্তর্জাতিক সমস্যা—কম্বোডিয়া, কামপুচিয়া, ইরাক, ইরান, ফকল্যাণ্ড আইল্যাণ্ড।

তালগোল পাকান একটা দেশ। কয়েক বছর আগে কলকাতার অফিসপাড়ার এক রাস্তা ধরে হাঁটছি। প্রায় সন্ধ্যা। হঠাৎ এক অফিসবাড়ির দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ধোপদুরস্ত দুই বাবু জড়াজড়ি, কোস্তাকুস্তি করতে করতে, দুম্ করে একেবারে রাস্তায় আমার পাশে এসে পড়লেন, যেন যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। রাস্তায় শুয়ে শুয়ে দু'জনে, দু'জনকে খুব খানিক লাথালাথি করলেন, তারপর



ধুলোটুলো ঝেড়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। প্রবেশপথ থেকেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার রহস্যালোকে। সুন্দর চেহারার, হৃষ্টপুষ্ট দুই বঙ্গপুঙ্গব প্রদোষের ম্লান আলোকে সেই ভুতুড়ে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলেন। পরস্পর পরস্পরের ওপর অনর্গল বৃষ্টিধারার মত কটু বাক্য বর্ষণ করে চলেছেন। সাদা পোশাকে রাস্তার ধুলো জড়িয়ে আছে। আমাকে অবাক হতে দেখে ফুটপাথের এক বিক্রেতা বললেন, 'অবাক হবার কিছু নেই, দোতলায় অমুক মিলের বোর্ড অফ ডিরেক্টার্সের অ্যানুয়েল জেনারেল মিটিং হচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়ান। দেখবেন জোড়ায় জোড়ায় বাঙালী ওইভাবে লড়ালড়ি করতে করতে নিচে এসে পড়ছে, আবার ধুলো মেখে ওপরে উঠে যাচ্ছে।' বাঙালীর সেই বিখ্যাত মিলটি অবশ্য লাটে উঠে গেছে। সেকালের জমিদাররা মাঝে মাঝে বাইরে যেতেন। নায়েবরা বলত, বাবু লাটে গেছেন। অর্থাৎ জমিদারি দেখতে গেছেন। লাটে যাওয়া এক জিনিস, আর লাটে ওঠা আর এক জিনিস। সারা দেশ জুড়ে এখন বোর্ড অফ ডিরেক্টার্সের মিটিং চলেছে। আর জড়াজড়ি, গলাগলি করে ভদ্র বঙ্গসন্তান রাস্তায় এসে পড়ছে। লাটে ওঠার পূর্ব লক্ষণ।

সেই বীরভূমের শ্রাদ্ধ। কৃষকের পিতা পরলোকে গেলেন। শ্রাদ্ধ হবে। পুরোহিত কৃষকবধূকে বলে গেলেন, উঠনের কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে রাখবে, কাল সকালে শ্রাদ্ধ হবে। কৃষকবধূ পুরোহিতের নির্দেশমত বাড়ির সামনের কিছুটা জায়গা নিকিয়ে, পরিষ্কার করে রাখলে শ্রাদ্ধ হবে। যথাসময়ে পুরোহিত



এলেন। নিখুঁত আয়োজন। সামনে কাছাগলায় যজমান। পুজো-আচ্চার নিয়মকানুন কিছুই জানা নেই। পুরোহিত যেমন বলবেন তেমনই বলতে হবে। এইটুকু কে আর না জানে। পুরোহিত ছিলেন তোতলা। তিনি প্রথমেই বললেন, 'ব ব বল ব্যা ব্যাটা তো তোর বা বাপের নাম বল।'

কৃষক অমনি বললে, 'ব ব বল ব্যা ব্যাটা তো তোর বা বাপের নাম বল।'

পুরোহিত বললেন, 'উ উ উ লয়, বা বা বাপের নাম।'

কৃষক বললে, 'উ উ উ লয় বা বা বাপের নাম।'

পুরোহিত মশাই ভাবলেন, যজমান ব্যঙ্গ করছে। মারলেন এক চড়।

কৃষকও পুরোহিতের গালে কষিয়ে দিল এক চড়। শুরু হয়ে গেল কোস্তাকুস্তি, ধস্তাধস্তি। দু'জনে ঝটাপটি করতে করতে, গড়াতে গড়াতে পাশের নর্দমায়।

কৃষকবধূ দাওয়ায় বসে সব দেখছিল। শ্বশুরের শ্রাদ্ধ খুব জমেছে। দু'জনকে নর্দমায় গড়িয়ে পড়তে দেখে আপন মনে বলে উঠল, 'আই বাপ্, অ্যাদ্দুর গড়াবে জানলেক আর একটু লিকিয়ে রাখতুম।'

বীরভূমের ওই শ্রাদ্ধের মত বাঙালীর শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াবে কে জানে ? প্রস্তুত হয়েই থাকা ভাল। যতটা পারা যায় ভেতরটাকে নিকিয়ে রাখাই উচিত। প্রাচীন সংস্কার, আদর্শ মনের গোশালায় গোবরের মত জমে আছে। সেই আবর্জনায় জন্মাচ্ছে নতুন আদর্শের শূক কীট। ঝাঁক ঝাঁক অস্বস্তির মশা বিবেকে হুল

ফোটাচ্ছে। চিন্তার সঞ্চয়ে শ্রেষ্ঠ বলে যা তোলা আছে তার কোনও মূল্য নেই ? যা শিখে এলুম সব ভুল ? শাশ্বতের ধারণা পাল্টাতে হবে ! যাঁদের মহাপুরুষ বলে জেনে এসেছি, এ যুগের চোখে তাঁরা কাপুরুষ। জ্ঞান, সৎকর্ম, শান্তি, অহিংসা, আদর্শ, সত্য এ সবই হল মধ্যযুগীয় কুয়াশা, কুআশা। পশুজগতের নিয়মই মানুষের আদর্শ। ধরো আর মার। মেরে খাও। এর মার, তার মার, পকেট মার। আবরণ মানুষের, অন্তর পশুর। বড় সংশয়। বড় বিস্ময়। মানুষ তো আশা নিয়েই বাঁচতে চায় ! উপনিষদের চরৈবেতি মানে সামনে চলা, না পেছনে চলা !

প্রশ্নের উত্তর পেলাম স্বামী সত্যানন্দের কাছে : হতাশ হয়ো না। প্রত্যেক মানুষের ঠিকমত চলতে চলতে বেচাল চলতে ইচ্ছে করে। পশুদের দেখা যায় হঠাৎ একদিকে দৌড় দেয়। বিচারশীলতা নিয়ে মন ঠিক চলছে হঠাৎ চঞ্চলতা নিয়ে এক দৌড় দেয়। এই হচ্ছে Erraticism of Soul. ব্রহ্মাও একদিন সমরসে থাকতে থাকতে এমনই বিসম হয়ে গেলেন। খুব নিয়মে চলেও হঠাৎ ইচ্ছে করে বেনিয়মে চলবার। আবার আমরা বহু জন্ম পশু ছিলাম। কাজেই পশুত্বের Erratic nature—বিচারহীনতা—হঠাৎ জেগে ওঠে। সেই Erratic ভাবগুলোকে অবশ্য দমন করা উচিত। দার্শনিক কাণ্ট তাই 'Moral ought', উচিত-বোধকে বড় করে স্থান দিয়েছেন।

একক মানুষ হয়তো এগতে চায়। ঘরে ঘরে আদর্শের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। পূর্বপুরুষের ছবির সামনে আনত হবার মত মাথা হয়তো এখনও ধড় থেকে এক কোপে নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সাধনহীন, আদর্শহীন হয়ে পড়েছে মানুষের সঙ্ঘ, সংগঠন, Organisation Man. যে হাত মানুষকে সামনে ঠেলবে, সেই হাত পেছনে ঠেলছে। মুকুট আছে, রাজা নেই। মর্কট লাফাচ্ছে সিংহাসনে।

নিলাম্বালা

পুবো পাডাটাই ছিল পরিবাব। এত চেকনাইঅলা বাডিঘর ছিল না। বৈঠকখানার তেমন কেতা ছিল না। পর্দাবি বাহার ছিল না। ঠাট ঠমক তেমন না থাকলেও প্রাণ ছিল। বকে বসে বাঙালী গল্প করছে। ধুতিটাকেই লুঙ্গির মত করে পবা। ভেতর থেকে চা আসছে, পান আসছে। এ ওর খবর নিচ্ছে, ও এর খবর নিচ্ছে। রামের মেয়ে সবগম সাধছে। বিশুব বড ছেলেব পরীক্ষা। চিন্নে বাড়ি ফাটাচ্ছে। মেজ বউদি ডালে ঘি-ফোডন ছেড়েছে, গন্ধে জিভে জল এসে যাচ্ছে। সেজো কাঁধে কাটোয়ার ডাঁটাব ঝাড নিয়ে ঢুকছে। বড রসিকতা করে বলছে, ডালে বসে পাপিয়া শিস দিচ্ছে, দেখিস উডে না পালায়। ভবতারণ চলেছে মাছ ধরতে। কাঁধে হুইল-ছিপ। হাতে সাদা ব্যাগ। চারেব গন্ধ বেরচ্ছে ফুবফুব করে।

বাঁডুজ্জে বাডিব বড মেয়ের বিয়ে। বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে। ভারার টং-এ উঠে করনিক দিয়ে দেয়াল চাঁচছে। কিবি কিবি আওযাজে পাডা কাঁপছে। সত্য নতুন সাইকেল কিনেছে। পেছন দিকটা উঁচু কবে প্যাডেল চালিয়ে চাকা ঘোরাচ্ছে। নতুন বল-বেয়ারিং-এর শব্দ। নতুন রিম আব স্পোকে আলো ঠিকরচ্ছে। সবাই জিজ্ঞেস কবছে, কত নিলে। জিনিসটা বেশ হে!

ছুটির সকাল, অন্যদিনের সন্ধে পাডা জমজমাট। বয়েসের ব্যবধান ভুলে মেলামেশা, হই হই। রসিক আর গপ্পে মানুষের অভাব কোন কালেই হয না। সেকালেও হত না। শখের থিয়েটার, মাছ ধরা, বনভোজন. জলসা, পুজো, সব মিলিয়ে বেঁচে থাকার এমন একটা স্বাদ ছিল, মরার কথায় চোখে জল এসে যেত।

দুঃখ, কষ্ট,দাবিদ্র্য, আদি ব্যাধি, স্বামী-স্ত্রীর অবনিবনা, পিতাপুত্রে মনোমালিন্য, হঠাৎ কারুর আত্মহত্যা, এ সব ছিল। জীবন মানে গোলাপফুলের পাপড়ি বিছানো পথে গুনগুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হেঁটে যাওয়া নয়। মার মানুষকে খেতেই হবে। মারকে মানুষ ভয় পায় না। ভয় পায় নিঃসঙ্গতাকে। ভয় পায় প্রতি মুহূর্তের ভয়কে। নিত্য নতুন আতঙ্ক দিয়ে ঘেরা জীবনের অনিশ্চয়তাকে।

মানুষের মাঝে দুঃখ সুখে বেঁচে আছি, এই বোধটুকু আমাদের সহনশীল করে। আর যখনই মনে হতে থাকে, যাদের মানুষ ভাবছি, হয় তারা অতি মানব, না হয় পাশব, তখন মৃত্যুকে জীবনের চেয়েও আদরণীয় মনে হয়।

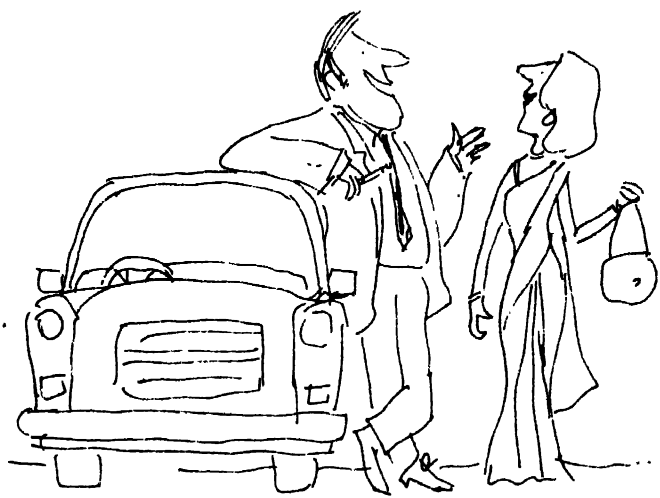
পথের পাশে অনাথ যে মানুষটি বসে আছে, কিসের আশায় সে বেঁচে থাকে! আশা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। দিন একদিন আসবে, ভাগ্য হঠাৎ একদিন ফিরে যাবে। বলা যায় না, কত কী হতে পারে! এ দেশেরই প্রবাদ, চটে শুয়ে মুটে রাজা। আজ হয় তো কিছুই জুটল না, কে বলতে পারে কালই হয়তো এমন একটা কিছু ঘটে যাবে, জীবনের ভোল পালটে যাবে। কালকের জন্যে আজ বেঁচে থাকা। রঙীন আশার সোনার শেকল আমাদের গলায়। অপরপ্রান্ত ভাগ্যদেবীর অদৃশ্য হাতে। কিছু হোক না হোক, হতে পারে, এই ভেবে ঘরে ঘরে জীবনের আয়োজন।

কিন্তু অপেক্ষারও তো একটা শেষ আছে! প্রেমিক যখন গাছতলায় প্রেমিকার জন্যে অপেক্ষা করে, সে অপেক্ষাও একটা সময়ে শেষ করতে হয়। ধুৎ তেরিকা বলে সরে পড়তে হয়। প্রেমিকার দেখা নেই। মাথায় কাকবিষ্ঠা। আশা নামক সন্তানটিকে কতকাল আর বুকে ধরে রাখা যায়! ধরে থাকতে থাকতে বয়েস বেড়ে বৃদ্ধ। শেষে বিদায়। উত্তরপুরুষকে মানুষ কী আর দিয়ে যেতে পারে! ওই আশা-সন্তান ছাড়া! এতকাল আমার কোলে ছিল, এবার



তোমার কোলে ধরে বসে থাক। সুদিন আসবে। স্বাধীনতার ছত্রিশ বছরে না হোক ছিয়াত্তর বছরে হবে। হবেই হবে। এত মিছিল, এত জনসভা, জ্বালাময়ী বক্তৃতা, হস্ত আস্ফালন, ঝাণ্ডাধারণ। আশার বাণী বর্ষণ। হবে হবে সব হবে। অনেক সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা মহাফেজখানায় লাল ফিতে বাঁধা, থরে থরে সাজান।

সেই ঘটনা, যা ঘটেছিল আমার জীবনে, সেই শিক্ষার আলোকে পরিস্থিতির পর্যালোচনা। ফুটপাথে নিলামঅলা হাঁকছে, যা লেবে তা ছ আনা। বেশ কিছুকাল আগের কথা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সেলের আকর্ষণ বড় আকর্ষণ। শস্তায় কিস্তিমাতই তো আমাদের জাতীয় ধর্ম! পূর্বপুরুষের যা কিছু ছিল, ভিটে-মাটি-বাগানবাড়ি, ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠা সবই তো বিকিয়েছি। যে বেচে সেই ব্যবসাদার। সেই অর্থে আমাদের মত বড় ব্যবসাদার কে আছে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি শস্তায় কেনার মত কী আছে! দেখতে দেখতে চোখে পড়ল পোকা-মারা পাউডারের মাঝারী মাপের একটা কৌটো পড়ে আছে একপাশে। হাতে নিয়ে দেখছি, আর ভাবছি, ছ আনার পাউডারে পোকা মরবে তো:



নিলামঅলা বললে, 'কী ভাবছেন বাবু ! লেবেন তো লিন, না লেবেন তো সরে পড়ুন। ব্যবসা খারাপ করবেন নি।'

আমার বিনীত প্রশ্ন, হ্যাঁ ভাই, পোকা মরবে তো !

বিক্রেতার কাছে ক্রেতারা সব সময় বিনীত, যদিও লেখা হয়, 'খরিদদার প্রভুর সমান'। নিলামঅলা ছোঁ মেরে কৌটোটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললে,

'মরবে কী বাবু ? এই তো মরেই রয়েছে।'

কৌটোর রঙীন লেবেলে ছবি, পিঁপড়ে, মাছি, আরশোলা, মরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তা, এত পরিকল্পনা যে দেশে ফাইল-বন্দী হয়ে পড়ে আছে, যে দেশে যে কোনও নির্বাচনের আগে এত আশার বাণী বাতাসে ওড়ে, সে দেশের কিছু হবে না, তা কী কখনও হয় ! বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। সবাই শিক্ষিত হবে, সকলেই নিজের নিজের জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, দারিদ্র্য বিদায় নেবে, হেলথ ফর অল বাই টু থাউজেণ্ড এডি। প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা। নিরাপত্তা। ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বলে কিছু থাকবে না। রাজা প্রজা সব এক হয়ে গলা জড়াজড়ি করে রঙীন ছবি তোলাবে।

মূর্খ ! তা কখনও হয় ! মানবজাতির ইতিহাসে কোনও কালে কোথাও তা হয়েছে ! একদল ভোগ করবে, আর একদল তা দেখবে। মানুষের দুটি মাত্র শ্রেণী—এক শ্রেণী দেখাবে, গাড়ি দেখাবে, বাড়ি দেখাবে, ঐশ্বর্য দেখাবে, আর একদল দেখবে। প্রদর্শক আর দর্শক। জগৎ এক সিনেমা। দশ আনার আসনে, ঘামে ভেজা ছেঁড়া জামা পরে বসে, দশ পয়সার চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে দেখ, সুবেশ নায়ক ঝাড়লণ্ঠনের আলোর তলায় বসে মুরগীর ঠ্যাং ছিঁড়ছে, থোকা থোকা লাল আঙুর। সর্বহারার দল তাহলে বাঁচবে কিসে ? কেন ? ভাষণে। থাকবে কী নিয়ে ? কেন ? প্রতিশ্রুতি। দেশকে দেবে কী ? কেন ? ভোট।

দেখি না কী হয়

আমার এক দোস্তের কথা মনে পড়ছে। জীবন নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাই ছিল তার হবি। নিজের সঙ্গে খেলতে ভালবাসত। লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা করত না। যেমন একবাব তার মনে হল, সাতসকালেই গোমড়ামুখো অফিসের বড়কর্তার দাড়ি ধরে, মানু আমার, সণ্টু আমার বলে নেড়ে দিলে কেমন হয়! কী হতে পারে! একদিন সত্যিই সে তাই করলে। ঘূর্ণায়মান বিশাল চেয়ারে বসে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, যমরাজের মত মুখ করে সবে ফাইলপত্তর দেখতে শুরু করেছেন, ঘড়িতে তখন ঠিক দশটা দশ, আমার সেই দোস্ত স্প্রিং লাগান ফ্লাশ ডোর ঠেলে ঘরে ঢুকল। বড় কর্তা মুখ না তোলা অবস্থায়, কপাল ছোঁয়া প্রলম্ব দৃষ্টিপাত করে, বউ খাঁতানো কণ্ঠে বললেন,

'হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট?'

'ইওর দাড়ি স্যার।'

ভদ্রলোক না বুঝেই বললেন, 'আই অ্যাম বিজি নাও।'

দোস্ত বললে, 'মানু আমার।'

ভদ্রলোক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'রেখে যান।'

দোস্ত বললে, 'সণ্টু আমার।'

ভদ্রলোক এবার মুখ তুলে বললেন, 'হোযাট?'

সঙ্গে সঙ্গে চিবুকটি ধরে বার চারেক নেড়ে দিয়ে দোস্ত বললে, 'সোনা ছেলে, মাণ্টু ছেলে, কত গুণ, বোক্কু আমার।'

ভদ্রলোক বাগে অগ্নিশর্মা। হাতখানেক দূরে ফুলোফালা একটা মুখ। চ্যাকর চ্যাকর করে পান চিবোচ্ছে। ইচ্ছে কবছিল নিশ্চয়, মারি এক চড়। ঘুরে ঘুরে কলের চেয়ারের গ্যাঁড়া কলে বে-এক্তার। ঠেলে তড়াক করে উঠবেন সে উপায় নেই। নতুন অবস্থায় ঠেললে পেছনে হড়কে যেত। ভারতীয় বস্তু। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারিং জ্যাম মেরে গেছে। তার ওপর পদতলে স্ট্যাটাস সিম্বল কার্পেট নামক গৌরবান্বিত বোসপুবনো মোটা সতরঞ্চি। উঠে দাঁড়াবার আশা ছেড়ে দিয়ে, দোলনায় শুয়ে ঝোলানো বেলুন দেখে শিশু যেমন দেয়লা

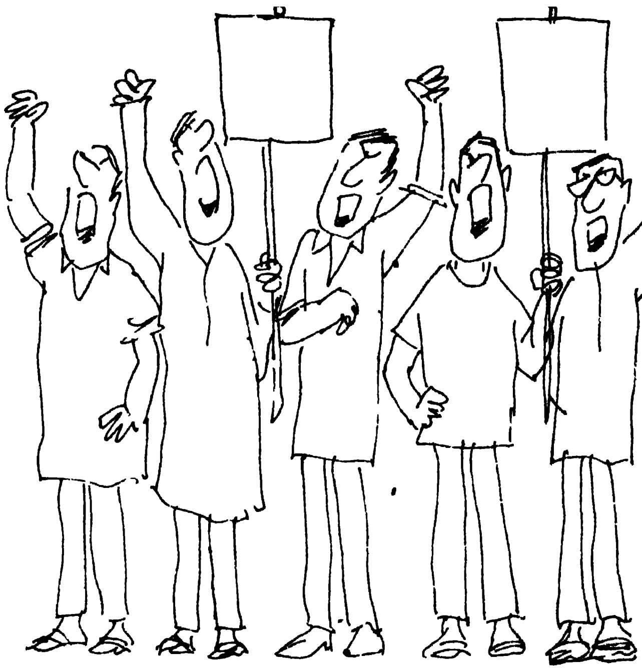


করে, সেই ভাবে চিবুকের দিকে এগিয়ে আসা হাত দেখে ঘুষি ছুঁড়তে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, 'হোয়াট ইজ দিস, হোয়াট ইজ দিস।' শেষে হাত খামচে দিলেন।'

টিফিনের আগেই দোস্তের হাতে সাসপেনসান অর্ডার এসে গেল। গ্রস মিসকণ্ডাক্ট। চূড়ান্ত অপকর্ম। ওর একটা জীবনদর্শন ছিল, সম্পূর্ণ নিজস্ব। জীবন হল দাবা খেলা। চালের বদলা চাল। ইচ্ছে করে নিজেকে বিপদে ফেল, তারপর বিপদ কেটে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করো। তাতে না কী আত্মবিশ্বাস শতগুণ বেড়ে যায়। তা সেই অর্ডার পেয়ে বাবু একটু মুচকি হাসলেন, তারপর সোজা ইউনিয়ানের দফতরে। বড়কর্তারা স্বভাবতই বড় অসহায়। যে গাছ যত বড়, আকাশে সে তত একা, তত বেশি ঝড় ঝাপটা মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকা। কেস ঘুরে গেল। অধস্তনের গায়ে হাত তুলেছেন! এত বড় দুঃসাহস! যত অপকর্মই করুক, কলম যখন রয়েছে তখন হাতে কেন? চলবে না, চলবে না। স্বৈরাচারীর কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। ওপরতলাকে কলম দেখিয়ে, নিচের তলা ভাণ্ডা হাতে সংগ্রামে নেমে পড়লেন। বড়কর্তা ঘেরাও। তিন দিনে সাসপেনসান উঠে গেল। বিজয় মিছিল দালানে দালানে নৃত্য শুরু করে দিলে।

আমার সেই দোস্ত এখন কোথায় কার টাকে হাত বোলাচ্ছে কে জানে; কিন্তু শত শত দোস্ত দিকে দিকে খেলা শুরু করে দিয়েছেন। খেলার নাম—দেখি না কী হয়?

একদল বললেন, আয় ভাই, ছেলেমেয়েদের বারোটা বাজিয়ে দেখি কী হয়!



শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটু সেঁকো বিষ ঢোকাই। কেতাবী শিক্ষা অনেক হযেছে। ঢিল মাবা, ফার্নিচাব ভাঙা, প্রিনসিপ্যাল ঘেবাও, প্রভৃতি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বছব দশেক চালিযে দেখা যাক। কী হয। আজকাল, দিবস, সপ্তাহ, বর্ষ পালনেব আধুনিক বীতি চালু হযেছে। নাবী বর্ষ, শিশু বর্য, অবণ্য সপ্তাহ, অন্ধ দিবস। সেই বকম 'ক্লাসলেস ক্লাস' দশক। ছেলেমেযেবা সেজেগুজে ক্লাসে আসবে, মার্চ কববে, ভাঙবে চুববে, চাঁটা মাববে কযেকটাকে যমেব বাড়ি পাঠাবে, অধ্যক্ষেব থুতনি ধবে নেড়ে দেবে, অধ্যাপকদেব লেঙ্গি মাববে, তারপব বেস্তোবাঁয বসে ডবল হাফ মেবে বাড়ি ফিবে যাবে। ক্লাস আছে কিন্তু ক্লাস নেই। এব নাম ক্লাসলেস ক্লাস। ক্লাসলেস সোসাইটির আগেব অবস্থা। সবাই পণ্ডিত হতে পাববে না। হতে গেলে মেধা চাই, নিষ্ঠা চাই। পণ্ডিতদেব আলাদা সম্মান। আলাদা খাতিব। তাঁবা আবাব জ্ঞানদানেব অধিকাবী। পণ্ডিত একটা ক্লাস, মূর্খ আব একটা ক্লাস। সবাই পণ্ডিত হতে পাববে না, কিন্তু মূর্খ তো হতে

পারবে। দে সব নামিয়ে। খোলনলচে উড়িয়ে ধামা চাপা দিয়ে দে। সবাই মূর্খ ক্লাসলেস সোসাইটি। ফিজিক্‌স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, জুলজি চৌপাট। ছাত্রও নেই শিক্ষকও নেই। বছর দশেক পরে সেই গল্পের অবস্থা :

দুই গবেট পণ্ডিত মাচায় বসে আছে। সময়টা সন্ধে সন্ধে। হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা ছুঁচো দৌড়ে গেল।

কী গেল ওস্তাদ ?

রাজবাড়ির হাতি, না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে একটা শূকর চলে গেল।

কী গেল ওস্তাদ ?

রাজবাড়ির ছুঁচো খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে গেছে।

কোন্ সম্বন্ধীর বিধান, জন্মালেই লেখাপড়া করতে হবে, শিখতে হবে, শেখাতে হবে! সে ব্যাটা ছিল পয়লা নম্বরের প্রতিক্রিয়াশীল। আমরা সব সেল্‌ফ এডুকেটেড। আবার সেই গল্প

একজন একটা জটাজুটধারী তালের আঁটি পেয়েছে মাটি খুঁড়ে। এটা কী। ছুটতে ছুটতে এল রকের রকফেলারদের কাছে, বলো ওস্তাদ মালটা কী ?

এটা ? এটা বাদুড়ের বাচ্চা।

না, এটা কোনও মুনি-ঋষির মাথা।

এটা ডাঙ্গার অক্টোপাস।

তোর মাথা। এটা একটা পেটো। গত অ্যাকসানের সময় ফাটেনি। মাটি চাপা পড়ে শেকড় বেরিয়েছে। আবার পুঁতে দিয়ে আয়। দিন আগত ওই। পেটো আর বানাতে হবে না। গাছ থেকে পড়বে। দমাদ্দম ঝাড়বো। দেখি না কী হয়!

কী দেখলেন স্যার

বিদেশে কী দেখে এলেন স্যার ?

কতো কী। না দেখলে তোমার বিশ্বাসই হবে না যে স্বদেশ কোনওদিন বিদেশ হবে। এই চওড়া চওড়া রাস্তা। মসৃণ, তকতকে, ঝকঝকে। তার ওপর দিয়ে, আশি, নব্বই, একশো কিলোমিটার বেগে রঙ বেরঙের গাড়ি ছুটছে। রাস্তা এত মসৃণ যে তুমি গাড়ির আসনে বসে, স্বদেশে ফেলে রেখে যাওয়া, টেঁপী কিম্বা বুঁচীকে প্রেম-পত্তর লিখতে পারো। গাড়ি লাফাবে না, ঝাঁপাবে না, ডাইনে বামে কাত মারবে না। যেন আঠার মতো রাস্তার সঙ্গে লেগে আছে।

গর্ত নেই স্যার ? ছোট, বড়, মাঝারি মাপের গাড্ডাসমূহ ?

না, গাড্ডাসমূহ নেই।

কেন নেই স্যার ?

যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করে এস কেন নেই ! ও বিষয়ে কোনও সিটি-মেয়রের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়নি।

সুন্দরী রমণীর গালে টোল নেই, মাইলের পর মাইল রাস্তায় গর্ত নেই, এ তো পরিকল্পনার এক ধরনের ত্রুটি। মানুষ কত বিশ্রী ভাবে সৎ হলে তবেই না অমন কাণ্ড হয় ! জঞ্জাল আছে স্যার ? দু'হাত অন্তর অন্তর আবর্জনার স্তূপ ?

পাগল হয়েছ ? রাস্তার ধারে আবর্জনা ! এ কী তোমার স্বদেশ, এর নাম বিদেশ !

কী দুঃখের দেশ স্যার ! মানুষ ভালোভাবে খেতে পায় না। পেলে রাস্তার ধারে, মাঠেঘাটে সর্বত্র জঞ্জাল পড়ে থাকত।

তোমার মুণ্ডু। ওদেশের মানুষ দিনে রাতে চার থেকে পাঁচবার খায়। ঘুরছে ফিরছে কুপ কুপ খাচ্ছে। ফ্রুট জুস, হটডগ্স, হ্যামবার্গারি, চিকেন লেগস, প্যাটিস, প্যাসট্রিজ, ব্রেড, বাটার, ওমলেটস, রোলস। সে খাওয়া যে, কী খাওয়া, তুমি ইমাজিন করতে পারবে না।

হৃদয়হীনের দেশ স্যার। এত বড় স্বার্থপর, অন্যের কথা ভেবে আঁস্তাকুড় তৈরি করে না আর পাঁচজন কী খাবে একবারও ভাবে না।

তার মানে ?

স্যার যারা আবর্জনা খুঁটে খাবার সংগ্রহ করে তাদের কী হবে ! এর নাম খ্রীশ্চান !

তুমি একটি অজমূর্খ। ওদেশে কাউকে জঞ্জাল খুঁটে খাবার বের করতে হয় না। সকলেই মোটামুটি বড়লোক।

কী বিশ্রী দেশ স্যার ! যে দেশে অভাব নেই, সে দেশের আর রইল কী ! সবাই এক বউ নিয়ে ঘর করছে।

তার মানে ?

মানুষের তো দুই বউ স্যার ! স্বভাব আর অভাব। ওদের অভাব নেই, স্বভাবটাই কেবল আছে। অমন দেশে যান কেন ? রেশনের দোকান আছে ? রেপসীড তেল ঠিকমত পাওয়া যায় ?

তোমার অসীম অজ্ঞতায় আমার রাগে শরীর জ্বলছে।



রেশানে কী চাল দেয় স্যার ? ভাঙা আতপ, না বোগড়া সেদ্ধ।

গর্দভ ! ও দেশে র‍্যাশান নেই।

সে কী, পুরোটাই কালো বাজার ! একটাই মাত্র মার্কেট ! হোয়াইটের দেশে ব্ল্যাক মার্কেট ! ভবিষ্যতে ও দেশে আর যাবেন না, চরিত্র বিগড়ে যাবে।

এ অবাচীনের সঙ্গে কথা বলে কী হবে। নেহাত ওই বিপ্লবের দিনে শিখেছিলুম—দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। তা না হলে তোমাকে আমি ঘাড় ধরে দূর করে দিতুম।

রাগ করছেন কেন স্যার ? আমরা তো কোনওদিন বিদেশে যেতে পারব না, তাই তো জানার বাসনা। ওখানে সকালে দুধের ডিপোর সামনে লাঠালাঠি হয় স্যার ! ট্যাঁফোঁ, ভোঁ।

না, ও-দেশের মানুষের অত সময় নেই। সাতসকালে উঠেই ট্যালাপিয়া



মাছের মত বাজারে, ডিপোর সামনে ইজ্জিরবিজ্জির করবে, সেদেশ এদেশ নয় দরজায়, দরজায় ভোরবেলা দুধের বোতল, সংবাদপত্র, ফুল এই সব রেখে যায় ঘুম থেকে উঠে ওদেশের বউমারা টুক করে দরজা খুলে, পুট্‌পুট্‌ করে সব ভেতরে টেনে নেয়।

কে রেখে যায় স্যার ? বউমার পূর্বপ্রেমিক ?

প্রেমিক আসছে কোথা থেকে গবেট ! অপ-উপন্যাস পড়ে পড়ে মগজ ধোলাই হয়ে গেছে।

ওই যে ফুলের কথা বললেন স্যার। ফুল, বোতল আর সংবাদপত্র।

ওহে ইডিয়েট ! ওরা ওমর খৈয়ামের নীতিতে বিশ্বাসী। রোজগারের সবটাই ওরা পেটায় নমঃ করে না। ফুলের জন্যে কিছু রাখে। ফুল আর ফল, যেমন আমাদের কান আর মাথা।

ফল ? কোন ফলের কথা বলছেন স্যার, কর্মফল ?

আজ্ঞে না, গীতার ফল নয়, গাছের ফল। কমলালেবু, আপেল, কলা, আঙুর, আখরোট, খেজুর, কাজু। খাবার টেবিলে, থরে থরে সাজানো। ফুলদানিতে ফুল। ছবিটবি দ্যাখোনি কোনওদিন ! ওল্‌ড মাস্টারসদের আঁকা স্টিল-লাইফ জীবনে দ্যাখোনি ?

ছি ছি কী দুর্নীতিপরায়ণ ওরা।

কেন ?

ঘুষের পয়সা ছাড়া এসব হচ্ছে কী করে ? এদেশে দু'বেলা দু' মুঠো জোটাতেই আমাদের আধ হাত জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে ফুল, ফল ! শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

আরে না রে বাবা, ওদের রোজগারও তেমনি।

তার মানে ওয়াগন ভাঙে, স্মাগ্‌ল করে, ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে।

তোমার মাথা। ওখানে বড় বড় কল, কারখানা, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য। টাকার বন্যা বইছে।

স্যার ধর্মঘট নেই ? মিছিল নেই ? রোজ বিকেলে, চলবে না, চলবে না।

না, ওসব চোখে পড়েনি।

বাজে জায়গা।

ঠিক বলেছ, থার্ড ক্লাস জায়গা। যেখানে সেখানে, যত্রতত্র, যা তা করা যায় না। ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব। এখানে দ্যাখো, দেয়াল দেখলেই তুমিও পা তুলছ, কুকুরও পা তুলছে॥

ধর তক্তা মার পেরেক

আবহাওয়ার পূর্বাভাস : একটি মাত্র ময়লাময়লা কুড়ি টাকার নোট পড়ে আছে। চলতেও পারে নাও পারে। মাসের এখনও দশ দিন বাকি। এর ওপর একটি প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলে উড়ছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কন্যার বিবাহ। শ'খানেক টাকার একটি শাড়ি নিয়ে তবেই তিনি ফুল দিয়ে সাজানো চেয়ার থেকে নামবেন। প্রতিদিন পনের টাকা না ফেললে দানাপানি জুটবে না। তার মানে মিনিমাম দেড়শো চাই। এমতাবস্থায় !

হারমোনিয়াম নামা।

হারমোনিয়াম কি হবে ?

নামা না।

নে কোরাসে ধর, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা। আমাদের এই বসুন্ধরা। লাগা কোরাসে লাগা। নে এবার দেখে আয়। সংখ্যায় বেড়েছে কী না !

পাগলের পাগলামি। গান গাইলে নোট বাড়বে।

দেখই না।

এই যে সেই সবেধন নীলমনি, কেলে কুচ্ছিত একটি কুড়ি টাকা।

বেশ। সবাই মিলে ধরো, সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং। তেড়ে ধরো। তিন চার ফেরতা মারো। নাও দ্যাখো। বেড়েছে ?

ঘোড়ার ডিম হয়েছে।

বুঝেছি। যে যুগের যা। উদ্দীপক সংগীতের তেজ মরে গেছে। ছিপি খোলা স্পিরিটে যেমন স্পিরিট থাকে না। নাও নোটটা রাখো। চেয়ারে উঠে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে দেখি।

বন্ধুগণ, আমি বলছি, এ দেশে দারিদ্র্য নেই, অভাব নেই, দুঃখ নেই, চোখের জল নেই, বেকাবি নেই। আমি বলছি···।

কে তুমি ?

আমি বক্তা। আমি একদা মনুমেন্টের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার করাল বন্যায় দেশের সব সমস্যা ভাসিয়ে দিয়েছি। আমার দাবড়ানিতে আলো জ্বলে,

আমার তাবড়ানিতে কল চলে, ক্ষেতে ফসল ফলে, মানুষ টগবগিয়ে ওঠে। কুড়ি টাকা এই মুহূর্তে কুড়ি হাজার হয়ে যাও।

ওহে মিঞা নেমে পড়ো। মাত্র কুড়ি আছে। পড়ে পা ভাঙলে এখুনি প্ল্যাস্টারে আর একস-রেতে, শ'তিনেক গলে যাবে।

তাহলে কী হবে ?

চিরকাল যা হয় ! ধার কার্য। বেরিয়ে পড়। খতিয়ে দ্যাখো এখনও কোন্ মাথায় টুপি চাপাওনি। শ'খানেক মুচড়ে আন।

আবার ধার ?

রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, আর তুমি পরেশ সরকার, সকলেরই ওই এক পথ, ধার। কারুর কোটি, আর কারুর কুটি। যাও বৎস, নেমে পড় ফিল্ডে। ক্ষুরস্যধারা। উপনিষদেই আছে। মানে ধারের ধারালো পথে এগিয়ে চল। ধারে সংসার। ধারে ছেলেমেয়ের এডুকেশান, ধারে চিকিৎসা, ধারে মেয়ের বিয়ে। ধারে শ্রাদ্ধ-তিলকাঞ্চন।

তানসেন গান গেয়ে আলো জ্বালাতেন।

এখন বক্তৃতায় আলো নেবে।

গান গেয়ে কাঁচের গোলক ফাটাতেন।



এখন বক্তৃতায় মাইক ফাটে।

গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতেন।

বক্তৃতায় ড্যাম ফেটে বন্যা হয়।

কিন্তু বিবিজান তারপর যে হয়। 'বন্যায় দেশ গিয়েছে ভাসিয়া' বলে সুর ধরলেই মাল-কড়ি কেমন আসতে থাকে বলো! ভাঙা সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম, হেঁড়ে গলা। তাইতেই ছপ্পর ফুঁড়ে নেমে আসে অকৃপণ দান। সামান্য বক্তৃতা, ত্রাণ তহবিল উপচে পড়ে। কোন্ অবিশ্বাসী বলেছে গণসঙ্গীতে দেশ এগোয় না, বক্তৃতায় সমস্যা দূর হয় না! এই দ্যাখো, আমার বক্তৃতায় কতক্ষণ চলে গেল, একবারও চাল, ডাল, গম, চিনি, তেল, নুন, ঝাল, টকের কথা মনে পড়েছে? পড়েনি। এসো আমরা একটা সেমিনার করি। বিশ্বের অগ্রগতিতে পরেশ সরকার ও রেবা সরকারের ভূমিকা। অথবা পাঞ্জাব সমস্যা ও জাল নোট এবং দেবানন্দ। কিম্বা অলিম্পিক এবং লোডশেডিং। অথবা বাবা তারকেশ্বর বনাম পাড়ায় পাড়ায় হিন্দিগান। কিম্বা শিক্ষা ও রাজ্যপাল। তা না হলে চক্ররেল ও লেভেল ক্রসিং। অথবা ট্রেনের কামরায় কাটামুণ্ড। তা না হলে বাতাস ও পুষ্টি।



আরও একটা কাজ করা যায়, একটা বন্ধ ডাকো। মনে করো আমি এই সংসারের কেন্দ্র আর তুমি রাজ্য। আমার অসীম অপদার্থতার প্রতিবাদে চব্বিশ ঘণ্টা হাঁড়ি বন্ধ্। আগামীকাল বন্ধের প্রতিবাদে আমি বন্ধ ডাকি। পরের দিন, তোমার আমার যৌথ গণ অবস্থান। একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা বের করে নাও, যাতে তুমি আমি দু'জনেই জড়িত, যেমন দেশলাই কেন জ্বলে না, সিমেন্ট কেন জমে না, টুথপেস্টের টিউবে সিকিভাগ কেন বাতাস!

একটা শ্রেণীসংগ্রামও বাধিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ধরো আমি শাসক, তুমি শাসিত। আবার কখনও তুমি শাসক আমি শাসিত। মাসের প্রথমে আমি পুঁজিবাদী, তুমি সর্বহারা। প্রায়ই তো বলো, আমার আর কে আছে! তোমার হাতে পড়ে ভাজাভাজা। দুটি শ্রেণী তো হয়েই আছে, স্বামী শ্রেণী আর স্ত্রী শ্রেণী। অত্যাচারী আর অত্যাচারিতা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাজিয়া লেগেই আছে। সেইটাকেই এইবার জাতে তোলো। তোমার রান্নাঘরে মজুত অস্ত্রের অভাব নেই। খুন্তি মেরে আমার লাশ ফেলে দাও। দিয়ে বিধবা হয়ে যাও। পুলিশ অবশ্য ধরতে আসবে। তখন চেষ্টা করবে, বেরিয়ে আসতে। সাফ্ বলে দেবে, এটা পারিবারিক খুন নয়, রাজনৈতিক খুন। আমি জোতদার মেরেছি। মারার আগে প্রথামত গান গেয়েছি, 'নতুন দিন, আমরা, আনবোই আনবো। বিদ্যুৎ ধুত্, বড় জ্বালা, আঁধারেই কল চলবে। সেচের জল ছাড়া কৃষকের গোলা ধানে ভরবে। অন্ধকারের শত্রু, নিপাত যাক। আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে ॥' যদি না শোনে, তবুও যদি হাজতে ভরে দেয়, মন্দ কী! দু বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হবে না। রোজ আর সেই স্লোগান দিতে হবে না—ঠেলছি না, ঠেলবো না। এও খাঁচা সেও খাঁচা। খাবে দাবে আর বসে বসে বই পড়বে। বেরিয়ে এসেই নেতা। মুর্দাবাদ, জিন্দাবাদ ॥

ওলিম্পিক গোল্ড

আপনারা সকলে উঠে দাঁড়ান। ঘড়ি ধরে, ঘাড় গুঁজে পেঙ্গুইনের মত তিন মিনিট নীরবতা পালন করুন।

কার শোকে? কোনও বিপ্লবী কী দেহ রাখলেন?

বিপ্লবী? হ্যাঁ বিপ্লবীও বলা চলে। অন্ধকারে আলোর বিপ্লব এনেছিলেন। বন্ধুগণ! আমাদের সব পাওয়ার প্ল্যাণ্ট অকালে, আমাদের এই ভয়ঙ্কর প্রয়োজনের দিনে পটল তুলেছে। অকালই বা বলি কী করে! যাবার সময় হয়েছিল। সেরিব্র্যাল অ্যাটাকে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল দীর্ঘকাল।

গত সপ্তাহে সব কটা বুড়ো গঙ্গাযাত্রা করেছে। আপদ বিদায় হয়েছে।

বন্ধুগণ! প্ল্যাণ্ট মানে কী? চারাগাছ। পাওয়ার প্ল্যাণ্ট মানে শক্তির চারাগাছ। কোনও সময়েই আমরা পাওয়ার ট্রি মানে শক্তি-বৃক্ষ বলিনি। আমরা কত বুদ্ধিমান। বিচক্ষণ! চারাকে চারাই বলেছি। বৃক্ষ বলিনি কোনও দিন। বললেই জনগণ, আমাদের পেয়ারী, লাললি জনগণ, আমাদের পুঁটকিপাঁট করে দিত। আমাদের বিবেক এখন কত মুক্ত! একগাল হেসে, বাঁধানো দুধের দাঁত বের করে বলতে পারব— চারাগাছ গরুতে মুড়িয়ে খেয়ে গেছে রে পাগলা। আমরা কী করব মানিক! আরও বলব, আমার কথাটি ফুরলো নটেগাছটি মুড়লো। কেন রে নটে মুড়লি? প্রশ্নের উত্তর আমাদেব আর দিতে হবে না। নটেই দেবে, গরুতে কেন খায়! কেন রে গরু খাস? রাখাল কেন চরায় না। কেন রে রাখাল চরাস না?

বন্ধুগণ লক্ষ্য করে দেখুন, এই প্রশ্নোত্তরের কোথাও আমরা নেই। এই নটঘটের মধ্যে থাকা মানেই জনপ্রিয়তার বারোটা বাজা। একেই বলে হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন-টেকনিক। স্বর্গীয় শিব্রামবাবুকে স্মরণ করুন। কী প্রতিভা ছিল মানুষটির! কী অসাধারণ বুদ্ধি! কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন হর্ষবর্ধনের কাছ থেকে। তাগাদা ছাড়া কেউ ধার শোধ করে? করে না। জনগণের ঋণ আমরা কেউ শোধ করেছি? তবে! হর্ষর তাগাদা শুরু হল। তখন শিব্রামবাবু করলেন কী গোবর্ধনের কাছে হাত পাতলেন। গোবরার কাছে ধার নিয়ে হর্ষকে দিলেন।

এইবার গোবর্ধন যেই তাগাদা শুরু করল অমনি হর্ষবর্ধনের কাছে হাত পাতলেন। হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন দুই ভাই। মাসের পর মাস এই চলতে লাগল। শেষে বিরক্ত হয়ে শিব্রামবাবু একদিন দুই ভাইকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'ভাই এ তো তোমাদের দু'জনের ব্যাপার, আমি আর কেন মাঝে থেকে অশান্তি করি, হর্ষ মাসেব প্রথমে টাকাটা তুমি গোবরাকে দেবে, আর গোবরা মাসের শেষে তুমি আবার দাদাকে দিয়ে দেবে। আমার দায়িত্ব খালাস।

বন্ধুগণ! শক্তির ব্যাপারে আমরা মুক্ত পুরুষ। ওই যে নটেগাছটি মুড়লো বলে দিয়েছি! এইবার নটেতে, গরুতে, রাখালেতে কেলোর কীর্তি চলুক। আসুন আমরা বরং গান ধরি :

অন্ধকারে অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে।
কোথায় সীতা, কোথায় সীতা!

ইওর অনার আমার একটা প্রশ্ন আছে। অন্ধকার, ঘন অন্ধকার চারপাশে। শ্রাবণের ধারা আকাশ ফুটো হয়ে ঝরছে। ঠিক আছে। সীতাকে খুঁজতে হবে কেন? এটা কী রামরাজত্ব! এ তো মগের মুল্লুক!

মাই ডিয়ার লার্নেড মেম্বার, সীতাকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন।

সেই মহিলাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়? বড়জোর বর্ধমানে গেলে সীতাভোগ পেতে পারেন।

মূর্খ! ভোগ যখন তৈরি হচ্ছে তখন বুঝতে হবে যিনি ভোগ করবেন তিনি এখনও আছেন। কোথাও না কোথাও আছেন। এই যে বাড়িতে তোমার গিন্নি এখন ভোগ রাঁধছেন, কেন রাঁধছেন? তুমি তো বসে আছ আমার সামনে। তিনি জানেন, তুমি ফিরবে এবং যথাসময়ে গিলবে।

বেশ বাবা, তর্ক করব না। গুরুজনের মুখে মুখে চোপা করতে নেই। তা সীতাকে প্রয়োজন কেন? আমাদের প্রজারা তো রামরাজত্ব চান। আর কথায় কথায় বলেন, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

সীতার কাছ থেকে আমাদের পাতাল প্রবেশের টেকনিকটা জানতে হবে। একমাত্র তেনারই জানা আছে। টাইমলি ঢুকে যাওয়া। বড় কায়দার জিনিস হে।

ওরা বলছিল অলিম্পিক দেখতে পাচ্ছে না। টিভির পর্দায় মোমবাতি কাঁপছে।

ওরা কারা?

ওই যে যারা ভোট দেয়।

ওদের কথায় কান দিও না। হ্যাংলা, হাঘরের দল। ভারত একটাও স্বর্ণ,

রৌপ্য, ব্রোঞ্জ কিছুই পায়নি। ঘুঁটের মেডেল পরে, কোটি টাকা প্যাসিফিকের জলে ফেলে ফিরে আসছে। আমরা তবু লোডশেডিং-এ এই মওকায় একটা গোল্ড মেডেল পেয়ে গেলুম।

ওরকম কোনও আইটেম তো প্রতিযোগিতায় নেই।

থাকলে নিশ্চয়ই পেতুম। তাছাড়া মডার্ন ডেকাথেলনে সামনের বার আমরা দল পাঠাব।



মডার্ন ডেকাথেলন কী জিনিস ?

কিছুটা পথ দৌড় । তারপর, বাধা । বাধার পর বাধা । কাঁটা ঝোপ । দুর্ভেদ্য জঙ্গল । এবড়ো খেবড়ো মাঠ । পাঁক । পেছল পথ । টিলার পর টিলা । শেষে একটা দেয়াল । দেয়াল টপকে জলা । জলা পেরিয়ে আবার দৌড় । কী, যারা রোজ অফিস করতে আসে তারা পারবে না ?

খুব পারবে স্যার । আর কানে কানে যদি একবার বলে দেওয়া হয় আজ মাইনের দিন, তাহলে তো কথাই নেই ।

যাও, আর একটা স্বর্ণপদক ঝুলিয়ে দিলুম জাতির গলায় । আরও একটা দিতে পারি ।

আর কিসে দেবেন ?

ভারোত্তলন নয় ভারবহন । পিঠে কে কত লোড নিতে পারে ! বাসে আমাদের একটা রোগাপটকা পিঠে দু দশটা ভোঁদকার ভার অক্লেশে নিতে পারে । যত চাপই আসুক শুয়ে পড়ে না । আর সামনের আসনে যদি লেডিজ থাকে তাহলে ধোলাইয়ের ভয়ে একেবারে খাড়া । মুখে শুধু করুণ আর্তনাদ—উঃ আর চাপবেন না দাদা ।

ঠিক বলেছেন । একেবারে অটল ।

তাহলে তৃতীয় পদকটিও পেলে । আর একটা চাই না কী ?

পেলে কে ছাড়ে ?

তাহলে নাও, চতুর্থ পদকটিও ঝুলিয়ে দিলুম গলায় । প্রতিযোগিতার নাম, কে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? বাসের জন্যে, কেরোসিনের জন্যে, র‍্যাশানের জন্যে, দুধের জন্যে, ইংলিশ মিডিয়াম থেকে গাবলু-গুবলু ছেলে বেরবে তার জন্যে, রিটায়ারমেন্টের পর পেনসান আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জন্যে । অপেক্ষা । পারবে ? কোনো দেশ. পারবে আমাদের সঙ্গে ?

অসম্ভব । হেরে ভূত হয়ে যাবে ।

কী কারণ

সব কিছুর কারণ জানো।

জেনে সন্তুষ্ট হও [অথ ধর্মোবাচ]

আমি . আমার এ অবস্থা কেন ? কাছা সামলাতে কোঁচা খুলে যায়। মাথার ওপর ছাতের বদলে তালিমারা ছাতা। লেংটি ইঁদুরের মত চেহারা। ছুঁচলো মুখ। ঝ্যাঁটার মতো গোঁফ। মরা কাতলা মাছের মতো ড্যাবা ড্যাবা চোখ। যে পথেই যাই সেই পথেই গণ্ডায় গণ্ডায় পাওনাদার। অথচ আমার পিতৃদেব না খেয়ে, ধার-দেনা করে লেখাপড়া শেখালেন। ধর্ম কইলেন, বাবা পাঁচুগোপাল সৎপথে থেকো বাবা। সদা সত্য কথা বোলো। সৎপথের রোজগারে যদি ডাল ভাতেও থাকো, জানবে শান্তিতে রইলে। ঘোড়ার ডিমের শান্তি। দেনার দায়ে মাথা বিকিয়ে গেল। পাওনাদারে ছেঁকে ধরছে। নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে। ড্রপারে করে তেল ঢেলে শ্রীবৎস রাজার কায়দায় মাছ ভাজা। তাও মাসে একবার। বাকি কদিন বাগান চচ্চড়ি আর পেরেক-মনি চালের ভাত। অথচ রামা হো, দেড় লাখ টাকা কাঠার জমি কিনে ছলাখ টাকার বাড়ি বানিযে দিল্লি দৌড়চ্ছে মারুতির জন্যে। যে দেশের মানুষের ঘাড়ে এই সাংঘাতিক করের বোঝা সে দেশের মানুষ কীভাবে এত ধনী হয়! এই তো সেদিন এক ফ্ল্যাটে ডাকাতি হল। লুঠের পরিমাণ টাকার অঙ্কে সাড়ে দশলাখ। উরেব্বাপ! আমাদেব ফ্যামিলির লক্ষ্মীর ভাঁড়ে যা পড়ে তাই আমাদের সেভিংস। আমরা স্বপ্নে মণ্ডা-মেঠাই খাই। স্বপ্নে ফ্ল্যাটেব মালিক হই। স্বপ্নে বিলেত-ফেরত ছেলের গলায় গোড়ের মালা পরাই। কেন এমন হল? কেন এই বৈষম্য।

উত্তর : এর কারণ জানতে চাও বৎস। অতি সহজ কারণ। সৃষ্টির মুহূর্তে ঈশ্বর বহু শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। যা উচ্চারণ করলেন তাই সৃষ্টি হল। যেমন বললেন, ছাগল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাব্যা করে কয়েক কোটি ছাগল বেরিয়ে এল। বললেন গাধা। গাধা হয়ে গেল। জল। জল এসে গেল। বললেন, ধনী। সঙ্গে সঙ্গে সাতমহলা বাড়ি। ঝাড়লণ্ঠন। আলবোলা। জুড়িগাড়ি, পালঙ্ক সমেত কিছু মানুষ সৃষ্টি-কল থেকে বেরিয়ে এল। বললেন, গরিব। সঙ্গে সঙ্গে একপাল



অপগণ্ড নিয়ে নেমে এল হাড়হাভাতের দল। বাবা, এ হল তাঁর ইচ্ছে। কেউ লুচির ছাল ছাড়িয়ে ক্ষীরে চুবিয়ে চুকুর চুকুর খাবে, আর কেউ সারা জীবন খাবো খাবো করে ঘুরেই বেড়াবে। এর হাত থেকে রক্ষা পাবার একটাই উপায় ছিল—এদেশে না জন্মে ও দেশে জন্মান।

॥ উপদেশামৃত ॥

জীবগণ [পরে জনগণ] জন্মাবার সময়
খুব সাবধান ॥ এদেশে জন্মালে
এই রকমই হবে, ওদেশে জন্মালে ওই রকম ॥

আমি : তথাস্তু ! আমি এইবার জানতে চাই ওঁদের কাজে আর কথায় কোনও মিল না থাকার কারণ কী !

উত্তর : অতি সহজ কারণ। মুখ বলে কথা, হাত করে কাজ। মুখ হাত নয়, হাত মুখ নয়। সৃষ্টির সময় ঈশ্বরই চেয়েছিলেন কাজে আর কথায় যেন মিল না থাকে। তা না হলে ঈশ্বর মুখ আর হাত এক করে দিতেন। যেমন করেছেন জোঁকের। শরীরটাই মুখ। সেই কারণে জোঁকের কাজে আর কথায় এত মিল।



স্রেফ বক্ত চাই। আই ওয়ান্ট ব্লাড। মানুষের মধ্যে যাবা জোঁক-শ্রেণীর তাদেরও কাজে আব কথায় অমিল নেই—তাদের এক কথা—মুনাফা চাই। আই ওয়াণ্ট প্রফিট। মাল হাটাও। সিমেণ্ট হাটাও, মিট্টি লাও মিট্টি। গঙ্গা মায়ীকী পোইত্র মিট্টি। চা হাটাও। পেঁপুয়াকা পাতা লেআও। মীবচা হাটাও। জয় পবন-সুত ইঁদুমাড়জীকি জয়। পেঁপুয়াকা বিচি লাও। তাহলে বৎস!

॥ জ্ঞানলহবী ॥

যে অঙ্গেব যাহা কাজ তাহাই করিবেক। মানুষের দুইটি হস্ত। দক্ষিণ ও বাম। সেই কারণেই বাম হস্তের বোজগাবেব উদ্ভব। দুইটি পদ। একটি সুখের একটি দুঃখেব। দুই নয়ন। শুভ আর অশুভ। মস্তক কিন্তু একটি। দেশলাই কাঠির সহিত তুলনীয়। দেহের উপব মুণ্ড। ঘষিলেই জ্বলিয়া ওঠাই যাহার ধর্ম। ঘর্ষণে জ্বলন। জ্বলনেই প্রশ্ন। তাহা হইতেই বিপ্লবাদি চিন্তার উদ্ভব এবং লয়।

আমি. এইবার বেঁচে থাকার কাবণটা জানতে পাবলেই বাঁচার জন্যে আর

কোনও ক্ষোভ থাকে না।

উত্তর : অতি সহজ। পাল্টা কিছু প্রশ্নের মধ্যেই বাঁচার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। কুচুরিপানা কেন বাঁচে ? স্রোতে এধার ওধার করবে বলে। শালপাতা বাঁচে কেন ? এঁটো পাতা হয়ে ঝড়ে উড়বে বলে । বাঁশ কেন বাঁচে ? খোঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে। শ্মশানে চিতায় খোঁচা মারার জন্যে। পিঁপড়ে বাঁচে কেন ? পায়ের চাপে মরার জন্যে। ঘাস বাঁচে কেন, গরুতে খাবে বলে। তোমার বাঁচার কারণ :

[এক] তোমার মত কিছু অপগণ্ড তৈরি করবে বলে।

[দুই] সুদ গুণে মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে আসার জন্যে।

[তিন] মেয়ের বিয়েতে তোমারই মত আর একজনকে পণ দেবার জন্যে।

[চার] যে ছেলে জীবনে পাশ করবে না তার জন্যে খরচ করে ভুট হবার জন্যে।

[পাঁচ] বাত, অম্বল, বদহজমে মরার জন্যে।

[ছয়] স্ত্রীর সঙ্গে গাঙশালিকের মত অষ্টপ্রহর ক্যাচর ম্যাচর করার জন্যে।

[সাত] সমালোচক হবার জন্যে।

[আট] বর্ষার রাতে ভুগে ভুগে মরে গালাগাল খাবার জন্যে।

[নয়] ট্যাক্স দেবার জন্যে।

[দশ] প্রতিবেশীর পেছনে শলাকা প্রয়োগের জন্যে।

খুঁজে যাও, খুঁজে যাও। দেখবে বেঁচে থাকার বহুবিধ কারণ। তুমি না বাঁচলে মশারা যে উপবাসে মরবে বাছা।

বাঁচাও বাঁচাও

'দাদা, অনেকক্ষণ কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছি ভাই। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আর পারছি না।'

'চুপ, গণতন্ত্র এখন বিপন্ন।'

'আপনি তো সেই তখন থেকে গল্প করছেন।'

'বেশ করছি। আপনি কি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চান। এ মাল গণতন্ত্রের শত্রু। বেশি ট্যাঁফোঁ করলে মাথায় ঘোল ঢেলে ছেড়ে দোব। চুপ করে দাঁড়ান। সময় হলেই নেওয়া হবে।'

'কত বড় লাইন হয়েছে দেখেছেন?'

'হোক।'

॥ ২ ॥

'ভাই আজ আর ফিরিও না। বৃদ্ধ মানুষ। দু'বছর হয়ে গেল। এখনও পেনসান পেপার তৈরি হল না। কীভাবে দিন চলছে আমিই জানি। আজ একটু ফাইলটা ধর ভাই।'

'চোপ্, গণতন্ত্র বিপন্ন। মন-মেজাজ খিচড়ে আছে। মন ভালো হলে দেখা যাবে। আজ বাড়ি যান। এক মাস পরে আসবেন।'

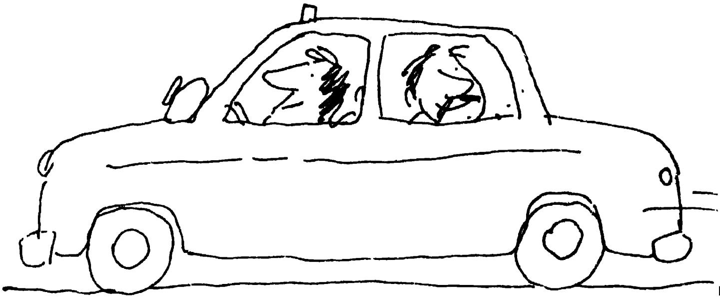
'আবার এক মাস পরে! তদ্দিন কী বাঁচবো ভাই।'

'না বাঁচেন, না বাঁচবেন। আগে গণতন্ত্র জিন্দা হোক। এত বড় একটা ন্যাশান্যাল ক্রাইসিস ইনি নিজের পেনসানের জন্য হেদিয়ে মরছেন।'

॥ ৩ ॥

'ভাই সাড়ে তিন ঘণ্টা হল জ্যামে আটকে আছি। সঙ্গে রুগী। হাসপাতালে যেতে হবে। যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন। জ্যাম খোলার চেষ্টা করুন।'

'চুপ্, গণতন্ত্র বিপন্ন। চুপচাপ বসে থাকুন। যেদিন নড়বে সেদিন চলবেন।'



'সঙ্গে রুগী।'

'তাতে কী হয়েছে? গণতন্ত্র শুয়ে পড়েছে। মানুষ আর কদ্দিন খাড়া থাকবে?'

॥ ৪ ॥

'স্যার বাস ধরব বলে স্টপেজে দাঁড়িয়েছিলুম এমন সময় একটা ট্যাকসি এসে পাশে দাঁড়াল। তিনটে ছেলে সটাসট নেমে এসে পটাপট সব নিয়ে পালাল। এই দেখুন আণ্ডারওয়্যার আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে এসেছি। হায়, হায়, আমার ঘড়ি, আমার টাকা, আমার সোনার চশমা। হায় হায়।'

'তা আমাকে কী করতে হবে?'

'ওই জায়গাটায় প্রায়ই এইরকম হচ্ছে, একটা কিছু।'

'কী কিছু। দেখছেন গণতন্ত্র এখন হেভি হেল্‌পলেস। এই অবস্থায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেবার চিন্তা আসে কী করে!'

'আমার যে সব কেড়ে নিয়ে নাঙ্গাবাবা করে ছেড়ে দিলে!'

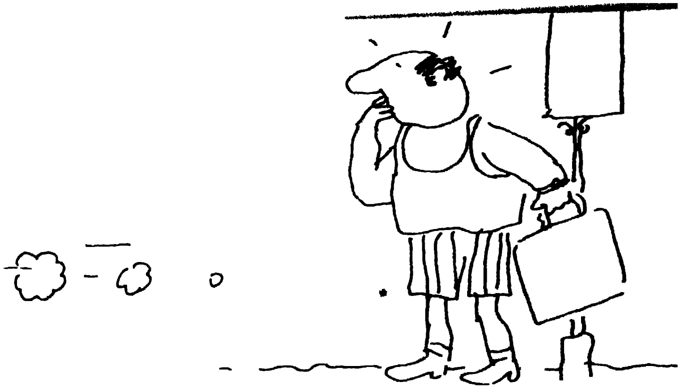
'তা দিক। আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার তো কেড়ে নেয়নি!'

'আমার গণতান্ত্রিক অধিকার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ভোট। আপনার ভোটাধিকার কেড়ে নিতে পেরেছে? পাঁচ বছর অন্তর আঙুলের ডগায় বিন্দু হয়ে জ্বল জ্বল করে।'

'এখন তাহলে আমি কী করব?'

'কী আর করবেন, এই খবরের কাগজটা নিম্নাঙ্গে জড়িয়ে বাড়ি চলে যান।



বাড়ি গিযে চোখ বুজিযে প্রার্থনায বসুন। প্রে, প্রে ফব ডেমক্র্যাসি। মনে মনে বলুন, হে ঈশ্বব খেযে না খেযে যদ্দিন বাঁচব, তদ্দিন আমি যেন ভোট দিয়ে যেতে পাবি। হেঁকে সমস্ববে বলুন জন্ম হইতেই আমবা ভোটের জন্য বলিপ্রদত্ত। কেমন? লক্ষ্মী, সোনা আমাব। কাগজেব স্কার্ট পরে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!'

॥ ৫ ॥

'ভাই একটু কেবসিন তেল না হলে যে বাত অচল। দয়া করো।'

'গণতন্ত্র সচল না হলে তেল মশাই মিলবে না। অন্ধকারেই থাকুন।'

'ভাই গণতান্ত্রিক তেল আমি চাই না। কিঞ্চিৎ বেশী দামই দিচ্ছি, এক বোতল অগণতান্ত্রিক তেলই তুমি দয়া কবো।'

'সন্ধেব দিকে আসুন। চেষ্টা কবে দেখবো।'

॥ ৬ ॥

'পটল এখনও সাত। মাছ তেড়ে আসছে। রোজ মাছের বদলে বাজার থেকে গোটাকতক মাছি ধবে নিযে যাই। কী হচ্ছেটা কী? বাজার কী আর ঠিক হবে না?'

'আবে মশাই গণতন্ত্র খাবি খাচ্ছে, আপনি বাজার দর নিয়ে সাতসকালেই নতুন বউযের মত নাকে কান্না জুড়লেন। যান বাড়ি যান। এখানে দাঁড়িয়ে আর বাজার খাবাপ কববেন না। এই নিন একটা কানা বেগুন। ফিরিতে দিলুম। পুড়িয়ে

খাবেন। উঃ গণতন্ত্রের কী অবস্থা ! মাথা খারাপ করে দিলে। রঙ করা পটল সাত টাকা, সাত টাকা। ইলিশ ইলিশ, পঞ্চাশ পঞ্চাশ। পোনা নড়ছে চড়ছে, ষোল, সতের, সতের, ষোল। গণতন্ত্র হেঁচকি তুলছে।'

॥ ৭ ॥

'শাড়ি ছিঁড়েচে'। 'পরে হবে, গণতন্ত্র বিপন্ন'। 'সংসাব খরচেব টাকা দাও।' নেই। লকআউট চলেছে। গণতন্ত্র মৃত্যুশয্যায়।' 'স্কুলেব মাইনে।' 'পরে। গণতন্ত্র আগে সারভাইভ করুক।' 'জেলায জেলায বন্যা।' 'সাঁতার শেখ। গণতন্ত্র সাঁতার কাটছে চক্রান্তের গভীব জলে।'

॥ ৮ ॥

'জঞ্জাল, তুমি জমে আছ কেন ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।' 'বাঘা-বাস তুমি চল না কেন ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।' 'পথ তোমাব এ অবস্থা কেন ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।' 'রাস্তার আলোক সমূহ তোমাদেব জ্যোতি কী হল ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।' 'হাঁড়ি, তুমি চড়না কেন ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।' 'স্কুল-কলেজ খোল না কেন ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।' 'শিক্ষিত-যুবক চাকরি নেই কেন ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।'

॥ ৯ ॥

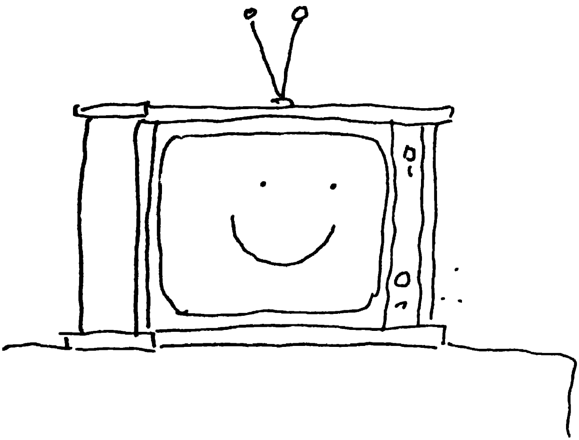
'মশাই ধার করেন, শোধেন না কেন ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।'
'বউকে ধরে পেটান কেন ?' 'গণতন্ত্র বিপন্ন।'
'চুরি করে ফাঁক করেন কেন ?'
'গণতন্ত্র নেই বলে।'

বাজনার চেয়ে খাজনা বেশী

টিভিব সামনে দাঁড়িয়ে কান ধরে দশবার ওঠবোস করলুম। সালাম ভাই। যখন ঢুকেছিলে তখন অনেকেই বলেছিল, খাল কেটে কুমীর ঢোকালে, বুঝবে ঠ্যালা। এর হবেক ব্যামো। ডাক্তার-বদ্যি নিত্য লেগেই থাকবে। ভিজিটও অনেক। দাওয়াইও মহার্ঘ। ওব সেবা করতে করতেই দেউলে হবে। তাছাড়া কর্মনাশা। উঠতিবাবুদেব মন কেতাবে ধরে রাখতে কত মধুই না ঢালতে হয়। ঢোকালে মনউচাটন যন্ত্র। যে কোনও বকমে তিরিশ বত্রিশ পেয়ে ল্যাংচাতে, ল্যাংচাতে আমাদের অলিম্পিক দৌড়বীরের মত ক্লাস-প্রোমোসানের বাধা টপকাচ্ছিল, সে এবাব ট্র্যাকেব বাইরে চলে গিয়ে অন্য লাইন ধরবে। সন্ধ্যের পর পুরো পরিবার হাঁ কবে বসে থাকবে ছায়া-তামাসার সামনে। সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে জল চেয়ে জল পাবে না। এক কাপ চায়ের জন্যে টাঙিয়ে থাকতে হবে ইন্টারভ্যাল না হওয়া পর্যন্ত। পয়সা খরচ করে কী বাঁশ ঢোকালে বুঝবে পরে।

কমরেড তখন বুঝিনি, আজ এই মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, তুমি কী বস্তু! কত বড় বাঁশ তুমি আজ বুঝলুম কমরেড! বিদ্যুতামৃতের অভাবে তোমাতে আজকাল কদাচিৎ প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এতখানি শরীর নিয়ে দেড়কাঠা জায়গা জুড়ে ঘটেব মত বসে আছ ঘরের কোণে। জীবনের আধুনিক আয়োজনে মানুষে আর ঘুঘুতে বিশেষ তফাৎ নেই। ঘর মানে খুপবি। তার মধ্যে ডেরি-ডামরি সৃষ্টি জিনিস। মধ্যবিত্তের কোষ্ঠীতে ফেলা শব্দটা লেখা নেই। কাকের স্বভাব। যা পাবে সব তুলে এনে বাসায় ঢোকাবে। নড়বার চড়বার জায়গা নেই। উঠতে বসতে মাথা ঠোকাঠুকি। ছাদে আবার পেখম মেলা। পাখির দোল খাবার ব্যবস্থা। ঘুড়ির লাট খাবার খোঁচা। পাছে ডাণ্ডা ঝরে যায়, ঘুরে গিয়ে উড়ে আসা ছায়ার পথ থেকে তেরছা হয়ে, পর্দায় নৃত্য শুরু করে দেয়, সেই ভয়ে সদা-সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখা। হেই হই করে তেড়ে যাওয়া। নাগাল পেতে গিয়ে ছাদ থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাবার আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে ওঠা।

তোমার দেওয়া সব জ্বালা সহ্য করেছি কমরেড। সব শেষ যা দিলি পোড়ার



মুখো। ও মুখে তো হাসি আর ফোটে না। সদা অন্ধকার। এত বড় একটা অলিম্পিক গেল, ক'দিন তুমি খেল দেখিয়েছ মানিক। এই আছে, এই নেইয়ের যুগে শুরু হতে না হতেই ফুস। নয়তো ফুস দিয়েই শুরু। যেমন হয়েছিল নেহরু কাপ, ওয়ার্লড কাপ-এর সময়। কমরেড তুমি ফ্যাসিস্ট। মুসোলিনির মতই ট্রেটার।

তিনখানা ফর্মের খেলা যেন তিন তাসের খেলা। ট্যাকস, ট্যাকস না বলে প্রণামী বলাই ভালো। প্রণামী দেবো কী ফর্ম যোগাড় করতেই কালঘাম ছুটে গেল। ওঁরা ঠিকই বলেন, কলকাতায় টাকা উড়ছে। ধবতে জানলেই ধরা যায়। যে ফর্ম বিনা পয়সায় পাওয়া যায় সেই ফর্মই জামা ফর্দাফাঁই করে সিনেমার টিকিটের মতো কেন।

এইবার সেই ফর্ম কে বুঝবে! ভরার কায়দা জানা জ্ঞানীপুরুষের অনুসন্ধান করো। এই ফর্ম কম্পিউটারে খাবে। অতএব নম্বর, তারিখ, বসাতে হবে শূন্যের খেলায়। তিন শূন্য, দুই শূন্য। কমরেড তুমি যে কত শূন্য বোঝা গেল এই শূন্য-পুরাণে। অনেকেই জ্ঞানী ব্যক্তি ধরে ফেললেন। সদক্ষিণা ফর্মপূরণ। জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে কাজিয়া। রক্তগঙ্গা বয় আর কী। তুমি ব্যাটা বেপাড়ার জ্ঞানী। ফর্ম ভরে পকেট গরম করছ, পাড়ার জ্ঞানী কী দোষ করেছে! ওদিকে জমার লাইনে তাণ্ডব, এদিকে ভরার লাইনে মার কাটারি। সে কী 'আহামরি' ব্যাপার! ভদ্দর লোকে সিনেমা দেখার টেকসো দিচ্ছে গো!

না গো মাসী টেক্সো লয়, লিজেদের পিণ্ডি লিজেরাই দিচ্ছে।



সর্পিল লাইন এঁকে বেঁকে চলে গেছে। টাকে পিচবোট চাপা দিয়ে ভাদুরে রোদ সামলাবার চেষ্টা। জনডিসে না ধরে। ভেতরে যাওবা একটা পাখা ঘুরছিল। পৌঁছতে পারলে বাতাসের প্রতিশ্রুতি। লোডশেডিং-এ ফুস্। তির তির করে ঘাম নামছে। মেজাজ তিড়বিড়িয়ে উঠছে। লাইন থাকলেই বেলাইনও থাকবে। যে দেশে সবেতেই লাইন সেদেশে ক্লাসলেস সোসাইটি হবে! বাহানা ছোড়ো ইয়ার!

লাইনে বেলাইনে প্রথমে শুরু হল ক্ষান্তমণি দাসীর তরজা। ঢোল-কাঁসী সহযোগে। তারপর সম্বন্ধী সম্বোধন। তারপর ইংরেজী ডিসকো। তৎপরে হিন্দী গণনাট্য। অবশেষে আদি অকৃত্রিম কুরুক্ষেত্র। কিল-চড়-লাথালাথি : কী অপূর্ব কালচারাল অ্যাটমসফিয়ার। টিভি ট্যাঙ্গো।

ফিসফিসে বৃষ্টি। যেন ইস্তিরির আগে জলছেটানো। পরক্ষণেই রোদ, চাঁদি ফাটানো। ব্র্যাভো বাঙালী। এর নাম সিসটেম। সাধে সায়েবরা নেটিভ বলত! নেটুদের ব্যাপারই আলাদা। সব ব্যাপারেই নাস্তানাবুদ। চিল্লে, পা মাড়িয়ে, জামা ছিঁড়ে, চশমার কাঁচ ভেঙ্গে, ঘুষোঘুষি করে। হচ্ছেটা কী! না ট্যাঁক খালি করে

কিছু অর্থ-দণ্ড দেওয়া। নেওয়া নয় দেওয়া। পাপের ভোগ। নে ব্যাটারা টিভি দ্যাখ। বাঁশ কাকে বলে এবার বোঝ!

'হাত চালান, হাত চালান' রব উঠছে থেকে থেকে। কার হাত কে চালায়! হাত এখন দুটো ব্যাপারে খুব চলে, ঘুষ আর ঘুষিতে।

মা জননীরা রিটায়ার্ড বৃদ্ধদের লেলিয়ে দিয়েছেন। স্কুল থেকে আজ আর নাতিদের আনতে হবে না। আজ টিভির খাজনাটাই দিয়ে আসুন। এতকাল শুনে এসেছি প্রবাদ, খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। এবার তা উল্টে গেল, 'বাজনার চেয়ে খাজনা বেশি।' একেই বলে বিপ্লব।

স্কুলফেরতা অবোধ শিশুরা হাঁ করে মজা দেখছে। 'তোমার ওই জলের বোতল থেকে এক ঢোঁক জল খাওয়াবে বাবা।' দেবশিশু নারাজ নয়। তার প্ল্যাস্টিকের বোতল বৃদ্ধের শীর্ণ হাতে। একজন একটা ললি-পপ উপহার দিয়ে গেল। লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চোষা যাবে। লং লিভ রেভলিউশান। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

'আরও কত দূরে?'

'কী সেই আনন্দধাম?'

'না কাউন্টার।'

কাউন্টার আছে। পাখি নেই। এ পাখি বড় ছটফটে: 'সেই গানটা একবার শুনিয়ে দিন না, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক হরিনামের মাস্তুলে।'

ট্যাক্স তো দিয়ে এলুম কমরেড, এবার অ্যামুজমেন্ট দাও। মুখ কালো করে বসে থাকলে চলবে না। আজ সারাবাত গান শোনাতে হবে। স্টকে গান না থাকে, গ্লোব-ঘোরা নিউজই শোনাও।

রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন, কাল সকালে উঠে প্রথমেই যার মুখ দেখব তার হাতেই কন্যা সমর্পণ করব। আমারও প্রতিজ্ঞা কাল সকালে, বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। প্রথমেই যার মুখ দেখব তাকে দান করে দেবো।

কেউ নেবে না। কেউ নেবে না ও বাঁশ। বাজনার চেয়ে যার খাজনা বেশি।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি

আবার পুজো এসে গেল। মা আসছেন দোলায় চেপে। তা আসুন। মা আমাদের বড় প্রিয়। বড আদরের। যদিও আমাদের চুল খাড়া হয়ে যাবার দাখিল। হাতে বিশাল এক লিস্ট। পকেটে সামান্য কয়েকটা টাকা। মাইনের তলানি, বোনাসের মুচকি হাসি। লিস্টে এর শাড়ি ওর ফ্রক, বামুনদির থান, পিসীর গরদ, ভুনির বাবাস্যুট। বছরে বছবে লিস্ট বড় হয়েই চলেছে। মেজাজ খারাপ করলে চলবে না। সব দেনা-পাওনা হাসি হাসি মুখে সারতে হবে। ঈষদুষ্ণ হলেও চলবে না। তা এযুগে অসুবিধের কিছু নেই। চোখের কোণে দু ফোঁটা গ্লিসারিন গলিয়ে চিত্রতাবকারা কত মৃত্যুর দৃশ্য পাব করে দিলেন। দেখন হাসি আজকাল ঠ্যাঙাড়েব মুখেওলেগে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে হুলো বেড়ালের মত ন্যাজ ফুলিযে ধুম ঝগড়া করে গোবদা মুখে অফিসে ঢুকে বড় কর্তাকে কী সুমধুর সম্ভাষণ, 'কেমন আছেন স্যার ?'

এ বছর সব কিছুই যেন কামডাতে আসছে। গামছায় পাড় বসিয়ে টাঙ্গাইল বলে হাঁকছে। দাম একশোব ওপর। দোনলা বানাবার একটা পিস একশো থেকে শুরু করে চড়তে চডতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, দেখার সাহস হয় না। হার্টের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। টেঁসে গেলে কে দেখবে। গেরস্থকে তখন আবার নতুন লিস্ট বানাতে হবে সপিণ্ডকরণের। একটি মালসা, এক কেজি আলো চাল, একছড়া কাঁচকলা, কলার পেটো, প্যাঁকাটি।

রাগীকে বেশি খোঁচাতে নেই। বাজার যখন রেগে আছে তখন আশপাশ থেকে আলগোছে কেনাকাটা করাই ভালো। ধরি মাছ না ছুঁই পানি। তারও কী উপায় আছে। বিপন্ন-গণতন্ত্রের যুগে সংসারের সভ্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের সামান্যতম চেষ্টাতেই সংসারে লালবাতি জ্বলে যাবার সম্ভাবনা। সদরে ঝাণ্ডা পুঁতে দেয়ালকে সম্ভাষণ করে ঠারেঠোরে কথা। 'জেনে রাখা হোক চা ফুরিয়েচে। নিয়ে এলে তবে হবে।' 'বলে দাও বাজারের থলে জানলার গ্রিলে ঝুলছে।' এই রকম উইম্বলডন-টেনিস খেলোয়াড়ের কায়দায় কথা সার্ভিস করার অর্থ, ডেরিডামরি নিয়ে মার্কেটিং-এ বেরনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এমন এক

অগণতান্ত্রিক ঘোষণা। লোকটা বলে কী ? হিটলারের বাচ্চা। হোল ফ্যামিলি সম্প্রতি হিটলার দেখে এসেছে। সংসারের বড় জেনানাটি সেই থেকে নিজেই হিটলার। চিৎপুর থেকে একজোড়া বাটার ফ্লাই গোঁফ এনে নাকের তলায় সেঁটে দিলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুজোর আগেই বাধিয়ে দেবে। প্যাণ্ডেলে মা অসুরদলনী, এদিকে মা সংসার-লণ্ডভণ্ডকারিনী।

শ্যামলীর শাড়ি শ্যামলী পছন্দ করবে। পছন্দ নয়, চয়েস করবে। রুণুর ফ্রকের কাপড়ের ডিজাইন রুণু চয়েস করবে। ঘর্ঘরী, আমাদের বাড়িতে কাজ করে। যখন তিন মাসের শিশুটি তখন নীলমণি হয়েছিল। তার মায়ের মুখে শোনা। নীলমণি মানে নিউমনিয়া। বুকে ঘড়ঘড় শব্দ হত। সেই থেকে নাম হয়ে গেছে ঘর্ঘরী। তিনি এ বছর থেকে শাড়ি ধবাব সুমধুর বাসনা প্রকাশ করেছেন। অতএব কেনাকাটার মিছিলটি এ বছর রাজ-ভবন-অভিযান-মিছিলের আকার নেবে। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই সারা যায়। একটা ফেস্টুন। দাবিরও শেষ নেই। স্নেহময় শাসন ব্যবস্থায় সন্তানদেব দাবিব যাতে কমতি না হয় তার



জন্যে পিতাদের কত ব্যবস্থা ! আহা আমার বাছারা বারে বারে আসুক । তাদের মুখে আদো আদো আব্দার শুনতে কী ভালই না লাগে ! যাদু আমার ! জল দাও, আলো দাও, তেল দাও, র‍্যাশান দাও, দুদু দাও, মাগ্‌গি ভাতা দাও । বেশি তেলানি দেখলে দু-চার রাউণ্ড চালিয়ে দাও ।

বাড়ি, বাড়ি থেকে পল্টন বেরচ্ছে । গণতান্ত্রিক কেনাকাটায় । ক্রেতা একজন । বাছাই করনেঅলা সাতজন । বাসের পাদানিতে কর্তারা লাট খাচ্ছেন । একহাতে পকেট সামলাচ্ছেন । সম্বন্ধীরা মেরে না দেয় । কণ্ডাক্টার ঠেলেঠুলে গিন্নিকে বাসের গর্ভজাত করার চেষ্টা করছে । আউর ঠেলো হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও । আওর থোড়া হেঁইও । এ যুগের মানুষের থেকে থেকে লিঙ্গ চেঞ্জ করে । বাইরে যখন ঘুরছিলুম তখন ছিলুম পুংলিঙ্গ । কী হম্বিতম্বি । যেই বাড়ি ঢুকলুম হযে গেলুম স্ত্রীলিঙ্গ । মেনিমুখো বেড়ালটি । কী মোলায়েম গলার স্বর । ন্যাজ খাড়া করে পায়ে পায়ে ঘোরো । গলায় ঘোঁতব ঘোঁতর শব্দ । বিয়ের পিঁড়েতে বসেছিল স্ত্রীলিঙ্গ । যেই বাড়িতে এসে ঢুকল পুংলিঙ্গ । কী তার দাপট ! অনবরত



ফায়ারিং চলেছে। অটোমেটিক রাইফেল। সবসময় তেলে-বেগুনে। আর যখন বাসে বা ট্রেনে তখন আমরা সবাই ক্লীবলিঙ্গ। ছেলেও নই, মেয়েও নই, মাল। ঠেলে তোল। মেরে নামা। ঠেসে ধর। আর আশ্চর্য, ওই সময় আমাদের শরীরেরও কোনও অনুভূতি থাকে না। একেবারে মালের মতই ক্লীব। ময়দার তাল হলে পাঁউরুটি হয়ে নেমে আসতুম। যাদের মিঠে স্বভাব তারা নেমে আসত বান হয়ে। যাদের প্যাঁচানো স্বভাব তারা নেমে আসত টুইস্ট লোফ হয়ে। এই সত্যটি আবিষ্কারে প্রকৃতই খুশি—মানুষ চাপে পড়লে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়ে যায়। খুব হম্বিতম্বি মেরে থোবনা উড়িয়ে দোবো। গলার কাছে জাস্ট একটা দাড়ি কামাবার ব্লেড, বাস্ একেবারে বোবা।

কাউন্টারে যাঁরা আছেন তাঁরা অতিশয় মনস্তাত্ত্বিক। চোখের ইশারায় বোঝাতে চাইছি, শাড়ির ওই লটটা দেখিয়ে আমাকে আর বাঁশ দেবেন না। একেবারে দেউলে হয়ে যাব। বিড়ি খাবার পয়সাও থাকবে না। এখন তো তিনি আমার ইশারা বুঝবেন না। আমরা এই সময়টায় দ্বিতীয় সারির মানুষ। বি-ক্লাস সিটিজেন। তল্পিবাহক।

মা তো এই সময়টায় মূর্তিতে আবির্ভূতা হন না। তিনি মানবীতেই দশভূজা হয়ে কেনাকাটায় বেরিয়ে পড়েন। আমরা হলুম মহিষাসুর। পুজোর অর্থ এতদিনে পরিষ্কার। দশমীর দিন ঘরে ঘরে চারপায়ায় কর্তাসুর কাত। পরনে ট্যানা। ট্যাঁকে আধপোড়া বিড়ি। চোখে বৈভবশূন্য বৈদান্তিক দৃষ্টি। দেবী দেউলে করে দিয়ে সরে পড়েছেন। এখন ভরসা এক গেলাস ভাঙ। বুকে বুকে সমব্যথীর আলিঙ্গন। ভাইরে! শুভ বিজয়া। মায়ের সঙ্গে মা লক্ষ্মীও চলে গেলেন কৈলাসে। এই মধ্যমাসে হাতে হ্যারিকেন। মাস পয়লার অনেক দেরি।

এই অবস্থাব জন্যে দায়ী কে ? ওই কেন্দ্র, আবার কে ? সেখানেও এক দেবী, এখানেও এক দেবী। সবই দেবীর খেলা। রাজ্যের হাতে আরও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেবাব দাবিতে এই আমি শুয়ে পড়লুম।

আলোর বদলে আলেয়া

বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন। ধার্মিক যুধিষ্ঠির সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। একালের যুধিষ্ঠিরকে একালের ধর্ম প্রশ্ন করলেন, 'বলো তো বাছা, সবচেয়ে রসিক কে?'

যুধিষ্ঠির ভেবেচিন্তে বললেন, 'যাঁরা হঠাৎ হঠাৎ লোডশেডিং প্রকল্প চালু রেখেছেন তাঁরাই এ যুগের রসিক-পুরুষ প্রভু! এই আলো এক ফুঁয়ে সব অন্ধকার। মুখের ওপর ছাতা বন্ধের মতো।'

ধর্ম হাসলেন, 'তুমি দু নম্বর রসিক পুরুষদের কথা বললে। এক নম্বর কে?'

যুধিষ্ঠির অনেক ভাবলেন। মাথায় কিছু এল না। একবার ভাবলেন, যাঁরা রাস্তায় একের পর এক গর্ত খুঁড়ে চলেন তাঁরা, অথবা যাঁরা ম্যানহোলের ঢাকা নিয়ে সরে পড়েন তাঁরা। একবার ভাবলেন তাঁরা, যাঁরা একই সঙ্গে বন্ধ আর বন্ধবিরোধী নীতি সমর্থন করেন। শেষে কূল-কিনারা না পেয়ে আত্মসমর্পণ করলেন, 'পারলুম না প্রভু।'

ধর্ম বললেন, 'তোমার পকেটে দেশলাই আছে?'

'আছে প্রভু।'

'বের করো।'

যুধিষ্ঠির দেশলাই বের করলেন। ধর্ম নিজের ঠোঁটে একটা সিগারেট লাগিয়ে বললেন, 'নাও ধরিয়ে দাও।'

যুধিষ্ঠির বারুদে খ্যাঁচাক খ্যাঁচাক করে কাঠি ঘষতে লাগলেন। একটা গেল, দুটো গেল, তিনটে গেল। কাঠি ঘষতে ঘষতে বারুদের ছালচামড়া উঠে গেল। একটা যদিও বা জ্বলল। ফিড়িক করে নিবে গেল। অধিকাংশ কাঠির মুণ্ডু ভেঙে ছিটকে চলে গেল। যতই ঘষছে যুধিষ্ঠিরের উত্তেজনা ততই বেড়ে যাচ্ছে। রাগে ভেতরটা কষকষ করছে। হাত কাঁপছে। মনে মনে একবার শ্যালক সম্বোধন করে ফেলেছেন।

ধর্ম ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন, 'কী বুঝলে?'

'আজ্ঞে প্রভু রাশকেল।'

ধর্ম হেসে ফেললেন, 'এক নম্বর রসিক পুরুষ হলেন তাঁরা, যুধিষ্ঠির যাঁরা এই দেশলাই নামক বস্তুটি বানান। তাহলে শোনো। তোমার হাতে সময় আছে তো?'

'আছে প্রভু।'

'তাহলে এই ঢিবির ওপর আসন গ্রহণ করো।'

ধর্ম আর যুধিষ্ঠির পাশাপাশি বসলেন। ঢিবির একপাশ থেকে খুক খুক করে দু'বার কাশির শব্দ ভেসে এল। দু'জনেই ফিরে তাকালেন। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে পাশাপাশি বসে আছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আগাছার জঙ্গলে।

ধর্ম বললেন, 'ওহে তোমাদের যে সাপে কামড়াবে। জায়গাটা বাপু ভাল বাছা হয়নি। ছেলেটি উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, 'রেসের বই দেখছেন দেখুন। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে হবে না।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'রেসের বই মানে?'

'তোমার তো জানা উচিত। ভুলে গেলে! পাশা খেলতে গিয়ে বনবাসে গিয়েছিলে, মনে আছে! ঘোড়া, সাট্টা, তিন তাস, লটারি, সবই জোর কদমে চলছে। নাঃ এই জায়গাটা আমাদের জন্যে নয়। আমরা প্রেম-পারাবারে এসে পড়েছি। চলো, আমরা অন্য কোথাও যাই।'

যুধিষ্ঠির যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন, 'প্রভু যে দেশে এত প্রেম, সেদেশে রোজ



শয়ে শয়ে লাশ পড়ছে, প্রদেশে প্রদেশে কোস্তাকুস্তি চলেছে, কেন প্রভু ! প্রেম পারাবারে জাতির ভরাডুবি। এর কারণ কী।'

'যুধিষ্ঠির। তোমরা পঞ্চ-স্বামী দ্রৌপদীকে কী ভালবাসতে না ?'

'বাসতুম প্রভু।'

'তাহলে রাজসভায় যখন মায়ের কাপড় খোলার চেষ্টা হচ্ছিল, তখন তোমরা পাঁচ পাঁচটা বীর বসে বসে দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ কাটছিলে কেন ?'

'কী করব প্রভু ! দ্রৌপদীকে যে বাজি রেখে হেরে গিয়েছিলুম। আর কোনও উপায় ছিল না।'

'সেই একই ব্যাপার যুধিষ্ঠির এই দেশের এখন পাঁচশো স্বামী। পাশার দান পড়ছে। শকুনিমামার খিল খিল হাসি আর দুঃশাসনের শাড়ি ধরে টানাটানি। শ্রীকৃষ্ণ গীতা মাথায় দিয়ে যোগনিদ্রায়। তুমি বাপু পুরনো কাসুন্দি আর ঘেঁট না। এসো এই জায়গায় একটু বসা যাক।'

'স্থানটি বড় নির্জন প্রভু। ছেনতাই মেনতাই হতে পারে।'

'আমাদের আর কী নেবে ? প্রাণ ছাড়া আর কিছুই তো নেই আমাদের।



বোসো। দেশলাই-এর গল্প শোনো।'

'প্রভু লাল পিঁপড়ে ঘুরছে।'

'ঘুরুক। প্রতিবেশীর কামড়ের চেয়ে মিষ্টিই লাগবে। হ্যাঁ কী বলছিলুম ? রসিক দেশলাই। গোটা কতক ঢ্যাঙা গলা চিমনি কিনেছি। যাকে তোমরা বল পিকক ল্যাম্প। আলো বেশ ভালই হয়। সেদিনে কী হল শোনো ! ধাঁই করে আলো নিবে গেল। হাতড়ে হাতড়ে চিমনি বের করে আনলুম। জিরাফ-গলা চিমনি খুলে মেঝেতে রেখে, দেশলাইয়ের খেল শুরু করলুম। খ্যাঁচ খ্যাঁচ। বাঙালীর মত চমকায়, জ্বলে না কিছুতেই। মেজাজ চড়ছে। হাতের জোর বাড়ছে। ডবল কাঠি, ট্রিবল কাঠি একসঙ্গে করে জ্বালাবার চেষ্টা। একা না পারিস, সকলে মিলে জ্বলে ওঠ। ফিস করে একটা যাওবা জ্বলল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ফুস্। শুনে রাখ যুধিষ্ঠির গুমট দিনে যদি বাতাস চাও তো একের পর এক দেশলাই জ্বেলে যাও। ঝড় বয়ে যাবে। অবশেষে কী হল জান ! ধৈর্য হারিয়ে বারুদের গায়ে জোরে কাঠি মারলুম। অন্ধকারে হাত ফসকে গেল। চিমনি ছিটকে চলে গেল, এ কোণ থেকে ও কোণে। ভাঙা কাঁচের হাসি। বুঝলে যুধিষ্ঠির সবচেয়ে বড় রসিক তারা যারা স্বাধীন দেশলাই তৈরি করে। বুকে আগুন, মুখে আগুন। ঘুমিয়ে আছে। সেই ঘুমিয়ে আছে শিশুব পিতা, সব শিশুরই অন্তরে ! বিদেশী দেশলাই চাই। সেই আগুনে যদি স্বদেশী দেশলাই জ্বলে ! স্বদেশী চেষ্টায় সব চুরমার।'

'বুঝেছি প্রভু জ্বলতে চায় তবু জ্বলে না। জ্বালাবার চেষ্টায় ছটফট। যত ছটফটানি তত ভাঙন।'

'শোনো বৎস। শেষ রসিকতাটি শোন। যার নাম ভাগ্য। কাঠি একদিন জ্বলেছিল। অন্ধকারে তাড়াতাড়ি পলতে বাড়াতে গেলুম। বামে ঘোরাব, না ডানে ঘোরাব। খেয়াল নেই। পলতে তলিয়ে গেল তেলের গর্ভে। হাতের কাঠি হাতে জ্বলে, হাতেই নিবে গেল। দীপের বদলে ফোসকা।'

পুরনো জুতো জোড়া

শৈশবে একটি গল্প পড়েছিলাম। নাম, পিটার স্টিভেনসনের বুট জুতো।

স্টিভেনসন ছিল চাষী। তার এক জোড়া বুটজুতো ছিল। হঠাৎ একদিন তার মনে হল, জুতো জোড়া খুব পুরনো হয়ে গেছে। এইবার এক জোড়া নতুন জুতো না কিনলেই নয়। পুরনো জুতো জোড়া বিক্রি করে যা পেল তার সঙ্গে আরও কিছু টাকা যোগ করে এক জোড়া নতুন জুতো কিনে আনল। পায়ে পরে হাঁটাচলা করতে গিয়ে মনে হল অস্বস্তি হচ্ছে। চলে তেমন সুখ পাচ্ছে না আগের মত। বাজারে গিয়ে জুতো জোড়া বেচে, আরও কিছু টাকা যোগ করে আবার এক জোড়া কিনে নিয়ে এল। দুর্ভাগ্য স্টিভেনসনের। এ জোড়াও সুবিধেব হল না। এই ভাবে স্টিভেনসন এক এক জোড়া কিনে আনে, পছন্দ হয় না, আবার বিক্রি করে। কিনে আনে নতুন জোড়া। তাব কাণ্ড দেখে স্ত্রী বিবক্ত হয়। সাত বারের বার যে জোড়াটা এল, স্টিভেনসন পায়ে দিয়ে ভীষণ খুশি হল। আহা এই তো জুতো। সারা রাত ঘরের কাঠের মেঝেব ওপর ঘুরতে লাগল চলার আনন্দে। একটুও লাগছে না। একেবারে ফিট।

বিরক্ত হয়ে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে, 'এবার কী ব্যাপার ! সারা রাত খটাস খটাস করে ঘুরে বেড়াচ্ছ ! ক্ষেপে গেল না কী !'

স্টিভেনসন বললে, 'আহা কী জুতো ! মনে হচ্ছে আমার পাযেই গজিয়ে উঠেছে !' জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে স্টিভেনসনের স্ত্রী বললে,'এ কী। এ তো তোমার সেই পুরনো জুতো জোড়া !'

আমাদের অবস্থাও একদিন স্টিভেনসনের মত হবে। পুরনো বিদায় কর। পুরনো বিশ্বাস, আদর্শ, প্রথা, জীবনযাত্রার ধরন, সম্পর্ক, শিক্ষাপদ্ধতি, সাজপোশাক। সেকেলে যা কিছু সব ফেলে দাও। এমন কী সেকেলে মানুষদেরও খোঁয়াড়ে দিয়ে এস। এমনি তো মেরে ফেলা যাবে না। একপাশে অনাদরে পড়ে থাক, সময়ে মরে হেজে যাবে। আপদ শান্তি।

শিক্ষিত ছেলে। বড় চাকরে। মাকে বলছে, 'তুমি চুপ করো। বাজে ভেজোর ভেজোর কোরো না। এসবের তুমি কী বোঝো !'

আবার আধুনিকা স্ত্রী স্বামীকে দাবড়াচ্ছে, 'কেন বকবক করছ ! কী বোঝো তুমি ! তোমার তো কেবল বাড়ি অফিস, অফিস বাড়ি ।'

আর গোঁফের রেখা গজাবার আগেই ছেলে বলছে, 'বেশ করেছি । যাও তো, মেলা ফ্যাচোর ফ্যাচোর কোরো না ।'

মেয়ে বলছে, 'বিয়ে । আমার বিয়ের চিন্তা তোমাদের করতে হবে না । আমার ব্যবস্থা আমিই করে নেবো । নাইনটিন এইটটি ফোর । এ তোমাদের থার্টিফাইভ কী থার্টিসিক্স নয় ।'

ওদিকে হাজার হাজার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা কোর্টে লাইন দিয়ে আছে । কাকে ঠোকরান মেয়েরা ন দেবায়, ন হবিষায় হয়ে জীবন নতুন করে কীভাবে আবার শুরু করা যায়, সেই চিন্তায় হয় ক্ষিপ্ত না হয় বিমর্ষ । যৌবনেই বৃদ্ধা । এদেশে মেয়েদের একবার বিয়ে দিতেই ভিটে মাটি চাঁটি হয়ে যায়, বারে বারে বিয়ের কথা চিন্তাই করা যায় না ।

মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহের জন্যে জীবনপণ লড়েছিলেন । আইন-সিদ্ধ করেছিলেন । তবু কোথায় যেন এক মানসিক প্রতিরোধ । করলে করা যায় । আইনে আটকাবে না, কিন্তু একটু অস্বাভাবিক । জোর গলায় কেউ কিছু বলবে না, তবে পেছনে ফিসফাস হতেই পারে ।

প্রবল প্রতাপান্বিত পশ্চিম প্রগতির বড়াই করে । আকাশছোঁয়া বাড়ি জনে জনে গাড়ি । ঝকঝকে রাস্তা, শহর । ব্যক্তি স্বাধীনতা । ফুটফুটে ছেলে, মেয়ে । আপাত দৃষ্টিতে খুবই উন্নত । কিন্তু সুখের বড়ই অভাব । পরিবার বলে কিছুই নেই । কে কার ছেলে ! কে কার মেয়ে ! কে কার বাপ্ ! কে কার মা ! সাজানো বাড়ি । গাড়ি । সুইমিংপুল । র‍্যানচ্ । পপ, ডিসকো । ক্যাসিনো । ফাস্ট কার । ফাস্ট লাইফ । ফাস্ট ডেথ । এদিকে স্লিপিং পিল ছাড়া ঘুম আসে না বাবুদের । অসুস্থ উত্তেজনা ছাড়া জীবন একঘেঁয়ে । তাই ড্রাগস । তাই ফ্রী সেক্স । ট্যাঁকেট্যাঁকে বন্দুক । কথায় কথায় গুলি । ম্যানিয়াক মার্ডারার রাতের রাজপথে নেকড়ের মত নিঃশব্দে ঘুরছে । জীবন আছে । প্রাচুর্যের মধ্যে বেঁচে থাকা আছে । আদর্শ নেই । শান্তি নেই । ভবিষ্যৎ নেই । বর্তমান জ্বলছে ।

ওই সব দেশে প্রবীণ-প্রবীণাদের অবস্থা অতি শোচনীয় । সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন । সঙ্গী মদের বোতল । আর অষ্টপ্রহর চালু টিভির হরেক চ্যানেল । এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে মরে পড়ে আছেন । টিভি দেখতে দেখতেই মৃত্যু হয়েছে । কেউ খবর রাখে না । ওদিকে টিভি চলছে । একদিন, দুদিন তিনদিন । হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল । পুলিস এসে মৃতদেহের

দায়িত্ব নিল। প্রথামত ক্রিমেশান।

ওই পশ্চিমেই এমন ঘটনা ঘটে, শিশুপুত্রকে ঘরে চাবি-বন্ধ রেখে, পিতামাতা চলে গেলেন ফূর্তি করতে। পিতা একদিন চলে গেলেন মাতাকে ছেড়ে। কিছুদিন পরে মায়ের মাথার গোলমাল হয়ে গেল। একদিন আত্মহত্যা করলেন। অনাথ শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল ঠিকই, কিন্তু কী ধরনের মন নিয়ে। এই শিশু পববর্তীকালে সমকামী একজন পুরুষ হতে পারে। স্যাডিস্টিক মার্ডারার হতে পারে। নিষ্ঠুর জেনারেল হতে পারে। যুদ্ধবাজ দেশনায়ক হতে পারে। সব দেশের ব্যাপারেই যার নাক গলান অভ্যাস। সারা পৃথিবীর শান্তি হরণ করে যিনি সর্বশক্তিমান।

সভ্যতার অসভ্যতায় মানুষ তটস্থ। কত নতুন উপসর্গ যে আমদানি হয়েছে!



যে জীবন চিন্তায়, ভাবনায় যত অসুস্থ সেই জীবন তত সভ্য। যে যত উদ্ধত, সে তত সভ্য। যে যত আত্মকেন্দ্রিক সে তত সভ্য। সবচেয়ে বড় নেশাখোর সবচেয়ে বড় সভ্য। সবচেয়ে বেশিবার যে সংসার ভেঙেছে, সে তত বড় সভ্য। কিছু পাপ সভ্যতার অঙ্গ। জুয়া। নারী নির্যাতন। সমকামিতা। পর নারীগমন। স্ত্রী-পুরুষে মিলে বড় রাস্তায় বেলেল্লাপনা সভ্যতার সর্বোচ্চ প্রকাশ। সন্ধের পর থেকে ক্রমশ বেহুঁশ হতে থাকা সভ্যতার অন্যতম লক্ষণ। অন্যের ঘর ভেঙে গৃহলক্ষ্মীকে টেনে রাস্তায় নামানর নাম সভ্যতা। নিজে বেঁচে থাকি তুমি মরে যাও এই চিন্তার নাম সভ্যতা।

নিচুতলার অসভ্যতা চেনা একটা মানবিক স্তর ধরে চলে। তেমন অসহ্য নয়। উঁচুতলার অসভ্যতা কখন কোন রাস্তা ধরবে বলা মুশকিল। আইনের তোয়াক্কা নেই। টাকা থাকলে আইনকে মোচড়ান যায়। পুত্রবধূকে মেরে বিছানায় রোল করে গোল করে রেখে বলা যায় আত্মহত্যা। রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণবিধি মানার প্রয়োজন নেই। সবার আগে যাওয়াটাই সভ্যতা। কে চাপা পড়ল। কার সংসার ভেসে গেল, দেখার দরকার নেই। নিজের অসুস্থ ব্যস্ততায় ক'ঘন্টার জ্যাম তৈরি হল, আমার জানার প্রয়োজন নেই। বড় দোকানের ক্যাশে লাইন পড়েছে। স্যুটেড-বুটেড সভ্য মানুষ, সে সব না মেনে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ফোকরে হাত গলিয়ে দেবেন। প্রতিবাদ চলবে না। ভারি গলায় প্রশ্ন হবে 'কেন কী হয়েছে! বেশ করেছি। সো হোয়াট।' বড় রেস্তোঁরা থেকে বেরচ্ছেন, টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে। এপাশে ওপাশে ফুত্‌ফুত্‌ করে কুঁচো ছুঁড়ছেন। যার গায়ে পড়ল, তার গায়ে পড়ল। আমি বেহুঁশ।

অনেক মূল্য দিয়ে আবার আমাদের সেই পুরনো জুতো জোড়াই ফিরিয়ে আনতে হবে। যা ঠিক তা ঠিক। যা সভ্যতা তা সভ্যতা। যা কল্যাণময় তা কল্যাণময়। অসুস্থতাকে সুস্থতা বলে উল্লাস প্রকাশ করলে একটিই আনন্দ—মরার আর দেরি নেই।

ঝ্যাঁটাহস্তেন সংস্থিতা

আজকাল কাকব বাড়ি গেলে বোঝা মুশকিল তিনি খুশি হলেন কী অখুশি হলেন। মুখে একটা দেখন হাসি হয তো থাকবে। 'আবে এসো এসো' বলে সাদব অভ্যর্থনাও হয তো হবে। মনে কী চাপা আছে মনই জানে।

আমবা সবাই এত বিব্রত। হিংস্র নেকড়েব মত জীবন আমাদেব ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ কবে দিচ্ছে। 'এসো, বোসো, এক কাপ চা খাও' এই আপাত ভদ্রতাব আড়ালে যে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে বাইবেব ঘরে বসে সে আগুনেব আঁচ পাওযা যায না। মানুষেব অন্দবমহল আজকাল বড়ই অশান্ত। সংসাবেব এক এক প্রাণী এক এক সুবে বাজে। কাকব সঙ্গে কাকব মনেব মিল নেই। চুক্তি কবে বেঁচে থাকা। তুমি আমাকে ঘাঁটিও না, আমিও তোমাকে ঘাঁটাব না। আমাদেব বাইবে গণতন্ত্র, ভেতবে স্বৈবতন্ত্র। কাকব ব্যাপাবে কাকব কোনও কথা চলবে না। মেনে নিতে পাব সুখে থাকবে, না মানতে পাবলে জ্বলে পুড়ে মববে। বাজা মবেছে। ঘবে ঘবে কর্তাদেবও মৃত্যু হযেছে। বেশানকার্ডেই হেড অফ দি ফ্যামিলি। বাড়িতে সবাই বেহেড। শাসন ফলাতে গেছ কী মবেছ। আমবা সবাই বাজা।

জীবিকাব তাগিদে সকালে বেবিযে যাও। বাস-ট্রাম ঠেঙিযে প্রায মাঝবাতে আধমবা হযে ফিবে এস। এব মাঝে ফ্যামিলিতে কী ঘটে গেল জানাব উপায নেই। ছেলে আড্ডা মেবে, সিগাবেট ফুঁকে, সিটি উড়িযে গ্লোবিযাস ফিউচাব তৈবি কবছে। মেযে প্রেম কবে লাযলামজনুব দ্বিতীয সংস্কবণ লিখছে। সহধর্মিণী ম্যাটিনি মাবছেন। বৈঠকখানায আড্ডাব ফোযাবা ছুটছে। কোথায় কী হচ্ছে, সবই নিযন্ত্রণেব বাইবে। চাকা ঘুবছে। এই যা আশাব কথা। থেমে নেই কিছু। কর্মস্থলে ইনকিলাব। ল্যাঙ মাবামাবি। আত্মীয়-স্বজন পবশ্রীকাতব। বন্ধুবান্ধব সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপব। অপ্রযোজনে কাকব টিকিব দেখা মিলবে না।

সব সংসাবেই গৃহবধূদেব এক কথা তোমাদেব পাল্লায পড়ে হাড়-মাস কালিকালি হযে গেল। আমি বলেই তবে গেলে, অন্য কেউ হলে বাপের নাম ভুলিযে দিত। কেউ যদি প্রশ্ন কবে, মা লক্ষ্মী, বিয়ে কবে সংসাবী হয়েছিলে



কেন ? পাত্রের সন্ধানে পিতাদের হন্যে হয়ে ছোটাছুটি । কাগজে বিজ্ঞাপন । দেখাদেখির বিয়েই হোক, আর স্বয়ম্বরাই হোক বিয়ে না হলে জীবন আমাব বিফলে গেল । আর ল্যাঠা যেই চুকে গেল অমনি বেসুরো কীর্তন ! মা জননী, সংসার তো পাঁচতারা হোটেল নয় । বেল বাজালেই খানসামা । লেবুর রস খেয়ে টু পিস কস্টিউম পরে সুইমিং পুলে সন্তরণ । চোখে গোগো গগ্‌লস পরে ক্যাম্পচেয়ারে শুয়ে সানবাথ । সংসার সমুদ্রে সাঁতার কাটতে হলে, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহ্যশক্তি, সহনশীলতা এ সবের যে বড়ই প্রয়োজন । সারা জীবন শুধু তুড়ুম ঠুকে যাব তা তো হয় না । পুড়ে পুড়ে পোড়খাওয়া হওয়াব নামই জীবন ।

'হাম দো আর হামারা দো'র সংসারটা দাঁড়িয়ে আছে অবাস্তব একটা ভিত্তি ভূমির উপর । তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর হাসি আব গানে ভরে তোলা যায় না । বেঁচে থাকার সুখ চারটে দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ গুটিচারেক প্রাণীব মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না । সিলিণ্ডারের অক্সিজেন আর মুক্ত বাতাসের অক্সিজেনে তফাৎ অনেক ।

'এই রে', আর 'মরেছে', এই দুটি শব্দকে জীবনের অভিধান থেকে তুলে ফেলে দিতে না পারলে সুখ সোনার হরিণটির মতই পালিয়ে বেড়াবে । বাড়িতে বাড়তি কোনও প্রাণী এলেই অন্দরমহলে আর্তনাদ, 'এই রে' । 'এই রে এসেছে



রে' এই মন নিয়ে 'আসুন আসুন' বলার কৃত্রিম আবেগ ধরা পড়ে যায়। হাসির আড়াল থেকে আতঙ্ক বেরিয়ে আসে। অভ্যাগত বুঝতে পারে, তার অবাঞ্ছিত আগমন অন্দরমহলে আলোড়ন তুলেছে।

গৃহিণী বলবেন, 'আসার আর সময় পেলে না। এখন আর আমি চা-টা চাপাতে পারব না।'

কর্তা তখন বোঝাতে থাকবেন,' লোকের বাড়িতে লোক আসবেই। এক কাপ চা, এই সামান্য ভদ্রতাটুকু না করলে চলে।'

তারপর কাঁদো কাঁদো মুখে বাইরের ঘরে এসে বলবেন, 'বলুন, কেমন আছেন? অনেক দিন পরে এলেন। মাসীমা কেমন আছেন?'

কে কেমন আছেন, তাতে কারুরই কিছু যায় আসে না। ভদ্রতার প্রশ্ন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটি কথাতেই উত্তর সেরে দেবেন, ভালো।

রাস্তায় ঘাটে পরস্পরের দেখা হলে প্রশ্ন হয়, কেমন আছেন? বিপরীত মুখে চলতে চলতে প্রশ্ন। উত্তর, ভাল আছি। পাল্টা প্রশ্ন, আপনি কেমন? উত্তর, ভালো। মিটে গেল ঝামেলা। এখন কোনওদিন হঠাৎ যদি কেউ হাত চেপে ধরে প্রশ্নকারীকে বলেন, 'শুনবেন কেমন আছি?' আর একে একে ফিরিস্তি বের করতে থাকেন, 'আমার স্ত্রীর অ্যানিমিয়া। যাচ্ছে না কিছুতেই। যা মাইনে পাই

দু'বেলা ডাল ভাত জোটাতেই দশ তারিখে ফৌত। ছোট ছেলেটার লিভার বেড়েছে। যা খায় তাই তুলে দেয়। বড় মেয়ের প্রথম ডেলিভারি। জামাই বাবাজি ঠেলে দিয়েছে আমার ঘাড়ে। বাড়িঅলা পেছনে লেগে জল বন্ধ করে দিয়েছে।'

'ব্যাস, ব্যাস, আর শুনতে চাই না। বুঝেছি খুব খারাপ আছেন।'

'না, না, আর একটু শুনুন। এখনও আমি কেমন আছি তাই তো বলা হল না। লো প্রেসার। সেদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম একটা হুলোর ঘাড়ে। সে ব্যাটা ফ্যাঁস করে দিলে আঁচড়ে। এদিকে হাই সুগার। সেই আঁচড় সেপটিক হয়ে, ভাইরে... ।"

প্রশ্নকারী ন্যাজ তুলে দৌড়লেন।

আমরা যে যার জীবন নিয়ে ন্যাজেগোবরে হয়ে আছি। আধুনিকতার ব্যাধি বড়ই সংক্রামক। বসন্ত হলে রুগীকে মশারি ফেলে রাখতে হয়। চাবদেয়ালের ঘেরাটোপে গা বাঁচিয়ে অবস্থান। কে কী অবস্থায় আছেন জানা নেই। হঠাৎ উপস্থিত হওয়ার অনেক ঝুঁকি।

একবার এক বন্ধুর বাড়িতে, 'কেমন আছিস' করতে গিয়ে এমন ফাঁপরে পড়েছিলুম ! তিনদিন আগে থেকেই স্বামী স্ত্রীতে ঠুসঠাস, নিম্নচাপ চলছিল। সেদিন একেবারে প্রলয়বর্ষণ। জামাকাপড় প্যাক করে বন্ধুপত্নী ছিটকে বেরিয়ে এলেন। 'এই যে আপনি এসে গেছেন। চলুন আমার সঙ্গে। আমার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবেন চলুন। আমি এই ছোট লোকের সঙ্গে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না।'

আমার বন্ধু বললে, 'নিয়ে যা, নিয়ে যা, এই রণচণ্ডীকে তোর বাড়িতে নিয়ে গিয়েই প্রতিষ্ঠা কর। আমার আর প্রয়োজন নেই।'

বন্ধুর দেওয়া অমন এক লোভনীয় উপহার নেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ স্বগৃহে আর এক দেবী—ঝ্যাঁটা হস্তেন সংস্থিতা।

সুখে থাকার কায়দা

একটু চেষ্টা করলেই আমরা সুখে থাকতে পারি। মানসিক অশান্তিতে ভুগতে হয না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—**to call spade a spade**। কোদালকে কোদাল বলতে শেখা। আমাদের ভাবনার সামান্য একটু হেরফের করতে পারলেই, অফুরন্ত, অপাব শান্তি। বোকা আর রোমান্টিক হয়েছ কী মবেছ। পৃথিবীকে ঠিক ঠিক দেখতে শিখলেই আর কোনও অশান্তি থাকে না। যেমন :

[এক] দেহধারণ করলেই অসুখ করবে। পশ্চিমবাংলার প্রধান প্রধান অসুখ. থেকে থেকে সর্দি, কাশি, জ্বর। মাঝে মাঝে আধকপালে। মাঝে মাঝে ফুলকপালে। বছবে একবার চোখে জয-বাঙলা। ফাল্গুন, চৈত্রে বসন্ত ঋতু নয়, বসন্ত রোগের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা। অম্বল, বদহজম, অ্যামিবাযসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস। গেঁটে বাঁত। দন্ত শূল। একবার ফ্লু, একবার ডেঙ্গু। বরাত ভাল হলে ফ্লু, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মিকশ্চার।

[দুই] পাশটাশ কবলেই যে চাকরি জুটবে এমন কোনও নিশ্চয়তা এ দেশে নেই। দীর্ঘকাল বেকার বসে থাকার সম্ভাবনা আছে। বেকার থেকে সাকার না হওয়া পর্যন্ত যা যা করতে হবে, [ক] সপ্তাহে একবার র‍্যাশানের দোকানে লাইন. [খ] সপ্তাহে দুবার কেরোসিনের লাইন, [গ] সপ্তাহে একবার দাদা, বউদির জন্যে লাইন দিয়ে, দাঙ্গাহাঙ্গামা করে সিনেমার টিকিট কাটা, [ঘ] ভোরের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে হরিণঘাটার দুধ আনতে যাওয়া ও বাজার, [ঙ] ঠিক সময়ে সংসারেব হাতে বাজাব ধরাতে না পারায় বাক্যবাণে জর্জরিত হওয়া, [চ] দু ফুটেব চা পান, [ছ] ভাইপো অথবা ভাইঝির হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে স্কুলে দিয়ে আসা, পুনরায় নিয়ে আসা, [জ] মাঝে মধ্যে বউদির জুতোর ছেঁড়া স্ট্র্যাপ সেলাই করিয়ে আনা, [ঝ] পাড়াতুতো বউদিদের ফাইফরমাশ খাটা, [ঞ] বাড়িতে যখনই অভ্যাগত আসবে দোকানে ছোটা ও সিঙ্গাড়া আনা এবং সেই সিঙ্গাড়া গরম হওয়া চাই, [ট] সংসারে যখনই কিছু ফুরোবে তখনই অম্লানবদনে বাজারে ছোটা, [ঠ] সবাব শেষে বাথরুমে

প্রবেশাধিকার, [ড] সপ্তাহে একবার নিজের জামাকাপড় ধোলাই, [ঢ] মাঝে মাঝেই বউদির শাড়ি ইস্ত্রি করিয়ে আনা, [ণ] দাদার সাইকেল থাকলে সপ্তাহে একবার চেন পরিষ্কার ও জায়গামত তৈল প্রয়োগ, [ত] সেলাইমেশিন ও ইলেকট্রিকের জন্যে প্রায়ই মিস্ত্রী ধরে আনা, [থ] ডাক্তার কাউকে দেখে যাবার পর ডিস্পেনসারিতে গিয়ে লাইন দিয়ে মিকশ্চার আর পুরিয়া আনা, [দ] মাসে একবার লাইন দিয়ে ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসা, [ধ] ভোরবেলা কাজের লোক কড়া নাড়লে দরজা খুলে দেওয়া, [ন] সাকার কারুর কুকুর পোষার শখ থাকলে, চেনে বাঁধা সেই কুকুরকে সকালে আর রাতে বাইরের ল্যাম্পপোস্টে হিস্ করিয়ে আনা এবং জেনে রাখা কর্মটি খুব ধৈর্যের। উক্ত কর্ম কুকুর সহসা সম্পন্ন করে না। বহুত ন্যাজে খ্যালে।

ধরে নিতে হবে, চাকরি পাওয়া আর ঈশ্বরকে পাওয়া প্রায় এক জিনিস। সুতরাং সেই ধরনের নিষ্ঠা আর সাধনা চাই। সপ্তাহে দশবারোটা, 'আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স' ছাড়তে হবে। আর রবিবার-রবিবার ঘোলার ছেলেকে ঘুঘুডাঙ্গায় গিয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে।

রোজগার যেমনই হোক একটা বয়সে বিবাহের বাসনা হবেই। দেশে মেয়ের অভাব নেই। হয় মেয়ে নিজেই ধরবে, নয়তো পাত্রীপক্ষ। জ্যোতিষী রায় দেবেন, স্ত্রীভাগ্যে ধন। অবশেষে ছাদনাতলায় চারচক্ষুর মিলন। মনে রাখতে হবে, সেকাল আর নেই, একালের মেয়েরা চাদরের তলায় চারচক্ষু মিলনের সময়



কটমট করে তাকাতে পারে। তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। বুঝে নিতে হবে, পাত্রীর নিজস্ব নির্বাচিত কেউ ছিল পাত্রীপক্ষ জোব কবে পিড়েতে বসিয়ে দিয়েছে। পোষ মানাতে একটু সময় লাগবে এই আর কী!

আরও মনে রাখতে হবে স্ত্রীবা কখনই পোষ মানে না। নিজেকেই পোষা হতে হয। সারাদিনে বার তিনেক ফাটাফাটির জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। পৃথিবীতে গোটাকতক জিনিস আছে যাতে নিজেকে ফিট কবে নিতে হয। যেমন চশমায চোখ ফিট, জুতোয় পা ফিট, স্ত্রীতে নিজেকে মানানসই। শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওযান।

কেউ কারুর কথা শুনবে না, এইটাই দুনিয়ার নিয়ম, যদি না প্রাণ যাবার ভয় থাকে। স্ত্রী স্বামীর কথা শুনবে না। স্বামী স্ত্রীর কথা সময় সময় শুনবে প্রাণ যাবার ভয়ে। দুম্ করে মারবে না, তিলে তিলে মারবে, গান্ধীজীর নন-কোঅপারেশান টেকনিকে। সেই টেকনিকটা জেনে রাখা ভাল, যেমন [১] মুখ তোলো হাঁড়ি। [২] সব কথা জানি না বলা [৩] সকলকে ভূরিভোজ করিয়ে নিজে উপবাস করা [৪] শিশুপুত্রকে কথায় কথায় ধরে কিলনো [৫] বাপের বাড়িতে চিঠি লিখতে বসা [৬] কাজের লোক বা বাইবের লোক সাংসাবিক প্রশ্ন করলে বলা, ওই তো বসে বযেছে জিজ্ঞেস কবো। [৭] স্বামীব মাকে কথায কথায় ঝাঁঝিয়ে ওঠা। অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামেব বীজ বোনা। [৮] অসুস্থ থাকলে ওষুধ না খাওযা।

ছেলেমেয়েরা কথা শুনবে না। সাধারণ অবস্থায না শোনাই স্বাভাবিক, কিছু



পাবার আশা থাকলে সাময়িকভাবে ন্যাওটো হবে। পাওনাগণ্ডা মিটে গেলে যে যার পথে নেচে নেচে চলে যাবে। বসবাসের বাড়ি কোনও সময় শব্দ শূন্য হবে না। রেডিও বাজবে। রেকর্ডপ্লেয়ার, টেপরেকর্ডার গাঁক গাঁক করবে। টিভি চলবে। তারই মাঝে ছেলে পড়বে, মেয়ে গলা সাধবে, গৃহিণী কাজের মেয়েকে দাবড়াবে, কর্তা স্তোত্রপাঠ করবে, কেউ আবার জপের মালা ঘোরাবে। শব্দশূন্য পল্লীর আশা দুরাশা। মধ্যরাতেও শান্তি মিলবে না। কুকুরে কনসার্ট জুড়ে দেবে।

বাথরুমে যে ঢুকবে জীবনে সে আলো নেবাবে না। আর একজনকে নেবাতেই হবে। এ নিয়ে অশান্তি না করাই ভালো। এইটাই জগতের নিয়ম। ওষুধের শিশির ছিপি যে খুলবে সে পুরো প্যাঁচ মেরে কোনও দিনই বন্ধ করবে না। কলের মুখ পুরো বন্ধ করবে না। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তেই থাকবে। ওয়াশবেসিনের কল খোলাই থাকবে। সংসারের নিয়ম, তুমি বিদ্যুৎখরচ করে পাম্প চালিয়ে ট্যাঙ্ক ভরবে, অন্যে কলের মুখ খুলে রেখে খালি করে দেবে।

সাবানদানি জল থইথই করবে। পাউডার মাখলে পালিশ করা টেবিলে এক পর্দা পড়ে থাকবেই। মেয়েদের চিরুনিতে চুল জড়িয়ে থাকবেই এবং দুই মহিলায় এই নিয়ে খ্যাচাখেচি হবেই। সেফটিপিন. মাথার কাঁটা, পাঞ্জাবির বোতাম একবার মাত্র ব্যবহারের জন্যে। দ্বিতীয়বার আর পাওয়া যাবে না।

মেয়েদের চোখের চশমা, আঙুলের, আঙটি, কানের দুল সারাদিনে বারকয়েক হারাবেই। চশমা সাধারণত খাটের তলা থেকে পাওয়া যাবে। আঙটি পাওয়া যাবে সাবানদানিতে। দুল বেরবে বালিশের ওয়াড়ের ভেতর থেকে। এই সময় জনে জনে চোর সাব্যস্ত হবে, কিন্তু সবকিছুই মেনে নিতে হবে রসিকের দৃষ্টিতে।

'প্রথম ভাগ সমাপ্ত'

কেউ ফতুয়া কেউ পাঞ্জাবি

যা হবার তা হবে। এইটি ভাবতে পাবলেই সুখেব চাবি কাঠি হাতের মুঠোয়। ক্যানসার হতে পারে! বেশ হোক। কুছ পবোযা নেহি। অফিসে হঠাৎ ধর্মঘট হবে? তিনমাস হাঁড়ি চবে না! বেশ চডবে না। ছেলের চাকরি হবে না? না হয না হবে। পণের টাকার অভাবে মেযে সারা জীবন আইবুড়ো থাকবে? থাকুক।

ও তো বহুকাল আগেই বলা হযে গেছে, পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছেয় আসিনি। কে একজন ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কে তিনি জানা নেই। অনেকে বলেন ঈশ্বব। বেদান্তবাদীরা বলেন, তুমি আসওনি, যাবাবও প্রশ্ন নেই। জন্মও নেই। মৃত্যুও নেই। ভীষণ একটা গোলমেলে ব্যাপার। পূর্ণ, অখণ্ড একটা সত্তা। যাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। উপনিষদ বলছেন, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই পড়ে থাকে। দরকার নেই ওসব ভেবে। চিমটি কাটলে যখন লাগে তখন আমি আছি। যেখানে এসে পড়েছি, সেইখানেই আছি। সেইখানেই থাকতে হবে। একদিন চোখ উলটে যাবে। তখন বল হবি।

এই পরিস্থিতিতেই সুখের সন্ধান। দুঃখে ফেলার লোকের অভাব হবে না। ভায়ে ভায়ে কোঁদল হবে। বউরা কোমর বেঁধে সারাদিন ধুন্ধুমার করবে। রাতে যে যাব স্বামীর কানে ফুসমন্তর দেবে। প্রতিবেশীবা ইন্ধন যোগাবে। যৌথ সম্পত্তি থাকলে পাঁচিল উঠবে। তখনও এপাশে ওপাশে ঠুসঠাস হবে। অবশেষে সেই পুরনো প্রবাদ, ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই। এবপর পযসাঅলা হাঙবেব খপ্পরে বসতবাটিটি চলে যাবে।

কর্মস্থলে কেউ কারুর বন্ধু নয। চা চালাচালি, হাসি বিনিময়, ক্রিকেট স্কোরের আদানপ্রদান। স্পোর্টস, পিকনিক। চাঁদা তুলে বিয়ের উপহাব। অসুস্থকে হাসপাতালে দেখতে ছোটা। সবই থাকবে। তবে সকলেবই তৃতীয নেত্র খোলা। তুমি ব্যাটা প্রোমোশান পাবে আর আমার কোনও মোশান থাকবে না। অদৃশ্য হাতে সকলেই সকলের কাছা টেনে আছে। বৃত্তাকাবে ঘোর। কোনও সমস্যা নেই। বৃত্ত ভেঙে সোজা ছোটার চেষ্টা করেছ, কী পেছন থেকে কাঁচি



মার।

অভিজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা বলেন, শতং বদ মা লিখ। কর্মস্থলে যতটা পারো দায়িত্ব এড়িয়ে যাও। সরকারী ফাইলে বড় কর্তারা ওই কারণে, 'অ্যাজ প্রোপোজড' লিখে সই মারেন। অর্থাৎ তুমি যেমন বললে। আমার নিজস্ব কিছু বলার নেই। গোলমাল কিছু হলে, সেই পুরনো নীতি, সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর। ঊর্ধ্বতনের গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না, অধস্তনকে নিয়ে টানাটানি। বুদ্ধিমানে বলেন, কাজ করতে গেলেই ভুল হবে। ভুল মানুষমাত্রেরই হয়। ভুল হলে সার্ভিস-রেকর্ড খারাপ হবে। রেকর্ড খারাপ মানেই প্রোমোশান না হওয়া। অতএব কাজ করার চেষ্টা কোরো না। দেখবে বছরে বছরে প্রোমোশান। যে করে সে মরে।

পৃথিবী চলছে বোকা মানুষের বোকামির ওপর নির্ভর করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কত লোক প্রাণ দেয়। কোনও অন্যায়েরই প্রতিকার হয় না। মাঝখান থেকে জীবন যায়। ন্যায় আর অন্যায় এই নিয়েই তো দ্বিপদের



পৃথিবী। বোকারাই কর্তব্যের কথা, আদর্শের কথা, মানবতার কথা, প্রেমের কথা, ভবিষ্যতের কথা বলে। এমন একটা ভাব দেখায়, পৃথিবীর চলা, না-চলা যেন তারই ওপর নির্ভর করছে। যত কাজ, যত দুঃখ-সুখ এদেরই কাঁধে ভূতের মত ভর করে বসে। ভেবে ভেবে চুল পাকিয়ে ফেলে। এরা সংসারের জোয়াল একাই টেনে মরে। থ্যাংকলেস জব। এরা ভোরে উঠেই ব্যাগ বগলে বাজারে ছোটে। তখন অন্য সকলে মৌজ করে বিছানায়। যখন ওঠে তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ মুখ ফুলে ওঠে। সকলের চা খাওয়া শেষ, তখন ঝোলাঝুলি সমেত সেই কর্তব্যপরায়ণের প্রত্যাবর্তন। ঝোলায় এর জন্যে গাঁদালপাতা, ওর জন্যে থানকুনি। বোঝা নামিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করবে, আমার চা আছে তো ? প্লেট চাপা, সর পড়া এক কাপ চা তার জন্যে থাকতেও পারে, নাও পারে। হয় তো শুনতে হবে, তুমি ঝট্ করে র‍্যাশানটা এনে ফেল, ভাত নামলেই চা করে দিচ্ছি। এদের নিজস্ব কোনও দাবি নেই, তাই সব ব্যাপারে উপেক্ষিত। ফোঁস নেই যে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ওই জন্যে বলতেন, ফোঁসটি ছেড়

না। এরা বাতাসের মত। নিজের নাক কিছুক্ষণ টিপে রাখলে তবেই বোঝা যায়, বাতাস কত প্রয়োজনীয়। এদের একমাত্র পুরস্কার, আত্মসন্তুষ্টি. আমি আমার কর্তব্যে অবিচল। মৃত্যুর পর এক লাইনের এপিটাফ সে নেই। যদ্দিন ছিল আমাদের কোনও ভাবনা ছিল না।

কোন্ আত্মীয়ের অসুখ, রোববার সবাই মাংসের ঝোল ভাত খেয়ে, উপন্যাস মুখে দিবানিদ্রার অপেক্ষায়, সে এদিকে বাস, ট্রেন ঠেঙিয়ে ছুটছে সেই আত্মীয়ের খবর আনতে। পুজোর আগে যেখানে, যাকে যা দেবার ঘুরে ঘুরে পৌঁছে দিয়ে আসছে। পুজোর পরে সাতদিন ধরে বিজয়ার প্রণাম সারছে। একজনের কাঁধে সংসারের জোয়ালটি চাপিয়ে, অন্যেরা হয় রূপচর্চায় ব্যস্ত, না হয় রেডিও কিংবা টিভি, হরেক খেলার লাগাতার ধারাভাষ্য। মরার সময় নেই। অথবা সিনেমা ম্যাগাজিন নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায়, অমিতাভের কী হল ! রেখার বিয়ে হবে কি না ? হেমা ধর্মেন্দ্রব সঙ্গে বাক্যালাপ আছে, না বন্ধ হয়ে গেছে !

এমন ঘটনাও ঘটে, বাড়ির বাইরে মিটাব ঘর। মিটার ইন্সপেক্টার এলে, দরজা খুলে মিটার দেখাবার গরজ কারুরই নেই। সেই বিশেষ কাজটি বাড়ির বিশেষ একজনের জন্যেই বাঁধা। এমন কী মিটারঘরের দরজাটাও তাকেই বন্ধ কবতে হবে। নয়তো খোলাই রইল দিনের পর দিন।

বাথরুম ব্যবহার করবে সকলে। পরিষ্কারেব দায়িত্ব একজনের। বাড়িতে বাস করবে সকলে ঝুল ঝাড়বে একজনে।

এই হল বাঙালীর সংসার। আমাদের সমাজ। মেনে নিলেই আর দুঃখ থাকে না। আলনায় ফতুয়া আর পাঞ্জাবী পাশাপাশি ঝুলছে। এখন ফতুয়া যদি বলে, আহা ভাই তুই কেমন চিকনের কাজ করা ফাইন পাঞ্জাবি। কখনও যাচ্ছিস বিয়েবাড়িতে ভোজ খেতে, কখনও মাইফেলে। গায়ে ভুব ভুব গন্ধ। আর এই দ্যাখ, আমি ফতুয়া, পকেটে পোড়া, আধখাওয়া বিঁড়ি।

পাঞ্জাবি বললে, যার যেমন ভাগ্য। সংসারে কেউ ফতুয়া। কেউ বা পাঞ্জাবি।

কঙ্কালের মূল্য হ্রাস

ধরা যাক নাম তার নয়না। লেখাপড়া জানে। অসুন্দরী নয়। যথা সময়ে অনেক দেখে শুনে পিতামাতা নয়নার বিয়ে দিলেন। নয়না সংসারে ঢুকল অনেক স্বপ্ন নিয়ে। বাঙালী মেয়েরা কেউই বিরাট বিরাট স্বপ্ন দেখে না। বিশাল, ভয়ঙ্কর এই পৃথিবীকে যথাসম্ভব ছোট করে, চার দেয়ালের মধ্যে নিঙড়ে নিয়ে আসতে চায়। একটা ডবল মাপের খাট। পরিপাটি বিছানা। একটি ড্রেসিং টেবিল। লোহার একটা আলমারি। এক চিলতে রান্নাঘর। স্বতন্ত্র একটি বাথরুম। ছোট একটা বারান্দা। আর যে মানুষটির সঙ্গে বিয়ে হল তার যৎসামান্য ভালবাসা। আকাশের চাঁদ চাই না। তারার নাকছাবি চাই না। চাই সামান্য একটু মনের মিল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মিলনেই তো আগামী দিনের সম্ভাবনা। মানুষ প্রথমে এসে দাঁড়ায় কোথায়! কেউই তো স্বয়ম্ভু নয়। একজন পিতা আর একজন মাতা আবাহন করে নিয়ে আসেন বলেই তো আসা। যীশু, চৈতন্য, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, নিউটন, রাসেল, আইনস্টাইন, সকলেই তো ওইভাবেই এসেছিলেন। কেউই ধনীর সন্তান ছিলেন না। কোনও মেয়েই কালো নোটের বিছানায় শুয়ে সুখের চুষিকাঠি চুষতে চায় না। পায়ের তলায় বিশ্বাসের এক টুকরো জমি চায়।

দীর্ঘদিনের বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতায় যে সব নিয়মকানুন তৈরি হয়েছে তা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। এক ধরনের বিদ্রোহ, কিন্তু ফল কী? ভাঙন। হাজার হাজার বছর আগের একটি 'মাওরি' প্রবাদ, ঘর সংসার চিরস্থায়ী, মানুষ আসবে যাবে। ইংরেজী অনুবাদ The home is permanent, the man flits. যত বোলচালই মারি না কেন দিনের শেষে কোথাও একটা ফিরতেই হবে এবং সেটি হল ঘর। মানুষ অরণ্যজীবন থেকে সভ্যতায় প্রবেশের প্রাক মুহূর্তেই বুঝে গিয়েছিল :

Is there anyone
Who would weep for me?
My wife would weep for me.

আমার জন্যে কে কাঁদবে ? আমার স্ত্রী ছাড়া আর কে কাঁদবে। প্রাচীন সত্য আজও সত্য। তবু ঘর ভাঙছে। নয়নাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষদের হাবভাব রাজা ক্যানিউটের মত। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলছে—**This far and no farther** কী চাই, সেইটাই বোঝা গেল না। দেহ না মন ? ধর্ম আর আদর্শের বন্ধন যত শিথিল হচ্ছে মানুষ তত দেহবাদী আর ভোগবাদী হয়ে উঠছে। যে যত বড় ভোগী আর চরিত্রহীন সে তত আধুনিক। ফল ? হোম আর সুইট হোম নেই। বিটার হোম। যারা মনে করে ভূমি আর নারী কর্ষণের জন্যেই তারা বিরাট এক শক্তিকে খোঁচাখুঁচি করে জাগিয়ে তুলছে, সে শক্তি হল নারীশক্তি। শেষ পরিণতি মহিষাসুর। আমাদের দেশে পশ্চিমের মত বিবাহবিচ্ছেদ একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হাজার হাজার মামলা আদালতে ঝুলে আছে। ঘর ভাঙছে। ঘর গড়ছে না। আর স্নেহবর্জিত সন্তানরা আগামী নিষ্ঠুর সমাজের ভিত তৈরি করছে। সেই সমাজে একালের ভোগী, ব্যভিচারী, আদর্শহীন মানুষরা যখন বৃদ্ধ, জড়দ্গব হয়ে যাবে, তখন তাদের বরাতে কী লেখা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিদেশে 'লিভিং টুগেদারের' হাওয়া বইছে। কী লাভ হয়েছে ! মরছে তাদের সন্তানসন্ততিরা। তবু সে দেশে সরকার সন্তানপালনের দায়িত্বে অবতীর্ণ। বেঁচে



থাকবে। লেখাপড়া শিখবে। চাকরি পাবে। যুদ্ধে যাবে ; কিন্তু স্নেহ, ভালবাসার স্বাদ পাবে না। কে কার বাবা ? কে কার মা ? বৃহৎ উন্নত সমাজের এক একটি সজীব ইঁট হয়ে বেঁচে থাকা।

দার্শনিক নিৎসে বলছেন, **Marriage is a long conversation** বিয়ের আগে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, যে মহিলাকে আমি বিয়ে করতে চলেছি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বলতে পারব তো ' বিবাহের অন্য সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। দেহ, যৌবন অপরিচয়ের আকর্ষণ সবই হারিয়ে যাবে। থাকবে শুধু দুটি মন। আর পরস্পরের বাক্যালাপ।

আধুনিক সমাজে মন বস্তুটি হারিয়ে গেছে। মেয়েদের মন থাকলেও, পুরুষরা মন হারিয়ে ফেলেছে। উত্তেজনা আরও উত্তেজনা, সবাই এক একটি রেসের ঘোড়া। সরল, সহজ সুস্থ জীবনের চেয়ে বিকৃতির পক্ষপাতী। সঙ্গে সহজাত পুরুষালী অহমিকা, যা খুশি করার ছাড়পত্র আমার হাতে। রাজা কখনও ভুল করতে পারে না। প্রতি পরিবারেই এই মনোভাব ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমের মত পবিবেশ গুমোট করে রেখেছে। মুখ বুজে সহ্য করলে ভাল। প্রতিবাদেই তুমুল কাণ্ড।

মাঝরাতে জীবনসঙ্গী মত্ত অবস্থায় আড়-কাত হয়ে ফিরবেন। দরজায়



দাঁড়িয়ে, হয় রিকশাঅলা নয়তো ট্যাক্‌সি ড্রাইভারের হাত থেকে মাল বুঝে নিতে হবে। কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে অন্যের পেছনে ছুটবেন। বিশ্বস্ততা এক তরফা ব্যাপার। তুমি আমার। আমি কিন্তু সকলের। অরণ্যচারী মানুষদের মধ্যে যাঁরা দার্শনিক ছিলেন তাঁরা সাবধান করেছিলেন, হৃদয় আর বাজার, বিশেষ তফাৎ নেই। অনবরতই ক্রেতা আর বিক্রেতার আগমন নির্গমন। শান্ত হও। নিজের দিকে তাকাও।

নয়নার সুখের সংসারের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। অশিক্ষিতা, নিম্ন শ্রেণীর এক মহিলার সঙ্গে ভেসে গেল তার স্বামী। নয়না আইনগত বিচ্ছেদ নিলেন। শুরু হল তাঁর জীবিকার সন্ধান। কোনওরকমে বেঁচে থাকার মত একটা চাকরি মিলল। জীবনে আবার এক পুরুষের আবির্ভাব। আবার স্বপ্ন দেখা। পাঁচ বছর ঘোরাঘুরির পর দ্বিতীয় পুরুষের, পুরুষোচিত উক্তি, 'তোমাকে বিবাহ ? তুমি তো উচ্ছিষ্ট ? তোমার সঙ্গে ফুর্তি চলে। সংসার করা চলে না।

শত শত নয়নার জীবন নিয়ে এই যে ছিনিমিনি, এরই নাম আধুনিকতা। ফ্যান, ফোন, ফ্রিজ, অ্যাপার্টমেন্ট, টুইন ওয়ান, কালার টিভি, ইংলিশ মিডিয়াম, পেলমেট, পর্দা, ভিডিও, সবই ঠিক ঠিক জায়গামত মোতায়েন। শুধু বিবেকে বিবেক নেই। মনে ভবিষ্যৎ নেই। স্ত্রী হল প্লেমেট। আমার কৃতী সন্তানের জননী নয়।

সেই শিক্ষিত মানুষটিকে আমার স্যালুট, উচ্চ বেতনভোগী, যিনি পিতা হবার ভয়ে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন নির্মোচনের জন্যে। কারণ ? একটাই। প্লেমেট চাই। জননী চাই না। আধুনিকতার সর্বোচ্চ স্তরে জনকজননী আর থাকবে না।

পরবর্তী জেনারেসানের বৃদ্ধদের কী অবস্থা হবে ! ক্যানসারে যদি সাফ করে তো বাঁচোয়া। নইলে মুখে আগুন দেবার কেউ থাকবে কী ! তবে আশার কথা—কঙ্কালের দাম কমে যাবে।

আবার আলুর গুদামে

আবার আলুর গুদামে কবে আগুন লাগবে ?

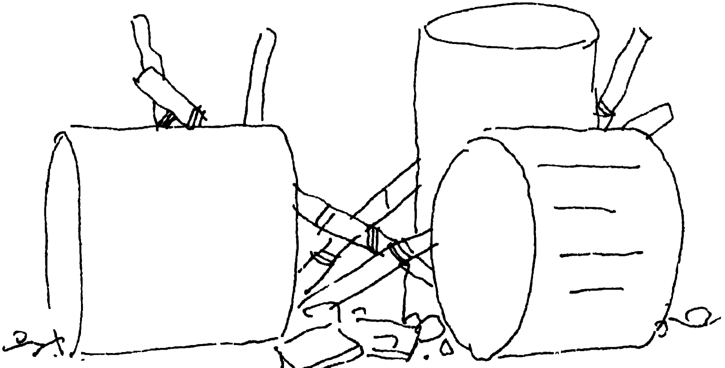
বেশ মজা, শুধু একটু নুনের ওয়াস্তা। ভরপেট আহার। হায় ভারত ! এর নাম শোক ! এর নাম শ্রাদ্ধ ! কুঁচো নেতায় দেশ ছেয়ে গেছে। আসল নেতারা হালে পানি পাচ্ছেন না। তাঁরা সাইরেন বাজিয়ে শহরের একপাশ দিয়ে, 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' করে যাওয়া আসা করেন। দাগী আসামীদের ধরার শৃঙ্খল আছে। সমগ্র একটা জাতিকে শৃঙ্খলায় আনার শৃঙ্খল মরচে ধরে ঝরে পড়েছে। দেখেও দেখি না। শুনেও শুনি না। হচ্ছে হোক। চলছে চলুক। নাটকের শেষ দৃশ্যে কি আছে কে জানে ?

ইতিহাসে অনেক কথাই লেখা হবে। ভবিষ্যতের হাতে যাবে পরিশ্রুত ঘটনাপঞ্জী। সাধারণ মানুষের দেখা আর ঐতিহাসিকের দেখায় অনেক ফারাক থেকে যাবে। সেইটেই নিয়ম। ইতিহাস লিখবে না, মাথা কামিয়ে, গলায় কাছা নিয়ে জনে জনে চাঁদা তুলে পারলৌকিক ক্রিয়া হয়েছিল। পাঁচশো দাও, দুশো দাও, পঞ্চাশ দাও, নইলে তুমিই মায়ের ভোগে যাও। কে কোন দলের, দলপতিরাও বলতে পারবেন না। এত বড় দেশ ! এত জনসংখ্যা ! নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই ওঠে না। সবাই স্বাধীন। যে কোনও রাজপথ নিমেষে বন্ধ করে দেওয়া যায়। দুটো বাঁশ, গোটা কতক ঠ্যালা, চাকার বাতাস খোলা আড়াআড়ি কয়েকটা গাড়ি। উগ্র চেহারার কয়েকজন যুবক। দলের হাইকমাণ্ডের নির্দেশ থাক আর না থাক, জীবন অচল করে দিতে মাল-মশলা যৎসামান্যই লাগে। এক একটা জাত এক এক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। আমরা অচল করে দেবার ব্যাপারে ধুরন্ধর হয়ে উঠেছি। দুটি শাস্ত্র আছে, স্ট্যাটিক্স আর ডাইনামিক্স। আমাদের শাস্ত্র হল স্ট্যাটিক্স। থেমে থাক। সব থামিয়ে দাও। আমাদের যানবাহন তাই ধীর গতি। কিলোমিটারে পথের দূরত্ব না বাড়লেও, সময়ে দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। টালা থেকে টালিগঞ্জ যেতে রাত ভোর হয়ে যেতে পারে। জাপানে মুক্তো কালচার করা হয়। অনেক রকমের কালচার আছে, সেরিকালচার, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, পিসিকালচার, সেইরকম জ্যামকালচার। এ দেশে

আলু, পটল, মাছ, মাংস, ঝিঙে, ঢ্যাঁড়সের দাম আছে, দাম নেই তিনটি বস্তুর। সময়ের দাম নেই, দাম নেই কথার আর দাম নেই জীবনের।

খুঁচিয়ে মারো, কুপিয়ে মারো, গলনালী কেটে দাও। সম্প্রতি আব একটি মাত্রা যোগ হয়েছে। দুটি শিশুর হাতের আর পায়ের প্রধান শিরা কেটে দিয়ে, দেহকে রক্তশূন্য করে আগুনে নিক্ষেপ। গ্রামবাসীরা পাছে আগুন নিবিয়ে ফেলে, সুতরাং সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। পুকুরের চারপাশে হত্যাকারীদের কড়া প্রহরা। কিছুই করার নেই। বেদ-বেদান্ত, মার্কস, এঞ্জেলস পড়ে আমরা এতই সুসভ্য হয়েছি, প্রাচীনকালের মানুষখেকোরাও আমাদের প্রগতি দেখে হিংসায় জ্বলে যাবে। সময়কে কি কায়দায় যে আমরা মধ্যযুগে ধরে রেখেছি! খুবই গোপন ব্যাপার! অন্য কোনও দেশকে শেখান হবে না। কত সাধনা করলে তবেই না আলোকে আটকান যায়! মনের বাইরে এমন এক আস্তরণ লাগানো হয়েছে, ফুটোফাটা দিয়েও আলোর রেখা ঢুকবে না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

অথচ সবই আছে। রেলার শেষ নেই। কোটি কোটি টাকা খরচ করে স্কুল, কলেজ হচ্ছে। নাচা-গানা হচ্ছে। যাত্রা, থিয়েটার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহাপুরুষদের জন্মদিন পালন। কসমেটিকস, আর বাহারি কাপড় জামার বিজ্ঞাপন ঝুলছে পথের মোড়ে মোড়ে। টিভি, স্টিরিও, ক্যাসেটের পাহাড়। মাথায় মাথায় লম্বা চুলের বাহার। ট্রাউজারের পায়ের ফাঁদ নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। নিৎসে এই ধরনের জীবনযাত্রাকেই বলেছিলেন, A life ruled only by the children of night. নিৎসের দর্শনেই ফিরে আসা যাক, মানুষের



অগ্রগতির মূলে কারা ? শক্তিশালী, কদাত্মারাই মানুষকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের ঘুমন্ত কামনাকে তারাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলে। সুষ্ঠু সমাজের সুব্যবস্থায় মানুষের কামনা-বাসনা-আবেগ এলিয়ে পড়ে। দুর্দান্ত, দুর্বিনীতরা তাদের জাগিয়ে তোলে। দেখতে শেখায়। তুলনার বোধ জাগ্রত করে। পবস্পর বিরোধী চিন্তাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। জীবনে নতুনের স্বাদ আনে। মতবাদে মতবাদে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। এক আদলের সঙ্গে আর এক আদলের ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দেয়। তাদের মগজ মাথায় থাকে না, থাকে হাতের মুঠোয়। অস্ত্রই তাদের ভাষা। সীমানা প্রাচীর উপড়ে ফেলে, দয়াদাক্ষিণ্যের ধার ধারে না। নতুন ধর্ম, নতুন নৈতিকতা চেপে বসে সমাজজীবনের ওপর। হিংসাই হল নতুন যুগের প্রবক্তাদের ধর্ম। যা কিছু নতুন তা সবই বদ। তারা জয় করতে চায়, প্রাচীন সীমারেখা ভেঙে চুরমার করতে চায়, পুরনো মানবিকতার গলায় ছুরি চালায়। যা কিছু প্রাচীন সবই ভাল এই ধাবণা সমূলে উৎখাত করে দেয়। প্রতিটি যুগেই যারা ভালমানুষ বলে পরিচিত তাদের কাজ কি ? পুরনো ধারণা খুঁড়তে খুঁড়তে অতলে চলে যায়, ফলও হযতো



পায়, আত্মিক সন্তুষ্টি ; তারপর দেখা যায় কর্ষণে কর্ষণে জমি অনুর্বর। আর তখনই ফিরে আসে 'প্লাও অফ ইভিল'। দুষ্টের হলকর্ষণ শুরু হয়ে যায়।

একপেশে এই দার্শনিকের কথাই আজ সত্য বলে মনে হচ্ছে। দুষ্টের হলকর্ষণ শুরু হয়েছে। দুঃখের কিছু নেই। ইতিহাসকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের নেই। নৈরাজ্য থেকেই, রাজ্যের উৎপত্তি। যাদের নিয়ে আজ আমাদের এত দুঃখ তাদের কেউই মঙ্গলগ্রহ থেকে আসেনি। দেবতাদের মর্তে আগমন নয়, মর্তের মাটিতেই আমাদের স্নেহে দেবতাদের উত্থান। রাষ্ট্র সম্পর্কে মাকেয়াভিলি যা বলেছিলেন আর একবার এই মুহূর্তে ভেবে দেখতে পারি : শাসন আর শাসনব্যবস্থা দুটোই একটা বড় রকমের তামাশা। দেশের সঙ্গে তার কোনও যোগ না থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। মূর্খরাই কেবল শাসন, শাসনব্যবস্থা নিয়ে চেঁচামেচি করে। নেতাদের লক্ষ্য দেশ নয়, সুশাসন নয়। লক্ষ্য হল টিঁকে থাকা। কে কতদিন গদি আঁকড়ে থাকতে পারে। দেশের চেয়ে শাসনের চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হল গদি।

নীতিকে চিরকালই দুর্নীতি গ্রাস করে। সূর্যে যেমন গ্রহণ লাগে। দুর্নীতিকেই নীতি বলে মেনে নিলে সব সমস্যার সমাধান। ছায়াছবির পর্দায় চুম্বন মেনে নেবার মত। বাঁশ, ঠেলা, টেম্পো, চাকু, পেট্রল, দাহ্যপদার্থ, বোমা নিয়ে আজ যারা সংগ্রামে নেমেছে, তারাও একটা কিছু কবতে চাইছে। তাদেরও আবেগ আছে। দমনের কথা না ভেবে আবাহনের কথা ভাবা যাক। হে বীব পূর্ণ কবো। এদের শাসনেই কিছু কাল থাকা যাক না। অস্বীকৃত শাসন তো চলছেই। সেইটাকেই স্বীকার করে নেওয়া। উপপতিকে সাহস করে পতি বলা। আর তাদের পথ, আচারআচরণ তো ইতিহাস-সমর্থিত।

The letter the state is established, the fainter is humanity

To make the individual uncomfortable, that is my task.

এরা কারা

এরা কারা ? যাদের পায়ের তলায় কিছুক্ষণের, কিছু দিনের জন্যে দেশ ভয়ে কাঁপতে থাকে। আইন-শৃঙ্খলার শৃঙ্খল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। মনেই হয় না দেশে কোনও শাসন ব্যবস্থা আছে। আইনের প্রভুরা আছেন। মনেই হয় না, মানবতা, শুভবুদ্ধি, বিবেক, দূরদর্শিতা, প্রভৃতি ভাল ভাল বিশেষণ মানুষের গায়ে লেগে আছে ! এরা কারা ! যারা আমাদের মহত্ত্বের ব্যঙ্গের মত মাঝে মাঝে নিজেদের কোটর ছেড়ে দিনের প্যাঁচাব মত ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে, আর ঘড়ির কাঁটাটিকে ঘুরিয়ে দিয়ে যায় পাঁচ-সাতশো বছর পেছনে। সাময়িক মৃত্যুর পর দেশের হৃৎপিণ্ড আবার ধুকধুক করে ওঠে ঠিকই কিন্তু সে জীবন হল তিন স্ট্রোকের পর হৃদরোগীর বেঁচে থাকার মত।

ভারতবর্ষের যকৃত নষ্ট হয়ে গেছে। লিভারের কোনও ওষুধ নেই। স্বাধীনতা নামক প্রোটীন খাদ্য হজম হল না। পেট ফুলে গেছে। অম্বল, চোঁয়া ঢেঁকুর। অ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী, হেকিমী, সব দাওয়াই ব্যর্থ। সেকুলারিজমের ঝকঝকে মসৃণ পর্দার আড়ালে দাঁত খিঁচিয়ে বসে আছে কমিউন্যালিজম। সাঁইত্রিশ বছর ধরে, জ্যাম হয়েছে, হাইওয়ে হয়েছে, পাওয়ার প্ল্যান্ট হয়েছে, রকেট উড়েছে, অ্যাটম হয়েছে, হয়নি একটা জিনিস, সেটি হল, লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আলো জ্বালানো হয়নি। নয়াজমানায় হিরোর চেয়ে ভিলেনের সংখ্যাই বেশি।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে গাছ বাঁচে না। জাতি হিসেবে আমাদের দুর্বলতার শেষ নেই। পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে, লক্ষ্যহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতার সর্পিল পথ পড়ে আছে। জাতীয় সংগীত আছে, জাতীয় পতাকা আছে, জাতীয়তাবোধ নেই। যেখান থেকে, যেভাবে, যে অবস্থায় ধরলে একটা জাতি তৈরি হতে পারত, তা করা হয়নি। সবাই যেন বাপে খ্যাদানো-মায়ে তাড়ানো হয়ে আছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে ধারণা থাকলে বর্তমান সুখের হতে পারত, সেই ধারণাটাই তৈরি করা হয়নি। এতটুকু একটা আলোর বৃত্তে পাতা সিংহাসন। সিংহাসনে গণতন্ত্রের স্বপ্ন। লোভী মানুষের রত্ন-সভা। স্তাবকদের ওঠ-বস। বৃত্তের বাইরে বিশাল অন্ধকার। নরকের কটাহে কীট-জীবন, অশিক্ষা,



দারিদ্র্য, কু-সংস্কার, জাতি-বিদ্বেষে টগবগ ফুটছে। বক্তা আছে, ত্রাতা নেই। প্রদীপ আছে, শিখা নেই।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র, আমাদের হাতে পড়ে বিশাল এক তামাশা। অনুশীলন নেই। সুবিধামত অন্ধপ্রয়োগ আছে। অমৃতত্বে পৌঁছে দেবার উপদেশাবলী এখন হত্যাকারীর হাতিয়ার। এখন শ্রীকৃষ্ণ এসে বলুন, হে ভারতবাসী ফেরত দাও আমার গীতা। আমি অভী হতে বলেছিলুম। বলেছিলুম, জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের সমন্বয়ে জীবনযুদ্ধের সৈনিক হতে। শ্রাদ্ধবাসরে দুলে দুলে, কৃত্রিম, ভারি গলায়, বাসাংসি জীর্ণানি কিম্বা নৈনংছিন্দন্তি আওড়াবার জন্যে গীতাটি ফেলে রেখে যাইনি। ঋষিরা এসে বলুন, ওহে, আমাদের বেদ আর উপনিষদ তুলে নিলুম। ওসব ভাঙিয়ে অনেক দিন চালালে। ইওরোপ, আমেরিকায় আশ্রম বসালে। লম্বা চুল, গরদের উত্তরীয়, ঢুলু ঢুলু চোখ আর নাভির কাছ থেকে অউম ধ্বনি তুললেই সোহং হওয়া যায় না। শংকরাচার্যের মত, রমণ মহর্ষির মত, বিবেকানন্দের মত, শৈশব থেকে, যৌবন থেকে অনুধ্যান করতে হয়। সোফায় হেলান দিয়ে, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে, এল পিতে গজলিয়ার গলায়, ঢোল করতাল সহ, ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ শুনলে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। আমরা যে ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলাম, সেই ভারতের শাসক আর প্রজাকূল উঠে আসত তপোবন থেকে। মানুষকে তার শৈশব থেকেই পাকড়াও করা হত, আর শেখান হত 'কর্ণের দ্বারা আমরা ভদ্র শ্রবণ করি, চক্ষুর দ্বারা আমরা ভদ্র দর্শন করি, স্থির অঙ্গে সস্থিত থাকিয়া আমরা যেন দেবনির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল সুখে যাপন করিতে পারি।' বিদেশী এক শিক্ষাবিদ বলেছিলেন, Tell me what sort of



Civilization you want and I will tell you what sort of education to give. আজকের রাজনীতি প্রথমেই যা হত্যা করেছে তা হল শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই বছরের 'উদ্বোধন' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—'শিক্ষা নিয়ে দু-একটি কথা'। প্রবন্ধে নৈরাজ্যের ছবি সুস্পষ্ট। 'আজ নিরক্ষরতা আমাদের দেশের কলঙ্ক।' 'আমাদের দেশে এখন শিক্ষাখাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আজকাল পরিসংখ্যানবিদ্‌রা দেশের অগ্রগতিব হিসাব করেন কোন্ খাতে কত ব্যয় হয়, তা দিয়ে। এদিক থেকে দেখলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদেব খুব উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি হচ্ছে ?' 'অধিকাংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে পড়তে নয়, তাদের আর কিছু করাব নেই বলে। প্রথমে কলেজে, তাবপর বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা রাজনীতির স্বাদ পায়। তারা কোন না কোন দলে ঢুকে পড়ে। এতদিন তাদের দিন কাটত উদ্দেশ্যহীন ভাবে, কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। দলে ঢোকার পর তাদের অনেক সমাদর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবাব খানিকটা গলার জোরে, খানিকটা গায়ের জোবে নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে এগোতেই থাকে।'

এই হল এ-দেশের শিক্ষার হাল। কিছু ভাল ছেলে প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে দেশের বাইরে চলে যায়। জ্ঞানী ও গুণীর সমাজে প্রকৃত প্রভুত্ব করে। দেশে অবস্থান করলেও বিদেশী। স্বামীজী দুঃখ করে প্রবন্ধের শেষে লিখছেন : 'কিন্তু তাহলে কি শিক্ষার ফল এই দাঁড়াবে যে, মুষ্টিমেয় লোকে যোগ্যতার বলে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবে, আর বাকি কোটি কোটি লোক মূঢ় আর অক্ষম হয়ে থাকবে? একেই কি বলে গণতন্ত্র?'

হ্যাঁ, এই গণতন্ত্রেই আমাদের বসবাস! সাঁইত্রিশ বছর ধরে এই সাধনাই চলছে। এদেশের রক্ষক তাই আজ ভক্ষক। প্রহরীর বন্দুক তাই মুখ ঘোরায়, নেত্রীর শরীর ঝাঁজরা হয়ে যায়। শক্তি ভেসে যায় রক্তের স্রোতে। অন্ধকারের প্রতিনিধিরা সাময়িক কর্তৃত্ব নেয় দেশের। ব্যাকগিয়ারে চলতে থাকে দেশ।

এরা কারা?

এরাই আমরা। ৪১ সালে হিটলার বলেছিলেন : One can only rule men by force, that conscience is only a name that cripples men. ঈশ্বর মন্দিরে নেই। তাঁর অবস্থান মানুষের বিবেকে। ঈশ্বরের অবস্থানহীন বিবেক যে সমাজ তৈরি করেছে তার দিকে তাকিয়ে দিল্লির এক বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী লিখছেন, We are living amongst beasts. অথচ অধ্যাপক ভাসানি লিখে গেছেন, The Hindoo Rishis are not in conflict with Mahavira and Buddha; Jesus does not contradict Krishna; Mohammad has no quarrel with Zoroaster. There is no antagonism, but a beautiful harmony between Guru Nanak and St Francis. Religion are not rivals, religion are sisters in the one family of the spirit. ঋগ্বেদের ঋষি বহু সহস্র বৎসর আগে আর্যমানবকে শিখিয়েছিলেন, একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

কাঠের ঘোড়া

জনসাধারণ বললে ঠিক যেন বলা হয় না। পাবলিক শব্দটির অনুবাদ হয় না। অনুবাদে কেমন যেন এলিয়ে পড়ে। ভাব কমে গিয়ে হালকা হয়ে যায়। ঠাস বুনোট আর থাকে না। জ্যালজেলে গামছার মত নিরীহ এক অবয়ব। পাবলিক বললে চরিত্রটি ঠিক ঠিক ফুটে ওঠে। দার্শনিক কিরকেগাব নিজেকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, পাবলিক কি বস্তু?

উত্তরটিও চমৎকার।

পাবলিক বলতে যে কোনও একটি ব্যক্তিকে কল্পনা কবাব চেষ্টা করলে চোখেব সামনে কি চেহারা ভেসে ওঠে! বিশাল চেহারাব এক রোমক সম্রাট। বেঁচে থাকার একঘেঁয়েমিতে ক্লান্ত বীতশ্রদ্ধ। সব সময ইন্দ্রিয়ের সুখ খুঁজছে। প্রচুর আমোদ চাই, হাসি-তামাশা চাই। বুদ্ধি বড ঐশ্ববিক জিনিস। সূক্ষ্মতায় ভরা। স্থূল ইন্দ্রিযকে স্পর্শ করে না। অতএব এই পাবলিক নামক রোমান সম্রাটের অন্বেষা কি? তিনি ঘুবে ঘুবে বেডান। তাঁকে বদ বলা চলে না, তবে ভীষণ উদ্ধত। একটা নেতিবাচক স্পৃহা সব সময় কাজ করে চলেছে ভেতরে। কিসের ইচ্ছা' না আমি সকলকে দাবিযে বাখব। সে যুগের গ্রন্থাবলী যাঁরা পড়েছেন তাঁবা অবশ্যই জানেন, প্রবল প্রতাপান্বিত সিজার সময় কাটাবার জন্যে কি না করেছেন? বেঁচে থাকার একঘেঁয়েমি কাটাবাব জন্যে পাবলিক তাহলে কি করবে? তারা একটা কুকুর পুষবে। সেই কুকুরই তাদেব আনন্দ দেবে। কি ভাবে দেবে?

ধরা যাক যে কেউ একজন আর পাঁচজনের চেয়ে সর্বক্ষেত্রে বড় হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি মাননীয়ের স্তরেব দিকে এগিযে চলেছেন নিজের সাধ্য ও সাধনার বলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটির দিকে লুলু করে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হল। শুরু হয়ে গেল মজা। কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, আঁচড়াচ্ছে, কামডাচ্ছে, কোটের ন্যাজ ধরে টানাটানি করছে। যত রকমের অসভ্যতা আছে সব কিছু করার স্বাধীনতা সেই কুকুরকে দেওয়া হয়েছে। এই আনন্দে ক্লান্ত হয়ে পাবলিক একসময় বলবে, যাক খুব হয়েছে। এবার বন্ধ হোক। কুকুর তুমি ফিরে এসো।

অনেক উদাহরণের একটি উদাহরণ মাত্র । পাবলিক কি ভাবে টেনে নামায় । কেউ বড় হচ্ছে, শক্তি আব বুদ্ধিবৃত্তিতে এগিয়ে চলেছে, এ যেন সহ্য করা যায় না । যেমন কবেই হোক টেনেটুনে খামচে খুমচে নামাতে হবে । কুকুর কিন্তু কুকুরই রযে গেল । কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ওই পাবলিক তাকে আদর নয় ঘৃণাই করে ।

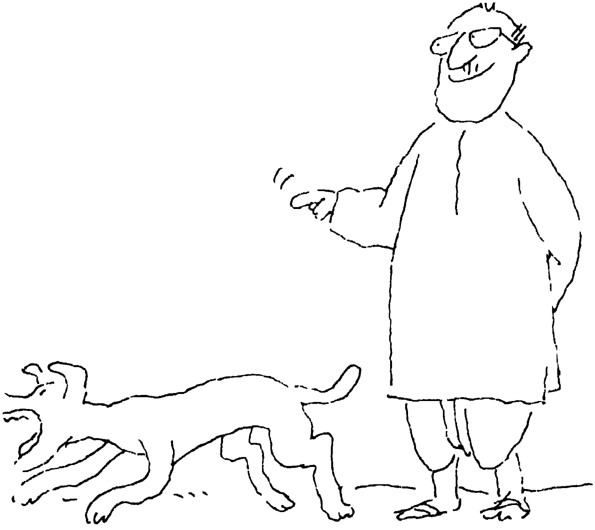
এই কুকুর হল তৃতীয় দল, থার্ড পার্টি । এদের অস্তিত্ব কোন সম্মানের আসনে নয় । একেবারেই তুচ্ছ । অনেক আগেই এদের সর্বনিম্ন স্তরে নামান হয়েছে । প্রয়োজনে নীচ আর হীন কাজে শিস্ দিয়ে ডাকা হয় । এদেব কোন মালিক নেই । পাবলিকেব আদেশ পালন করলেও এদের প্রভু পাবলিক নয় । পাবলিকের কাজ শুধু লেলিয়ে দেওয়া । ব্যক্তিবিশেষকে দেখিযে তারা স্পষ্ট লুলুও করে না আবার অত্যাচার অসভ্যতার চরম মুহূর্তে শিস দিয়ে ডেকেও নেয না । এই হল মজা । প্রশ্ন করা হয় কুকুব কাব ? কেউই বলবে না আমার । যদি বলা হয় অসভ্য জানোয়ার কুকুরটাকে মেরে ফেললে কেমন হয় ! পাবলিক বলবে খুব ভালো হয় । ওই বদমেজাজী অসহ্য কুকুব গেলেই বাঁচা যায় ।

বললে কী হবে ! মালিকানাহীন কুকুর পাবলিককে কত আনন্দ দেয় ! সামান্য



একটু উসকানির চাঁদায় লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে যায়। যারা এর প্রতিপালক তারাও মৃত্যু কামনা করে। কুকুর কিন্তু মরে না।

দেশ এখন পাবলিকের হাতে চলে গেছে। জোর করে আইন খাটাতে গেলে গদি টলে যাবে। আততায়ীর বুলেটে শরীর ঝাঁজরা হয়ে যাবে। বন্ধে সারা দেশ অচল হয়ে যাবে! 'আমার দেশ' যে কোন কারণেই হোক এই কথাটি ভাবতে শেখান হল না। দেশের আমি নই, দলের আমি। এ যেন বিশাল এক ফুটবল খেলা। দেশ হল বল। দুপাশে দুই গোল পোস্ট। দলে দলে লাথালাথি। বিদেশী রেফারির ঠোঁটে বাঁশি। খেলাব টিকিট হল হরেক বকম ট্যাকস। আজকাল অধিকাংশ মানুষই উদাসীন নির্লিপ্ত। সকলেবই মনে একটিমাত্র প্রশ্ন কি হবে।' ছেলের পড়াশোনার পেছনে কাঁড়ি টাকা খবচ কবে কি হবে?



জীবিকার অবস্থা শোচনীয়। ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে কি হবে ? বিশ বছর পরে একশো টাকার দাম হবে এক টাকা। আমেরিকায় এখন যেমন ধনী হওয়া মানেই মাফিয়ার শিকার হওয়া, এদেশেও তাই হবে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বলাৎকার, সার দেওয়া বেগুনের মত স্ফীত হয়ে উঠছে। দুর্নীতির স্বাস্থ্য ক্রমশই ভাল হচ্ছে। আরও ভাল হবে। এক শ্রেণীর মানুষ সহজে বড়লোক হবার রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন। সেই রাস্তায় কোনও নীতি নেই। 'লেনা-দেনা'র চাকা নিঃশব্দে ঘুরছে। একটিমাত্র শব্দ এ জাতির বাইবেল, কোরাণ, ভাগবত। শব্দটি হল, ম্যানিপুলেসান।

প্রাচীনকালে সেনাবাহিনীতে একটি নিষ্ঠুর শাস্তির প্রচলন ছিল। শাস্তিটি হল কাঠের ঘোড়ায় চড়া। ঘোড়ার পিঠটা অসম্ভব ধারাল। শরীরে ওজন চাপিয়ে হতভাগ্য অপরাধীকে সেই ধারাল কাঠের ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হত। বসে থাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কুচকাওয়াজের মাঠে যখন এই নিদারুণ শাস্তির যন্ত্রণায় অপরাধী কাতরাচ্ছে, তখন মাঠের চারপাশের পরিখা দর্শনার্থীতে ভরে গেছে। সকলেই দাঁত বের করে হাসছে।

অপমানিত যন্ত্রণাকাতর অপরাধী সকলের মুখে বোকা বোকা অসহ্য হাসি দেখে চিৎকার করে বলছে, 'বোকার মত দেখার কি আছে ? তোমাদের লজ্জা করে না।'

দর্শনার্থীর দল চিৎকার করে বলছে, 'আমরা দেখলে তোমার যদি বিরক্তি লাগে তুমি অন্য পথ ধরে ঘোড়া ছোটাও।'

আমরা সকলেই তীক্ষ্ণপৃষ্ঠ কাঠের ঘোড়ায় চেপে বসে আছি আর বিভিন্ন দল আমাদের করুণ, যন্ত্রণাকাতর অবস্থা দেখে হাসছে আর বলছে, এই পথ নয়, ওই পথ, ওই পথ নয় সেই পথ। আরোহী জানে, এ হল যন্ত্রণা দেবার ঘোড়া। পথ পাড়ি দেবার ঘোড়া নয়। এই যন্ত্রণাময় অচল আরোহনের পাশ দিয়ে একে একে চলে যাচ্ছে জীবনের দিন।

অন্ধ তীরন্দাজ

নির্বাচন এসে গেল। হই হই করে। অর্থ আর বাক্যের বন্যা বয়ে যাবে। দেয়ালে দেয়ালে আশার বাণী ফলবে। মঞ্চে মঞ্চে রাগী ভাষণ। আসা যাওযাব পথে সাধারণ মানুষ থমকে দাঁড়াবে। শীর্ণ মুখ, কোটরে ঢোকা চোখ। পকেটে ময়লা ময়লা গোটাপাঁচেক টাকা। হাতে হয় চটের ব্যাগ না হয় কেবোসিনেব খালি বোতল। কুঁচকি কণ্ঠা ঠাসা বাসে আলু সেদ্ধ হতে হতে বক্তৃগণ শুনবে। কি শুনবে ? কল থেকে জল পড়ার যেমন শব্দ আছে অর্থ নেই, ভেটারেন পলিটিস্যানদেরও শব্দের ফোঁড়ে ফোঁড়ে সুন্দর সোয়টাব তৈরি হয ; কিন্তু শীত কাটে না। এই সার্কাসে জনজীবন অভ্যস্থ। যেই আসুক, যেমন আছি তেমনি থাকব। কোনও ব্যতিক্রম হবে না। প্রকৃত বাজত্ব যাবা করছে তারাই করবে। ঝোল এতকাল যারা টেনে এসেছে তারাই টানবে।

রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন আজও আমাদেব সেই একই কথা বলতে হবে . 'দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি, বিদ্যা, ধনমান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকেব ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশী। আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।'

যত দিন ধান চাষ আছে ততদিন মাজবা, ভেঁপু আব শ্যামা পোকাব উপদ্রব থাকবে। গন্ধী পোকা, শীষকাটা লেদাপোকার উপদ্রব থাকবে। পৃথিবীতে যতদিন মানুষের বসবাস আছে, ততদিন শোষক থাকবে। বাম সাদা জামা পবলেও রাম, লাল জামা পরলেও বাম। রাবণ সাদাতেও বাবণ, লালেও রাবণ। শাসন-ব্যবস্থা যে মোড়কেই আসুক শোষিতের শোষণ ঘুচবে না। আমের যেমন মধুযা বা লাহি পোকা, কলায় যেমন জাব পোকা, নারকেলে যেমন গণ্ডাবে পোকা, লেবুতে যেমন মরচে ধরে, মানুষকে তেমনি দুর্নীতিতে ধববে। কোটি কোটি গ্যালন বক্তৃতা ছিটলেও নালি পোকার আক্রমণ রোধ করা যাবে না। যে ভাবেই হোক এক দল চুষে যাবে। আর এক দল চুপসে যাবে। বহুকাল আগে বার্ক বলেছিলেন · equality is a monstrous fiction. বেন্‌থাম



বলেছিলেন : **It is an anarchic fallacy.** ক্ষমতায় এসে এর বিপরীতটা একবার কেউ প্রমাণ করুক। 'ক্লিন অ্যাডমিনসট্রেশান' স্লোগান হতে পারে, 'করাপশান' ঠেকাবার সাধ্য কারুর নেই।

একজন মানুষের ব্যক্তিগত অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। অনেক স্বপ্ন থাকতে পারে। তাতে রাষ্ট্র-যন্ত্রের কি যায়-আসে! নিৎসে মনে হয় ঠিকই বলেছিলেন, **a State has no aim, we alone give it this aim or that.** রাষ্ট্রের কোনও লক্ষ্য নেই, নিশানা নেই। আমরাই এটা ওটা আরোপ করি। কিছু মানুষ জোর-জবরদস্তি করে বেঁচে থাকবে। তাদের বাঁচানটা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না। তাই যদি হত তাহলে ইথিওপিয়ার অবস্থা আজ এমন হত না। টাইম পত্রিকায় যে সব ছবি ছাপা হয়েছে, দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। একটি উলঙ্গ কঙ্কালসার বালিকা হাঁটুতে মাথা গুঁজে মৃত্যুর অপেক্ষায়। অনুরূপ একটি বালক করুণ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কখন শকুন আসবে। মা তার শীর্ণ স্তনটি হাড্ডিসার শিশুর মুখে গুঁজে দিয়ে হায় হায় করে কপাল চাপড়াচ্ছে। একজন নয়, হাজার হাজার আমাদেরই সমজাতীয় প্রাণী আজ ইতিহাসের করুণতম দুর্ভিক্ষের শিকার। রাষ্ট্র কি করেছে! কি করতে পারে! কি করার আশা রাখে।



এক প্রান্তের মানুষের যখন এই নিয়তি, আর এক প্রান্তে আমরা কি করছি ! ফ্রান্সের পাবে উলঙ্গ নর্তকী রোজ রাতে যেমন নাচে আজও নাচবে। পেট মোটা লম্পটরা মদির চোখে বাহবা দেবে। আমেরিকায় ডলার উড়বে। রাষ্ট্রনায়কের মিইয়ে আসা বিজয় উৎসবে শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হবে। চার্চে চার্চে ঘণ্টা বাজবে মানবজাতির কল্যাণে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজবে, দেবী প্রসন্ন হও।

যারা থাকলেও হয় না থাকলেও হয় তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে আসেন রাষ্ট্র যাদের রক্ষা করার মতো মানুষ বলে মনে করে। এঁরা হয় দেশনেতা, না হয় বড় বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ। এই অতিমানবের বাঁচার অধিকার আছে প্রয়োজন আছে। এই বিশিষ্ট মানবদের অহঙ্কার আর অসংখ্য অতিসাধারণের অহঙ্কারের ঠোকাঠুকিতে, অহঙ্কারেব ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে। এখানে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্যটা কি ? কিছুই না। এসো, ভোগো, মরে যাও।

সাধারণ মানুষ হঠাৎ যদি কিছু পেয়ে যায়, সে পাওয়া হল হঠাৎ আকাশ থেকে গুলিবিদ্ধ একটি পাখি কোলে এসে পড়ার মতো। যাঁদের হাতে আপামর মানবজাতির তদারকির ভার, তাঁরা যেন অন্ধ শিকারী। **'as if a blind hunter fired hundreds of times in vain and finally, by**

sheer accident, hit a bird. A result at last, he says to himself, and goes on firing.' এলোপাথাড়ি বন্দুক দেগে চলেছে। সমস্যার একটা পাখি আচমকা গুলি বিদ্ধ হলে, অসীম সন্তুষ্টি। এই তো মরেছে। আবার গুলির শব্দ।

নির্বাচনের আগে ঝাঁকে ঝাঁকে কথার গোলাগুলি ছুটতে থাকে। চেয়ারের লড়াই। সাক্ষী জনসাধারণ। আর আমরা ক্ষীণ কণ্ঠে গাইতে পারি—দেবার মতো নেই কিছু মোর আছে শুধু এক জোড়া ভোট।

আমরা সবই জানি। আমাদের পেছনে পড়ে আছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। প্রতিশ্রুতি আছে পরিণতি নেই। সেই স্পার্টান নিয়মই চলেছে। হয় পেশীর জোর না হয় মগজের জোরে যতদিন পার ভোগ করে যাও। ঘুমিয়ে পোড় না, নিজেকে শিথিল কোরো না। মানুষ আর ঘোড়া একই ভাগ্যের অধিকারী। যতদিন ছুটতে পারবে ততদিন মাটি তোমার কাঁপবে পদতলে। বেতো ঘোড়া আর সুবিচারের প্রত্যাশী মানুষ একই পথের পথিক। ক্ষমতাশালী ডিকটেটারও জানেন, 'আজ আমি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কাল একটা বুলেটের মামলা।' কি পাব আর কি পাব না, শুরু থেকেই হিসেবটা পরিষ্কার থাকলে বেঁচে থাকা অনেক সহজ হয়ে যায়। আর সেই হিসাব-রক্ষক হল মানবজাতির ইতিহাস। মানুষ ভাগ্য বিশ্বাস করতে চায় না। তাতে ভাগ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না। চাকা যেমন ঘোরার তেমনি ঘুরতে থাকে। কখনও আলো, কখনও অন্ধকার। মেঘলা আকাশ আমরা মানতে বাধ্য হয়েছি। প্রতিদিন রাত্রিকে আমরা জীবনে স্বীকার করে নিয়েছি। মানুষের হাতে মানুষ মার খাবে, খেয়ে আসছে চিরটা কাল, এই সত্য মেনে নিতে এত দ্বিধা কিসের। আজকাল বাঘে কটা মানুষ মারে! সাপে ক'জনকে কাটে? দায়িত্বশীল মানুষেরই সামান্য শৈথিল্যে রাতের অন্ধকারে জনপদের আকাশে পাকিয়ে পাকিযে ওঠে মারাত্মক ফসজিন গ্যাস। মানুষ মরতে থাকে কীটের মত। কে কি করতে পারে?

কে ঘুরিয়ে দেবে

আব আমাদের শেখার কিছু নেই। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই বলছে, জ্ঞান দিও না। বেশি বাতেলা মের না। দুটি শব্দে সব মুখ বন্ধ। যেখানে যা কিছু ঘটে চলেছে সবই স্ব-শিক্ষিত প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ। প্রথামত স্কুল, কলেজ আছে, শিক্ষকমহাশযরা আছেন, কিন্তু শেখাবার কিছু নেই। শিক্ষার্থীদের একটি কথা তাঁরা সাহস করে বলতে পারেন না, সে কথাটি বহুকাল আগে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁব কাছে আগত এক অহঙ্কারী শিক্ষার্থীকে বলেছিলেন।

শোনা যাক সেই গল্প.

শিক্ষার্থী প্রশ্ন কবল, বৌদ্ধধর্ম কি। কি বলতে চান আপনাদেব বুদ্ধ। তারপর নিজেই বকবক করে বকতে শুরু করল। বৌদ্ধধর্ম মানে এই। বৌদ্ধধর্ম মানে ওই।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন, 'বৎস ' বোসো বোঁসো। আগে এক কাপ চা খাও ; তাবপর কথা হবে।'

টেবিলে দুটো চায়ের কাপ পড়ল। সন্ন্যাসী কেটলি থেকে প্রশ্নকারীর কাপে চা ঢালতে শুরু করলেন। ঢালছেন, ঢালছেন, ঢেলেই চলেছেন। কাপ ভর্তি হয়ে চা উপচে পডছে ডিশে। ডিশ থেকে টেবিলে।

শিক্ষার্থী আর চুপ করে থাকতে পারল না। বিরক্ত হয়ে বললে, 'কি করছেন কি আপনি ! দেখছেন না, কাপ ভর্তি হযে টেবিল ভেসে যাচ্ছে। ভরা কাপে আর চা ধরে ?'

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, 'ঠিক তাই। ভরা কাপ আর ভরা যায় না ! তুমি আমার কাছে জ্ঞান নিতে এসেছ। তোমার কাপ যে বাবা নিজের জ্ঞানেই পরিপূর্ণ। ওতে আমি আর কি ঢালব ! খালি হয়ে এস, তাহলে আমি তোমাকে ভরে দিতে পারব।'

যে পরিবারে আমাদের বসবাস, সেই পরিবারের সবাই সব কিছু জানে। ঝিনুক থেকে স্পুটনিক। জিরে থেকে হীরে। সব জ্ঞানই সকলের করায়ত্ত। সুতরাং কাউকে কিছু বলার নেই। নিজেরই শেখার আছে। শিশু থেকে যুবক

সদস্য, সদস্যা, তারা ক্রিকেট জানে, ফুটবল জানে, টেনিস জানে, চলচ্চিত্রের ভাষা জানে। রাজ্য-পরিচালন-পদ্ধতি জানে। চাইনিজ রান্না জানে, কাশ্মীরি কোফতা জানে। প্লেন হাইজ্যাক হলে, নিজেরাই কম্যাণ্ডো হয়ে নিমেষে উদ্ধার করে আনতে পারে। সুযোগ পেলে সবই পারে। গোটাকতক নোবেল পুরস্কার, এক ডজন অলিম্পিক গোল্ড, হেসে হেসে, কেশে কেশে, ছিনিয়ে আনতে পারে। শুধু একটু সুযোগ চাই।

আলোচনার বদলে তাই সমালোচনা সর্বত্র। ভালো। পৃথিবীর এক এক দেশের এক এক বিশেষত্ব। কোনও দেশ ভাল ব্যালে, আর সার্কাস দেখাতে পারে। ভালো ফুটবল খেলতে পারে। সুন্দর ঘড়ি তৈরি করতে পারে। আমরা অসাধারণ ভাল সমালোচনা করতে পারি। যিনি যে বিষয়ের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত তিনিই সেই বিষয়ের সবচেয়ে বড় সমালোচক হতে পারেন। সেই যুক্তিতে সর্ব বিষয়েই আমরা সুপণ্ডিত। আমাদের দাবিয়ে রেখেছে, তাই নাম্বার ওয়ান নেশান হতে পারছি না।

কে দাবিয়ে রেখেছে?

আছে। অজস্র, অদৃশ্য হাত আমাদের চেপে ধরে আছে। এই হাতকে বাত দিয়ে কাত করতে হবে। সম্প্রতি নির্বাচন হয়ে গেল। কত বাগী রাগী ভাষণ শোনা গেল। হাঁসের মত মাইকের গলা মুচড়ে ধরে লাভা-স্রোতের মত অনর্গল বাক্যের স্রোত। নেতারা যে কারণেই হোক অসম্ভব রেগে আছেন। আর সত্যিই তো রেগে থাকারই কথা। সেই কবে আমরা স্বাধীন হয়েছি! যত্রতত্র দেয়ালের গায়ে জল-ত্যাগ ছাড়া আর কি স্বাধীনতা আমবা পেয়েছি। হাতের কাছে স্বজাতির গলা ছাড়া কাটার মত আর কি জন্মদিনের কেক পেয়েছি! উচ্চ পর্যায়ের যাঁরা তাঁরা পেয়েছেন লাল ফিতে। একের পর এক কেটেই চলেছেন গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে। আর কেউ কেউ ছোট-খাট মাঝারি খাল কেটেছেন কুমীর ঢোকার জন্যে। আর কেউ কেউ বর্ষণ করছেন কুম্ভীরাশ্রু।

জনগণের হাতেই জনগণের ভাগ্য। যে হাতেই শাসন যাক সে হাত জনগণেরই হাত। আম গাছে আমই ফলবে, জাম গাছে জাম। আমাদের চরিত্র যেমন শাসন-যন্ত্রের ধরনও হবে সেই রকম। একটু এলোমেলো, আগোছালো, কথা বেশি, কাজ কম। এবং বধির। অবশ্যই অস্থির। পরিবারেই মানুষের জন্ম। সেই বিখ্যাত লাইন, হ্যাণ্ড দ্যাট রকস দি ক্রেডল রুলস দি ওয়ার্লড। যে হাত শিশুর দোলনা দোলায়, সেই হাতই জগৎ শাসন করে। বর্তমানের এলোমেলো বিভ্রান্ত পরিবার থেকে বিক্ষিপ্ত চরিত্রের শিশুই পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে।

সেই শিশু যে শিক্ষালয়ে যাবে তার চেহারা কেমন ? এ-কালেব যে কোনও বিদ্যানিকেতনে গেলেই বোঝা যাবে। বাছা বাছা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানে ধূসর তাপ্পি মারা একটি বাড়ি। পোস্টারেব তাপ্পি। কিছু হাতে লেখা। কিছু ছাঁপানো। কাগজ, কালি আর প্রেসের ব্যবসাব রমরমা। পোস্টারে লিখিত আছে, আমাদের জাতির জীবনের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী। কি করলে কি হবে! কাদের গুঁড়োতে হবে! কাদের চূর্ণ কবতে হবে। যেন



কবিরাজখানা ! অনুপানের নির্দেশও আছে । সিঁড়ি, ঘর, দালান, সর্বত্র রাশি রাশি আবর্জনা । যত্নের সঞ্চয়, যেন জাদুঘরের মাল-মশলা ! কিছু জানলা খুলে পড়ে গেছে । কিছু কব্‌জা থেকে খুলে পড়ে বৃদ্ধার দাঁতের মতো হল হল করছে । টেবিল, চেয়ার, বেন্‌চ, মনীষীদের ছবি সবই যেন পরিত্যক্ত । একদা একটা কিছু হত, তারই মূক সাক্ষী । বাথরুমের দুর্গন্ধ সর্বত্র ভাসছে । এই পরিবেশ তৈরি করবে উজ্জ্বল আগামী দিন ! হয় তো করবে । পঙ্কেই তো পঙ্কজের জন্ম ।

প্রতিনিধিত্ব করার মতো বেশ কিছু ভবিষ্যৎ, ফটক খুলে বেরিয়ে এসেছে । সাঁইত্রিশ বছর কম সময় নয় । স্বাধীনতায় যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা এখন প্রৌঢ় । তাঁরা এখন স্বপ্নের ভারত গড়ছেন । প্রথমত দেশটাকে তাঁরা পূতি-গন্ধময় নরক করেছেন । ঠিকই করেছেন, নরক হল 'মাসের', স্বর্গ হল 'ক্লাসে'র । দ্বিতীয়ত তাঁরা একটা টাইমলেস রিজিয়ান প্রায় গড়ে ফেলেছেন । সময় আবার কি ! সময় যায় না, সময় আসে না । আমরা কবজিতে একটা ঘড়ি বেঁধে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টাগুলি বলেই, আজ কাল হয়, কাল চলে যায় পরশুতে । তাই পথে দাঁড়াও, বাস আসে না । এলেও এগোতে পারে না । এখনও যে সব মানুষ মনে মনে পরাধীনতা বয়ে বেড়াচ্ছে, তারা চিৎকার করছে, জ্যাম জ্যাম । ব্যাঙ্কে যাও, হাতে একটা চাকতি ধরিয়ে দিয়ে তিনি সরে পড়লেন । ছেলে বড় কাঁদছিল টাকা টাকা করে । ঠোঁটে ঠুসে দিলুম চুষি । যা ব্যাটা । আগে গল্প শেষ হোক, টিফিন শেষ হোক তারপর তোব চেক ।

সর্বোপরি, দলের পেছনে দল, তার পেছনে দল, নীতির লাঙুল ধরে গোল হয়ে ঘুরছে । জাতীয় সঙ্কীর্তন, 'করতে চাই, করবে কে, পেছনে আমার ন্যাজ কামড়ে ধরেছে ।'

তীর্থযাত্রীকে প্রশ্ন করা হল, কৈলাস তো ওইদিকে, তুমি তো দেখি উল্টো দিকে হাঁটছ পৌঁছবে কি করে ! সে বললে দয়া করে আমাকে ঘুরিয়ে দাও । আমি পিছু হাঁটাতেই অভ্যস্ত ।

আমাদের কে ঘুরিয়ে দেবে !

শূন্যপুরাণ

আমাব শৈশব গেছে। ঝুনো নারকোলটি হয়ে ঝরে পড়ার অপেক্ষায়। শৈশব গেলেও শিশু আছে। মাঝে মধ্যে শিশু-সঙ্গ করলে নিজের শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের যতেক পাপকর্মের পলির তলায় সেই অপাপবিদ্ধ শিশুটি সমাহিত। মরেনি, চাপা পড়ে আছে।

একালের শিশুরা সেকালের শিশুদের চেয়ে অনেক উন্নত। অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। অনেক বেশি প্রতিভার অধিকারী। সেদিন একটি শিশু, একটি বাড়ির পাঁচিলে, দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। মা সাজিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে। পায়ে লাল মোজা, বুট জুতো। দমাস দমাস করে পা ঠুকছে। তাকে বললুম, 'তোকে দেখে মনে হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ সত্যি সত্যিই বাঁদর ছিল।'

বড় বড় চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। পাঁচিলে পা ঠোকা কিন্তু সমানে চলেছে। কি উত্তব দেবে ভেবে নিল কিছু সময়, তারপর ঘাড় দুলিয়ে বললে, 'পূর্বপুরুষ বাঁদর হবে কেন, মানুষই বাঁদর।' বলেই তাল সামলাতে না পেরে দুম করে উলটে পড়ে গেল। ভ্যাঁ ভ্যাঁ কান্না। কোলে তুলে নিলুম। এক পসলা কান্নার পব ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'বলো।'

'কী বলব ?'

'বলো, চকলেট কিনে দোব। তুমি আর কেঁদ না।'

বললুম, 'চকলেট কিনে দোব। তুমি আব কেঁদ না।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখেব জল শুকিয়ে গেল। গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'দাও তাহলে।'

শেষে রফা হল, সেদিন নয়, পরের দিন তাকে চকোলেট খাওয়াতেই হবে। পরের দিন যথারীতি একপ্যাকেট চকোলেট কিনলুম। হাঁটতে হাঁটতে মনে হল একটা টালি ভেঙে মুখে ফেলি। হাঁটাটা তাহলে বেশ মধুর হবে। তারপর আমার আর জ্ঞান নেই। হাঁটছি আর মুখে ফেলছি। জিভে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবার এক টুকরো। বাড়ি পৌছলুম যখন, তখন পকেটে মোড়কটি শুধু পড়ে আছে।



এদিকে পাওনাদার হাজির, 'আমার চক্‌লেট।'

তার হাতে সুদৃশ্য মোড়কটি দিয়ে বললুম, 'বাবা, আজ তুমি এইটা নাও, কাল চকলেট পাবে। নিশ্চয় পাবে।' ভেবেছিলুম কেঁদে বাড়ি ফাটিয়ে দেবে। নিজের লোভকেও মনে মনে ধিক্কার জানাচ্ছিলুম। শিশুটি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধেই ধেই নৃত্য, 'আজ প্যাকেট এসেছে, কাল চক্‌লেট আসবে।'

এই সত্যদর্শী শিশুর কাছ থেকে দুটি পরম-প্রাপ্তি হল। এক, মানুষের পূর্বপুরুষ নয়, মানুষই বাঁদর। নিজেকে বাঁদর ভাবতে পারলে, পৃথিবীর অনেক বাঁদরামি আর গায়ে লাগত না। সেদিন একজন অনুসন্ধিৎসু মানুষ প্রশ্ন করছিলেন, আজকাল আর হনুমান দেখতে পাওয়া যায় না কেন? আগে কেমন গাছে গাছে, ডালে ডালে হুপহাপ করে বেড়াত। কেন দেখা যায় না। একটিই কারণ।

সেদিন আমাদের পাড়ায় কোথা থেকে হঠাৎ চার পাঁচটি হনুমানের এক



পরিবার এসে পড়েছিল। একেবারে ভোরবেলা। গাছে হনুমান আর মাটিতে একেবারে হুলুস্থুলু কাণ্ড। মানুষের সে কি ভীষণ হল্লা। হনুমান দেখলে মানুষের বাচ্চারা কেন এত উত্তেজিত হয়! ঈর্ষায়। হনুমান আমাদের চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে আছে। হনুমান শাখায় শাখায়, ছাদ থেকে ছাদে, চাল থেকে চালে কেমন অনায়াসে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ পারে না। এই একটি ব্যাপারে মানুষ পেছিয়ে আছে। মানুষের নর্তনকুর্দন দেখে হনুমান লজ্জায় বানপ্রস্থে চলে গেছে।

শিশুর কাছে দ্বিতীয় যে পাঠ নেওয়া উচিত, তা হল এই পরমানন্দ। ওই বিশ্বাস। সারা জীবন কত সুদৃশ্য মোড়কই তো হাতে এল। শূন্য প্যাকেট। ভেতরে মাল নেই। কত কিছুই তো কাল পাবার কথা ছিল। জীবিকা, বাসস্থান, বৃদ্ধ বয়েসের নিরাপত্তা, সুন্দর পরিবেশ, আত্মসম্মান অটুট রেখে জীবনের পথচলা, ভালোবাসা, সুবিচার সমান অধিকার। কত মোড়কই তো হাতে এল। খুলে দেখা গেল কিছুই নেই। কই শিশুর মত নাচতে পারি কই! আজ প্যাকেট

পেয়েছি কাল চকোলেট পাব, এই আশায় পরিতৃপ্ত থাকার মতো মন কোথায় !

পৃথিবী কুকুরের বাঁকা লেজ। টেনে ধরে থাকলে সোজা হয়। ছেড়ে দিলেই বেঁকে যায়। বেশিক্ষণ ধরে থাকার চেষ্টা করলে, কুকুর ঘাড় ঘুরিয়ে কামড়াতে আসে। বাঁকা পৃথিবীকে যে সব মানুষ সোজা করতে চেয়েছিলেন, খ্রীষ্ট থেকে শ্রীচৈতন্য, গান্ধী থেকে মার্টিন লুথার, সকলেই কামড় খেয়ে ফিরে গেছেন উৎসে।

এক ধনী ব্যবসাদার উচ্চ মার্গের এক সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলেন, উন্নতি আর সুখের পথ কি ? আপনি এমন কিছু বলুন, যাতে আমার মঙ্গল হয়। আমার পরিবারের সকলের মঙ্গল হয।

সন্ন্যাসী লিখলেন :

পিতামহ মরবেন।
পিতা মরবে।
পুত্র মরবে।

ধনী ব্যবসায়ী খেপে গেলেন, 'এ আপনার কি শুভেচ্ছা ! এ তো অশুভ কামনা।'

'না, অশুভ কামনা নয়।' সন্ন্যাসী হাসলেন, 'তুমি ভুল করছ। এ হল সবচেয়ে আশার বাণী। এই হল মানুষের সবচেয়ে বড় ভাগ্য ! তোমার পরিবারের সকলে পিতামহ হবার জন্যে বেঁচে থাক। পিতার আগে পুত্র যেন মারা না যায় ! জন্ম আর মৃত্যুর এই ধারাবাহিকতা, মাথার দিক থেকে একে একে চলে যাওয়া, এর চেয়ে সুখের আর কি আছে বলো ?'

কিছু না পাওয়ার আনন্দে শিশু ভোলানাথের ধেই ধেই নৃত্য। পুত্র থেকে পিতা, পিতা থেকে অবহেলিত পিতামহ। যাওয়া আবার ফিরে আসা। এদিকে বাঁকা পৃথিবী, বাঁকাই থাকল। শুধু শহীদ-বেদীর সংখ্যাই দিনে দিনে বেড়ে গেল।

প্রেমের তোকমারি

কত রকমের কেলেঙ্কারী যে আছে, ঈশ্বরও বোধ করি খবর রাখেন না। জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা 'এ মায়া প্রপঞ্চময়' বলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন। বেদ আছে, বেদান্ত আছে, গীতা আছে, উপনিষদ আছে। সব আছে। ধারে কাছে কে ঘেঁষছে। তাসের ঘরের মত ফুস্-মন্তর জনপদ। চার দেয়াল আর ছাদের কফিনে ঘিন ঘিনে জীবন। আঙুরের থোকার মতো সমস্যার থোকা ঝুলছে। মানুষ এক সেকেণ্ড হাসে তো একশো সেকেণ্ড গুমরে গুমরে কাঁদে। শেষ জীবনে মাথা দোলায়, 'তুমি কে কে তোমার।' 'ভেবে দ্যাখ মন কেউ কারো নয়। মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।' যৌবনে ভাবতে কি হয়!

জামার আস্তিন গুটিয়ে ভদ্রলোক পুরোবাহুটি সামনে মেলে ধরলেন। ক্ষতবিক্ষত। একটা নয় শ'খানেক প্রাইমারি ভ্যাকসিন। দগদগে। দাগড়া-দাগড়া।

প্রশ্ন করার আগেই ভদ্রলোক বললেন, 'কি বুঝছেন?'

'সুন্দরবনে গিয়েছিলেন না কি? মৌচাকে ঢিল মেরেছিলেন?'

'আজ্ঞে না। এই হল প্রেমের-দংশন। সর্পিনীর ছোবল।'

'অর্থাৎ?'

শুরু হল জীবন কথা। মধ্যবয়সী মানুষ। বিশ বছর আগে 'লভ' হয়েছিল। রসমালাইয়ের মত হাবুডুবু খেয়ে স্ত্রী-রত্নটিকে নিয়ে, সকলকে বিসর্জন দিয়ে একটি সরকারী পায়রার খোপে সংসার পাতলেন। প্রেমের সংসার। খেলা বেশ ভালই জমেছিল। দু'জনে বেশ ভালই ড্রিবল করছিলেন। ভদ্রলোকের সরকারী চাকরি। স্ত্রীর চাকরি ব্যাঙ্কে। স্ত্রী চড় চড় করে ওপর দিকে উঠতে লাগলেন। এখন তিনি তিনহাজারে উঠে বসে আছেন। জীবিকায় ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। কোনও রকমে শ'বারোর চৌকাঠ টপকেছেন। তা তিন আর বারো যোগ করলে চার দুই। মন্দ কি? মধ্যবিত্তের সংসার ভালোই চলা উচিত। দুর্ভাগ্য। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অবস্থা। দুই ক্যাপটেনে ঐকতানের বদলে শুরু হয়ে গেল অনৈকতান। স্পিন, গুগলি, বাম্পার এধারে ওধারে। ছয় চার। স্টাম্প

উপড়ে যাবার অবস্থা।

এই মুহূর্তে সেই গল্পটি স্মরণীয়। বিশাল একটি বাড়ির সর্বোচ্চ তলের ফ্ল্যাটটি দেখিয়ে বন্ধু বন্ধুকে বললে, 'ওই দ্যাখ আমার হাওয়া-মহল। কেমন ?

বন্ধু বললে, 'অসাধারণ।'

'চল তোকে ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে আনি।'

লিফ্‌টে করে দু'জনে ওপরে উঠে এল। চারপাশ ঝকঝক করছে। সুন্দর রং করা দরজা জানলা। দামী পর্দা। টবে ফুল গাছ। ক্যাকটাস।

বন্ধু বললে, 'ভাই, এই আমার বসার ঘর।'

মূল্যবান কার্পেট। নতুন পালিশ করা ফার্নিচার। চিকন দেয়ালে শিল্পীর আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ।

বন্ধু বললে, 'ভাই, এই আমার ডাইনিং স্পেস।'

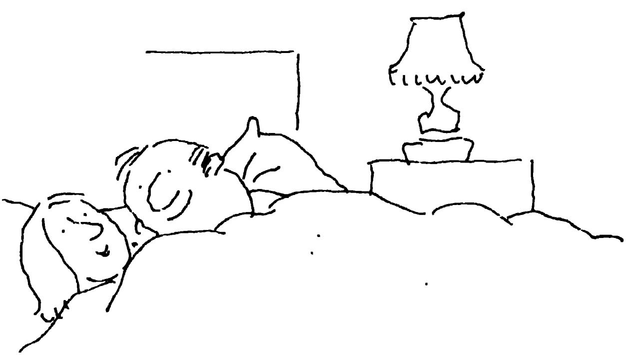
সুন্দর ল্যামিনেটেড খাবার টেবিল। চারখানা সুদৃশ্য চেয়ার। ঝকঝকে ফ্রিজ কোঁ কোঁ করছে।

বন্ধু বললে, 'ভাই এই হল দক্ষিণমুখো ঝুল বারান্দা। তাকিয়ে দ্যাখ, আকাশের কত কাছে। চাঁদোয়ায় তারা ঝুলছে। কমলালেবুর কোয়ার মত চাঁদ। নিচে জ্বলছে শহরের টিপ টিপ আলো।'

বন্ধু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল রাতের শহরের দিকে। কি শোভা!

'আয়, এবার আমার শোবার ঘরটা দেখাই।'

বিশাল শয়নকক্ষ। গড়ের মাঠের মত সুন্দর খাট। মৃদু আলোয় মায়া কাঁপছে



চোখের সামনে। বন্ধু বললে, 'ভাই, খাটে ওই যে সুন্দরী মহিলাকে দেখছিস, ওই মহিলা হলেন আমার স্ত্রী। আর পাশে ওই যে লোকটিকে দেখছ, ওই লোকটি হল আমি।'

শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দুই বন্ধু নেমে এল রাস্তায়।

এই ভদ্রলোকের প্রায় একই অবস্থা। বিশ বছরেব দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরেছে। স্ত্রী এখন বিচ্ছেদ চান। ও তরফের প্রেমে ভাঁটা ধরলেও এ তরফে এখনও জোয়ার খেলছে।



'তা, আপনার হাতের এ অবস্থা কে করলে ?'

'হাত কি মশাই ! জামা খুললে দেখবেন আমার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত।'

'কেন ? রহস্যটা কি ?'

ভদ্রলোকের মুখে করুণ হাসি, 'আমার স্ত্রী। বাড়ি ঢুকলেই, ঝ্যাঁটা আর কামড়।'

'কামড় ?'

'হ্যাঁ, এই দেখুন না, ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিয়েছে।'

জীবনের গভীরে ঢোকার সাহস হল না আর। চুরাশি সাল বিদায়ী। শহর কলকাতা কুলকুল করে বয়ে চলেছে দু পাশে। বিশ্বাস করতে হবে এমন ঘটনা ! এরকমও হয় নাকি, সভ্য, সুশিক্ষিত মানুষের জীবনে !

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'বলতে পারেন আমার কি করা উচিত ?'

'ফ্ল্যাটটা কার নামে ?'

'আমার নামে।'

'তাহলে এখুনি একটা কাজ করুন : একটা ট্যাকসি ধরে সোজা বাড়ি চলে যান। সদর দরজাটা হাট করে খুলুন। বেসুরো জীবনসাথীকে দ্বার পথে দাঁড় করান রাস্তার দিকে মুখ করে। তারপর মৃদু একটি ধাক্কা। গরবিনী তোমার পথ এবার তুমি দেখে নাও। ইচ্ছে হলে আপনিও বলতে পারেন।'

ভদ্রলোক হাহাকার করে উঠলেন, 'আমি যে এখনও তাকে বড় ভালবাসি।'

'ও ভালবাসা ! তাহলে আর একটা কাজ করুন। ফেরার পথে পাড়ার ডাক্তারখানা থেকে একটা টেটভ্যাক নিয়ে নিন। যে কোনও দোকান থেকে বেশ বড় মাপের একটা প্ল্যাস্টিকের গামলা কিনুন, আর এক শিশি জীবাণুনাশক। বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই গামলায় জল ভরুন, ঢেলে দিন দু'খোপ জীবাণুনাশক। তারপর অনাবৃত পিঠ পেতে দিয়ে বলুন—অয়ি প্রেয়সী ! মারো মারো ঝ্যাঁটা। শুধু অনুরোধ, ওই সোহাগের বস্তুটিকে গামলার জলে বারেক চুবিয়ে নাও।'

জিন্দাবাদ

ফেল করা ছেলেকে তার শুভানুধ্যায়ীরা বলেন, 'বাবা, সামান্য একটু লেখাপড়া করলেই তো পাশ করে যাও। কেন করো না মানিক ! বেশি না, সাবা দিনে ঘণ্টা দুই কি তিন ! তাহলে আর ফল বেরোবার পর এমন হাপুস নয়নে কাঁদতে হয় না !' সেই একই কথা দেশবাসী রাজনীতিককে বলেন মনে মনে। 'বাবু সায়েব দেশের জন্যে, সামান্য একটু কাজ করলেই তো আসনটি বেশ পাকা হয়ে যায়। কেন করেন না হুজুর ?'

'কেন করেন না ?'

'কেন করি না ?'

'কেন করি না ? চেয়ারে বসলেই মাথাটা কেমন হয়ে যায়। জনসাধারণ ফাধারণ ভুল হয়ে যায়। দেশফেশ ভেসে যায়। চেয়াবের দোষ। চেয়ার তো সায়েবী জিনিস। আর এক সময় সায়েবরাই দেশ শাসন করত। শাসন মানেই শোষণ। দেশটাকে বাদুড়-চোষা কবে ফেলতে ইচ্ছে করে।'

'তা স্যার চেয়ারে না বসে চৌকি বা শীতলপাটিতে বসলেই হয়।'

'বেশিক্ষণ বসা যায় না যে ! পা ধরে যায়। পিঠ ব্যথা করে। কষ্ট হয়।'

'নাই বা বসলেন ! ঘুরে ঘুরে দেশটাকে দেখুন না। কত দিকে কত মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিভাবে তারা বেঁচে আছে ! কি তাদের অভাব অভিযোগ ! তাদের জন্যে কি করা উচিত ?'

'তেমন স্বাধীনভাবে হাটে হাটে মাঠে মাঠে আমাদেব ঘোবার স্বাধীনতা নেই। ঘোরা উচিত নয়। রাম, শ্যাম, যোদো, মেধোর মত আমরা ঘুরতে পারি না। টেকনিক্যাল অসুবিধে আছে। আমরা বাসে ট্রেনে চাপতে পারি না। প্লেন আর গাড়ি এই দুটি বাহনই আমাদের সম্বল। গাড়িব জন্য পাকা রাস্তা চাই। থাকাব জন্যে ভাল ডাকবাঙলা চাই, সার্কিট হাউস চাই। সায়েবরা ঘোড়ায় চড়তে জানত, ফলে টপাটপ চলে যেত ইন্টিরিয়র ভিলেজে। আমাদের সে শিক্ষা কোথায় ! চীনে নেতারা সাইকেল চড়েন। আমাদের শরীরের যা হাল. এই ভুঁড়িমুড়ি, গেঁটে বাতমাত নিয়ে সাইকেল ? অসম্ভব ! ফলে আমরা

হেডকোয়ার্টারেই থাকি। মাঝে মাঝে দিল্লি যাই। আর তেমন বেগড়বাঁই দেখলে জেলা শহরে যাই প্যাচআপ করতে। আর হ্যাঁ, নির্বাচনের সময় নিজের কেন্দ্রের অলিতে গলিতে হাত জোড় করে গোবদা মুখে, পাঁচন খাওয়ার মতো একটা রাউণ্ড দিয়ে আসি।'

'এই কি যথেষ্ট ?'

'অফ কোর্স। কাজের লোক এর চেয়ে বেশি কি করবে ? পলিটিকস তো কালো গুঁড়ো দাঁতের মাজন নয়, যে আমরা পাড়ায় পাড়ায় চোঙা ফুঁকে বিক্রি করব। এ এক ডিগনিফায়েড ব্যাপার।'

'কাজের লোক ? তা আপনাদের কাজটা কি ?'

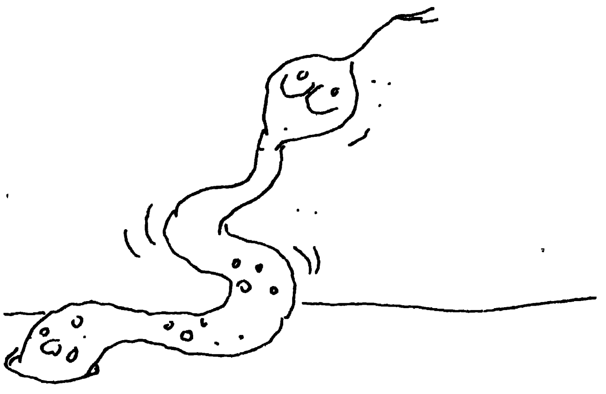
'অনেক কাজ। কাজের অভাব আছে ?'

'অনুগ্রহ করে বলবেন কি কি কাজ ?'

'সবচেয়ে বড় কাজ, চেয়ারে চেপে বসে থাকা আর সাপের গর্তের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে রাখা।'

'সাপের গর্ত ?'

'সাপের গর্ত হল বিরোধীরা। বেরলেই চেপে ঢুকিয়ে দাও। রেডি লাঠি। মার আর পাল্টা মার। লাগাতার লাঠালাঠি। ভারতীয় রাজনীতি মানেই ব্রতচারী নৃত্য। চল্ লাঠি চালাই, ভুলে দেশের বালাই। এই হল আমাদের সঙ্গীত।



'এভাবে দেশের কাজ হবে কি করে ?'

'হবে না। যদ্দিন এদেশে বিরোধীরা আছে তদ্দিন এদেশের কিস্যু হবে না। কি করে হবে বলতে পারেন ? সব সময় আপনার কাছা ধরে যদি টানাটানি করে,



সেই কাছা সামলাতে সামলাতেই পাঁচটা বছর ফুস। কাজ করতে হলে পায়ের তলায় শক্ত জমি চাই। যে জমি টলে না। টলান যায় না। দাঁড়াতেই দিচ্ছে না, তো কাজ? স্বাধীনতার পর প্রথম দু'দশ বছর যা হয়েছে, তাই ভাঙিয়ে বাপধনেরা খাও। আর কিছু হবে না।'

'সে কি রে দাদা?'

'হ্যাঁরে দাদা! ওরা বসলে আমরা ঠেলে ফেলব। আমরা বসলে ওরা ঠেলে ফেলবে। ঠেলা আর ঠেলি। ঠেলি আর ঠেলা। আর আপনারা বলুন লাও ঠ্যালা।'

'তাহলে আমাদের কি হবে? আমরা কিছুই পাব না?'

'কেন পাবেন না। সবচেয়ে বড় জিনিস পাবেন, মজা। খেল খিলাড়ীকা। আপনারা দর্শক। একবার ওদের বসাও। পাঁচ বছরে আশাভঙ্গ আবাব আমাদের বসাও, আবার ওদের, আবার আমাদের। পাগলা, তাই তো বাঙলার মরমীয়া কবি হালিশহরে বসে গেয়েছিলেন, 'এই ফেলা তোলার ভবের খেলায় সেই শান্তি মা কোথায় বল!'

'তাহলে আমাদের শান্তি কি চিতায় উঠলে?'

'অ সিওর। ফাইনাল শান্তি। খুব তো নেচেছিলে মাণিক! এইবার যদি বলে, সার্কুলার রেল কো উধার সে ইধার ভেজায়া দেও। কি করবে চাঁদু। মেট্রো রেল বোজাবার অত মাটি এবার মিলবে কোথায়!'

'তাহলে কি শহরের পেটটা ফাঁপাই থাকবে?'

'থাকুক না। মানুষের পেট ফাঁপতে পারে শহরের পেট ফাঁপবে না! রাজনীতির কি বোঝো মাণিক! শুধু নেচেই মরো। দেশ হল মরা ইঁদুর। একবার চিল হয়ে আমরা ছোঁ মারি ওরা তখন কাক হয়ে কা কা করে। আবার ওরা চিল হলে আমরা কাক হই। আর দূরে অপেক্ষায় থাকে শকুনের ঘোলাটে চোখ। মানকেরা ভাগাড়ে পড়লেই খাখা করে উড়ে আসে। বলো জিন্দাবাদ।

'জিন্দাবাদ।'

ভেতো বাঙালী

বয়েসে তরুণ। জীবিকায় ঘুণ। স্টিয়ারিং-এ পাকা হাত। চাবুকের মত গাড়ি চালায়। মিটার ডাউন করে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলে, যাবেন কোথায়?

এই যাবেন কোথায় এক সাংঘাতিক প্রশ্ন। সাধারণত যাত্রী যেদিকে যেতে চায়, গাড়ি যেতে চায় তার বিপরীত দিকে। এই শহরের এইটাই অলিখিত নিয়ম। ভয়ে ভয়ে, যেদিকে যেতে চাই বলে ফেললুম। মনে মনে অবশ্য প্রস্তুত, না বলবেই এবং পত্রপাঠ নেমে যাব।

ছেলেটি হাসি মুখে বললে, কোই বাত নেহি।

বাঙালী যখন হিন্দি বলে তখন বুঝে নিতে হবে বেশ খুস্ মেজাজে আছে। ইংরেজি বললে বুঝতে হবে ভীষণ উত্তেজিত। হার্টের অবস্থা ভাল বলেই, এই ধাক্কায় কাত্ হয়ে পড়লুম না। সেই ঘটনা মনে পড়ছে। আমি একজনকে প্রায় মেরে ফেলেছিলুম। তিনি স্টেটবাসের এক প্রৌঢ় কণ্ডাক্টার। যে সময়ের ঘটনা, সেই সময় সরকারী বাস জাতীয় সম্পত্তি বলে বেশির ভাগ যাত্রীই টিকিট কাটতে লজ্জা পেতেন। কর্তৃপক্ষ, কণ্ডাক্টার হয় তো অপমানিত বোধ করবেন। ভাববেন সঙ্কীর্ণমনা যাত্রী। পয়সার গরম দেখাচ্ছে। সেই দেশাত্মবোধের দিনে আমি বাসে উঠেই কণ্ডাক্টার ভদ্রলোককে ডেকে টিকিটের পয়সা দিয়েছিলুম। হাত বাড়িয়ে পয়সা নেবার সময় অবাক হয়ে দেখলুম, ভদ্রলোকের হাত কাঁপছে। প্রথম ঘুষ নেবার সময় যে রকম কাঁপে। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে যেমন হার্টের রুগীর পড়ে। ভূত দেখলে মানুষের চোখ দুটো যেমন ঠেলে বেরিয়ে আসে, তাঁর চোখের অবস্থা সেইরকম। আমার কাণ্ড দেখে যাত্রীদের গুঞ্জন থেমে গেছে। আমার পাশে বসেছিলেন পাকা বাঁশের মত চেহারার এক ভদ্রলোক। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, 'এ রকম দেশদ্রোহীর মত কাজ করলেন কেন? কে আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে?'

'আমি দেশদ্রোহী?'

'অফকোর্স! ঠিক দেশদ্রোহী নন, সমাজদ্রোহী। এই বাসের যে যাত্রীসমাজ, সেই সমাজের নীতি আপনি লঙ্ঘন করেছেন। শোনেনি, সব শেয়ালের এক রা!

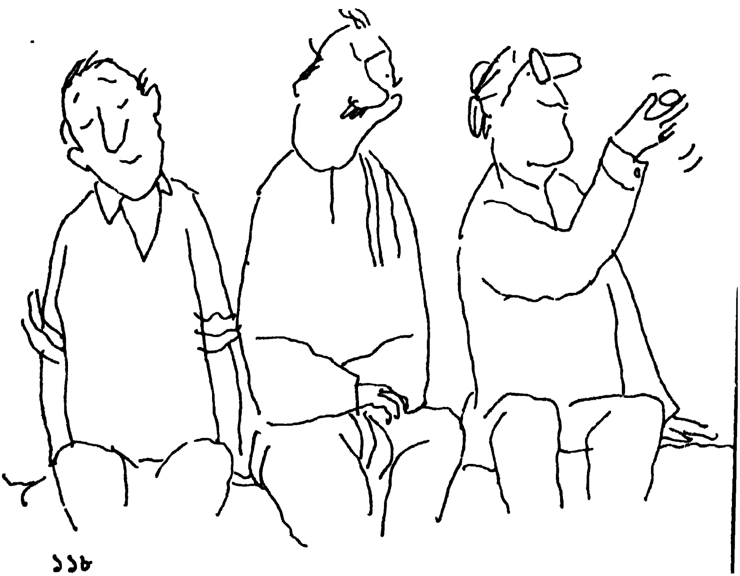
কে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়ে টিকিট কাটতে বলেছিল ?'

কাঁচুমাচু মুখে বললুম, 'অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। আমি ঘুমোবার জন্যে টিকিট কেটেছিলুম! জানালার ধারে বসেছি তো! আমার আবার বিশ্রী অভ্যাস। বাসের দুলুনি আর ফুরফুরে বাতাসে নিমেষেই ঘুমিয়ে পড়ি। তখন কেউ খোঁচা মারলেই মাথায় খুন চেপে যায়। এযাবৎ গোটাপাঁচেক অ্যালার্ম লাগান টাইমপিস আছাড় মেরে ভেঙেছি। ভোরে আমাকে ভয়ে কেউ ডাকতে যায় না। উঠেই চড়চাপড় মেরে দি। ভোরে ট্রেন ধরতে হলে জানলা দিয়ে ঝুলঝাড়ু গলিয়ে খোঁচা মেরে মেরে জাগায়। যাতে উঠেই চড়চাপড় না মারতে পারি!'

সে সময় দেশে মানুষ ছিল। স্বীকারোক্তি করলে সহজে ক্ষমা মিলত। ভদ্রলোক ধাতস্থ হলেন! জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ঢুল কোন দিকে ?'

'বাঁ দিকে।'

'ভালই হয়েছে আমার ডান দিকে। মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ফিক্‌সড হয়ে শেষ পর্যন্ত যাওয়া যাবে।' তারপর বেশ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের সকলেরই একটা জাতীয় কর্তব্য আছে। ট্রেন আর স্টেটবাসের লস কমাতে হবে।'



'আমরা কি ভাবে কমাব? আমাদের কি ক্ষমতা আছে!'

'ক্ষমতা নেই!' ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, 'আমরা টিকিট না কাটলেই লস কমে যাবে। সোজা অঙ্ক। ফুটো চৌবাচ্চা মনে আছে? ফুটো চৌবাচ্চায় যে জল ঢালা হবে, সেই জলটুকুই লস। জল না ঢাললেই হল। একেবারে সহজ সরল হিসেব।'

মুচকি হেসে, একটুও সময় নষ্ট না করে, আমার ঘাড়ে মাথা রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

আর একবার এক ভদ্রলোক আচমকা আমাকে মেরে ফেলছিলেন। সে ঘটনাও ঘটেছিল এক ভীড় বাসে। ফুটবোর্ডে এক মধ্যবয়সী মানুষ অবরোধ অভ্যাস করছিলেন। চলন্ত বাসে ছুটন্ত ওঠার সময় প্রথামত বলেছিলুম, 'দাদা একটু সরবেন!'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি দু'ধাপ ওপরে উঠে গিয়ে বিরল এক সৌজন্য প্রকাশ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতায় আমি অবশ হয়ে ধপাস্ করে রাস্তায় পড়ে গেলুম। হই হই করে বাস চলে গেল। কেউ পড়ে গেলে যাত্রীদের উৎসাহ



বেড়ে যায়। পড়ে যাওয়া মানেই প্রায় জীবন্মুক্তি। কেরানীর মুক্তি দেখলে পাছে অন্য কেরানীর ঈর্ষা হয়, তাই তাঁরা জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাতে থাকেন আর চিৎকার করতে থাকেন, 'তাকাও মাৎ। মাৎ তাকাও। চালিয়ে চালিয়ে।'

বাস মনে হয় জাতিতে হিন্দুস্থানী। কারণ বাসে উঠলেই লোকে বলেন, বাঁধকে, রোককে, উতার যাও।

যাই হোক, সে যাত্রায় মুক্তি পেয়ে গেলে এই রচনার সুযোগ পাওয়া যেত না। তা আমার সেই গাণ্ডীব-বৈকল্যের কারণ কি? তখনও এই শহরে ধুলো ঝেড়ে তুলে দাঁড় করিযে দেবার মত কিছু আরণ্যক মানুষ ছিলেন। তাঁদেরই একজন তুলতে তুলতে প্রশ্ন করলেন, 'কি করে চিৎপাত হলেন?'

'মানসিক ধাক্কায়।'

কি সেই ধাক্কা! এই পতনের কিছুকাল আগে, এক ডবলডেকারের প্রবেশপথ অবরোধ করে এক জওয়ান দাঁড়িয়েছিলেন, আড় হয়ে থাকা স্তম্ভের মত। কোনও রকমে পাদানীতে স্থান করে নিয়ে সেই দেবতাকে বিনীত অনুরোধ করেছিলুম, 'ভাই, ভেতরে তো গড়ের মাঠ, চলুন না।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেন। পরমুহূর্তেই পিস্টনের মত যথাস্থানে ফিরে এলেন বীর দর্পে।

'কী হল ভাই?'

তিনি যাত্রার হিরোর মত গলা ভারি করে বললেন, 'অন্যমনস্ক ছিলুম। খেয়াল করিনি। আপনি আমাকে বলবেন, আর আমি আপনার হুকুম তামিল করে ভেতরে যাব! হু আর ইউ! আমি কি সেই বাঙালী!'

বাসসুদ্ধ সকলে বলে উঠলেন, 'আরে রামো, আপনি ভেতো বাঙালী নন, বীর বাঙালী। থাকুন থাকুন ওইখানেই থাকুন।'

নামা-ওঠার সময় সকলেই সেই বীর বাঙালীকে ধাক্কা মেরে পা মাড়িয়ে তাঁর বীরত্বকে ম্লান করার চেষ্টায় নিজেদের অসীম নীচতা প্রকাশ করতে লাগলেন; কিন্তু নীচ বাঙালী আর বীর বাঙালী উভয় পক্ষই সমান অটল।

আমি আর আমি

'জানেন আমি কে ?'

নিজের আমিকে সকলেরই ভীষণ জানাতে ইচ্ছে করে। কেউ পারেন। কেউ পারেন না। পারার উপায় নেই বলে। আমির তেমন সাজ-সজ্জা থাকা চাই। তা না হলে বাইরে ঠেলে বের করা যায় কি করে! বেশির ভাগ আমিই তো ঘাসের মতো। পায়ে মাড়িয়ে যাবার আমি। 'চোপ' বলারও দরকার হয় না। তার আগেই নেতিয়ে আছে।

'জানিস আমি কে ?'

শুঁপো আমি। মোচড় মেরে দু'পাশে উঁচিয়ে রাখার মতো আমি। আমার শ্বশুরমশাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উঁচু উঁচু ভীষণ উঁচু পোস্টে চাকরি করেন। চার্টার্ড প্লেনে দিল্লি উড়ে যান। জানিস আমি কে ? বেশি ঘাঁটাসনি, এখুনি নোট ছাপা বন্ধ করে দিতে পারি।

জানিস আমি কে ? বড়বাজার থানার ওসি আমার বুজুম ফ্রেন্ড। ফোন তুলে একবার হ্যালো করলে, তোর খোল নলচে সব ফাটকে ভরে দেবে। মাস তিনেকের জন্যে ঠাণ্ডা। এ হল আমির হুঙ্কার। সরব আমি। অহরহ পথে ঘাটে, বাজারে, বাসে-ট্রামে, ট্রেনে এইসব বড় বড় আমির পাল্লায় পড়ে ছোট আমিরা নাস্তানাবুদ হয়। নিজের আলো নেই। সূর্যের আলো ধার করে চাঁদের মতো আমাদের চমকে দেয়।

কিছু মুচকি আমি আছে তারা আরও সাংঘাতিক। বড় বড় প্রতিষ্ঠান প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে রাখেন বিজ্ঞাপন সংস্থার ওপর। মুচকি আমিদেরও এজেন্ট থাকে। নিজেরা কিছু বলেন না। সময় মতো মুচকি হাসেন। মুখে এমন একটা ভাব ধরে রাখেন, যেন, 'হতভাগা তোদের মধ্যে আছি, সে আমার দয়া। আমার থাকা উচিত মাঁচা বেঁধে অনেক উঁচুতে।

এজেন্ট বলবেন, 'চেনেন এঁকে ?'

হয়তো দুজনে ঢুকেছেন স্টেশেনারি দোকানে সাবান কিনতে, কি পাউডার কিনতে এজেন্ট দোকানদারকে বললেন, 'চেনেন এঁকে ? কে এসেছেন

আপনার দোকানে জানেন ?'

দোকানদার বোকা বোকা মুখে হাসলেন। চোখে প্রশ্ন নাচছে। মুখে ভাষা নেই। ক্রেতা আর বিক্রেতা, এর মাঝে আর কি জানার থাকতে পারে! তবু শোনা যাক।

'সুচেতা মুখার্জির হ্যাজব্যাগু।'

কে সুচেতা মুখার্জি! ঈশ্বরই জানেন। দোকানের মালিক, অ হ্‌ হ্‌ করে কেঠো হাসি হাসলেন। এজেন্টের সন্দেহ হল, ধাক্কাটা ঠিক জায়গায় লাগল না। আর একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার।

'সুচেতা মুখার্জিকে চেনেন ?'

'আজ্ঞে না ?'

'সে কি! সিনেমা দেখেন না ? যখন-তখন ছবির নায়িকা।'

'অ তা হবে।'

দোকানদার অন্য খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার মুখে। এজেন্ট নাছোড়বান্দা। এই আমি ছেড়ে অন্য আমি নিয়ে পড়বে, তা হতে পারে!

'যখন-তখন দেখেন নি! সুচেতার অসাধারণ অভিনয়। একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে।'

'দেখার আর সুযোগ পেলুম কই। তিন দিনেই তো বই উঠে গেল।'

'ভালো বাঙলা বই আজকাল আর চলে না মশাই। সুচেতার আঠারোটা ছবি



ফ্লোরে আছে। শিগগির বোম্বে যাচ্ছে। নাসিরুদ্দিনের নায়িকা হয়ে
'কি বই?'
'কেন দেখেননি, ফিল্ম-পাউডার ম্যাগাজিনে কভার করেছে। ছবিটবি দিয়ে। দিল কি তালাস।'
'আহা, কি হবে এখন?'
দোকানের ভদ্রলোক এবার একটু দুষ্টুমি করতে চাইলেন।
'কি হবে মানে?'
'ভদ্রলোকের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেল। কে এখন রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে! কি বরাত মশাই আপনার?'
'দিন দিন সাবান দিন।'
'কি সাবান চান বলুন?'
একেবারে পপাত ধরণীতলে।
কিছু গোবদা আমি আছি। সেই কবিতার লাইন—'ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘিরিয়া গুমোট করিয়া আছে।' আমির চারপাশে আমি গুমোট মেরে আছে। একটা হুম্ হুম্ হুমদো ভাব। একটা দুটো ছিটে গুলির মত কথা। বেশি কথা



বললে পার্সোন্যালিটি লিক করে যাবে। রাস্তার একপাশ দিয়ে গম্ভীর মুখে হেঁটে যান। অচ্ছুতের দুনিয়া, তফাৎ যাও তফাৎ যাও। নীরবে সরব। আমি রাশভারি মানুষ।

কড়াপাক আমির পাশাপাশি কিছু রসমালাই আমি আছে। বিনয়ী। সজাগ। সুযোগ পেলেই ঝোপ বুঝে কোপ। যেমন কেউ হয়তো বলছেন, 'আজকাল আর ট্রেনে ট্র্যাভেল করা যায় না। অসম্ভব ব্যাপার।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলবেন, 'কেন করেন ! দু চারটাকা বেশি দিলেই তো এয়ারে যেতে পারেন। ফার্স্টক্লাশ এসি আর এয়ারে তেমন ফারাক নেই।'

কেউ বলছেন, 'আনাজপত্তরের দাম দিন দিন যা বাড়ছে, আর পারা যায় না।'

'ওদিকে যান কেন ? আমি আর যাই না। মাছ আর মাংস। মাংস আর মাছ। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল প্রোটীন ডায়েট। ভিটামিনের জন্যে ক্যাপসুল।'

কিছু আমি আছে ঠিকরে আমি। প্রথমে অন্য আমিকে খোঁচাবে, তারপর টুক করে নিজেকে প্লেস করে দেবে। যেমন, অনেকদিন পরে দেখা। কি কেমন আছেনের পরেই প্রশ্ন,

'বাড়িটাড়ি করলেন কিছু ?'

'না রে ভাই, এই বাজারে বাড়ি !'

'আপনার বাপমায়ের আশীর্বাদে আমি একটা লাগিয়ে দিয়েছি। পুব দক্ষিণ খোলা ফাসক্লাশ চার কাঠা জমি পেয়ে গেলুম। দাম পড়ে গেল অনেক। তিন তলার ফাউণ্ডেসান, দোতলা তুলে দিয়েছি। একদিন আসুন না। দেখে যাবেন গরীব-খানা। একসঙ্গে বসে দুটো ডালভাত খাওয়া যাবে। তবে হ্যাঁ, ছুটির দিন দেখে। আমরা কত্তা-গিন্নি দুজনেই আবার চাকরে। মিসেস আমার চেয়ে অনেক বেশি মাইনে পায়। বিলকুল মোজাইক। আগাপাশতলা। আপনাদের অফিস লোন দেয় না ! দেয় না। আমাদের দেয়। মস্ত বড় অ্যাডভান্‌টেজ।'

সব আমিরই শেষ পরিণতি—' আমাকে কি ভুলে বসে আছ প্রভু ! আর কবে নেবে !'

মেজাজ

মেজাজ জিনিসটা কি ? কেউ ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। কেউ গরম মেজাজের মানুষ। কেউ সাত চড়ে রা কাড়ে না। কেউ বাবা বললেও ফোঁস করে ওঠে। মেজাজের প্রকাশ কথায়। কথাতেই আগুন জ্বলে। আবার কথাতেই আগুন নেবে।

বাঙালী এমনিতেই বাক্যবাগীশ। রাস্তার ধাবের কলের মুখ এদেশে বন্ধ করার নিয়ম নেই। করলেই পানিশমেন্ট। যে করবে তার লাশ পড়ে যাবে। চোখেব জল আর কলের জল অবিরল ধারায় ঝরবে। আর ঝরবে বাক্য। বকে বকে নেতাদের জিভ মা কালী হয়ে গেল। বকে বকে শিক্ষকদের মুখে ফেকো পড়ে যায়, শিক্ষার হাল ফেরে না। ঘরে ঘরে মায়েরা বকে বকে অর্ধোন্মাদিনী, কর্তা যে তেঁএটে সেই তেঁএটে, ছেলেমেয়েরা যেমন এক বগ্‌গা সেই রকমই এক বগ্‌গা। সারা দেশ যেন বিশাল এক উত্তপ্ত কড়া, চটর পটব খই ফোটার মত কথা ফুটছে। ফুটেই চলেছে।

এই বাক্য প্রবাহের নব্বই ভাগই ফালতু। কেউ শোনেও না। গায়েও মাখে না। মোটরের অকারণ হর্ন, কি পুরোহিতের ব্যর্থ ঘণ্টা নাড়ার মতো। দেবতার নিঃশ্বাসও পড়ে না। চোখের পাতাও কাঁপে না। বাকি দশ ভাগেই সব জ্বলে পুড়ে যায়।

স্ত্রী যখন স্বামীকে বলেন, তোমার সংসারে এসে আমার হাড়-মাস কালি কালি হয়ে গেল। তখন ভয় পাবার কিছু নেই। তখন ভেটারেন স্বামীদের দুলে দুলে বলা উচিত, 'পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল ৷৷ কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল ৷৷' রাত পোহালেই সব সংসারে এই একই স্ত্রীরব। শাখায় শাখায় দোয়েলের শিসের মতো। কর্তা যখন স্ত্রীকে বলেন, 'সংসারটাকে একেবাবে ফুটো চৌবাচ্চা বানিয়ে ছেড়ে দিলে। চার কিলো তেল, দশ কিলো চিনি, দেড়শো টাকা ইলেকট্রিক-বিল।' তখনও ঘাবড়াবার কিছু নেই। এ হল স্যাকরার ঠুকঠাক। এই ঠুকঠাক থেকেই বেরিয়ে আসে স্বর্ণালঙ্কার। বুদ্ধিমান স্ত্রীরা স্বামীর অধিকাংশ কথাই শুনতে পায় না ! এই কথার পরেই সাধারণত বলবেন, 'আজ আসার সময়

চা আনবে। ছোলার ডাল আনবে। মোটা দানার চিনি আনবে।' ফরফর করে লিস্ট বাড়িয়ে যাও। একেবারে স্তব্ধ করে দাও। এই হল ট্র্যানকুইলাইজার। ডবল-ডোজ মরফিন।

'অ্যাঁ, এই তো সেদিন চা আনলুম। এরই মধ্যে ফাঁক করে দিলে?'

'ফাঁক কি আর আমি করেছি! করেছে তোমার রোববারের বন্ধুরা। চা করো। চা করো। এখন মেও সামলাও।'

কর্তা মিউ মিউ করে বললেন, 'দাও, আধকাপ চা দাও। খেয়ে গানে যাই।'

চা দিয়েই চায়ের ধাক্কা সামলাতে হয়। সংসারে এই ধরনের কথার ব্যাডমিণ্টন অহরহ দু'পক্ষে চলছে চলবে। এইতেই জীবনের রসকষ। মাসে একবার কর্তা হুমকি ছাড়বেন, 'এরপর ইলেকট্রিক বিল আমি আর পে করব না। কেটে দিয়ে যায় যাক।' এই ধরনের কথা সাধারণত এ-কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও-কান দিয়ে বের করে দিতে হবে। আমাদের দুটো কান ঈশ্বর দিয়েছেন কেন? 'এ-বার থেকে রোববার দিন আমি সকাল থেকেই কোথাও চলে যাব।' প্রতি রবিবার এই হল দিনের শেষ ডায়ালগ। স্ত্রী কি সত্যিই পালায়!

সংসারে উভয় তরফ-এর এই ধরনের মেজাজ সংসার-সঙ্গীতেরই ভলক ভলক পরিবেশন। কেউ চড়া সুরে গায়। কেউ নরম সুরে' সেতারের তবলা



চড়া-পর্দায় বাঁধা হয়। ত্যাড়াং ত্যাড়াং বোল ছাড়ে। এর নাম জীবন রঙ্গ।

কিছু কিছু সম্পর্ক আছে যা সহজে চিড় খায় না। মেজাজের অক্সি-অ্যাসিটিলিন কেটে দু ফাঁক করতে পারে না। যেমন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। হিন্দু রমণী এবং হিন্দু বিবাহ বন্ধন বড় মজার জিনিস। চোখে দেখা যায় না কিন্তু বড় শক্ত বাঁধন। এই বাঁধন যে-সব জীবনে খুলে পড়ছে, সেসব জীবন বড় দুর্ভাগা! মানসিক বিকৃতির শিকার না হলে দাম্পত্য জীবন সহজে চুরমার হবার নয়।

যৌবনের ঝড়ঝাপটা কোনও রকমে পার করে দিতে পারলে, রস আরও মজে। বুড়ো বুড়ীর খেল তখন আরও খোলে। দুটি ঝুনো নারকেলে ঠোকাঠুকি। আবার গলাগলি। এ বলছে, 'তুমি থামো তো। যা বোঝ না তা নিয়ে বেশি ফটর ফটর কোরো না।' ও বলছে, 'চোপ. বেশি কত্তাত্তি ফলাতে এসো না।' পাশ থেকে নাতি, নাতনিরা বলছে, 'লাগ ভেলকি, লেগে যা।'

স্বামী স্ত্রীর মেজাজের ঠোকাঠুকি হল রাগপ্রধান গানের মতো। সুরে, লয়ে, তালে, গমকে, গিটকিরিতে সাধা। তিন তালে বাঁধা। যৌবন, বার্ধক্য, প্রৌঢ়ত্ব। সমস্যা হল ভায়ে ভায়ে। মাঝে গিটার আর ঠোঁটে স্যাকসোফোন নিয়ে দুই বউ। সংগীতের বাণী হল, তোল পাঁচিল ॥ কর হাঁড়ি আলাদা ॥ সমস্যা হল পুত্রবধূ,



শাশুড়ী অথবা শ্বশুর। সংগীতের বাণী হল, প্রাণসখা ॥ ফ্ল্যাট দেখো ॥ চলো সরে পড়ি ॥ সুখে থাকি ॥ তুমি আর আমি ॥

মেজাজী মানুষ আর এক ব্যাপার। বেশ গরম মশলা দেওয়া সুস্বাদু তরকারির মত। লিকার আর ফ্লেভার মেলানো চরিত্র। নিজের অহংকার, পারিবারিক অহংকার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সব মিলেমিশে তৈরি হয় মেজাজ। এই সব মানুষকে শাস্ত্রের ভাষায় বলা যায় রজোগুণী।

এই রকম একজন মানুষ একদিন হাটে গেছেন। গিয়ে দেখলেন, একপাশে একটা লোক সতরঞ্চি বিক্রি করছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দাম?'

বিক্রেতা খুব তাচ্ছিল্যের জবাব দিলে, 'অনেক দাম।'

ক্রেতার মেজাজের ব্যারোমিটার বিক্রেতার অলক্ষ্যেই চড়ে গেল। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বল না ব্যাটা কত দাম?'

'বল না' আর 'ব্যাটা' সম্বোধনে বিক্রেতার মেজাজও চড়ে গেল। বললে, 'দাম শুনলে ছিটকে পড়ে যাবেন।'

'শুনিই না।'

'ষাট টাকা পার পিস।'

'ক পিস আছে?'

'কুড়ি পিস।'

ভদ্রলোক একটা রিকসা ডাকলেন। বিক্রেতাকে বললেন, 'দে, সবকটা তুলে দে।'

গিয়েছিলেন বাজার করতে ফিরে এলেন কুড়িটা সতরঞ্চির এক পাহাড় নিয়ে। বাড়ির সকলের চক্ষুস্থির। 'এ কি করলে?'

'এ সব তোমরা বুঝবে না! একে বলে প্রেসটিজের লড়াই।'

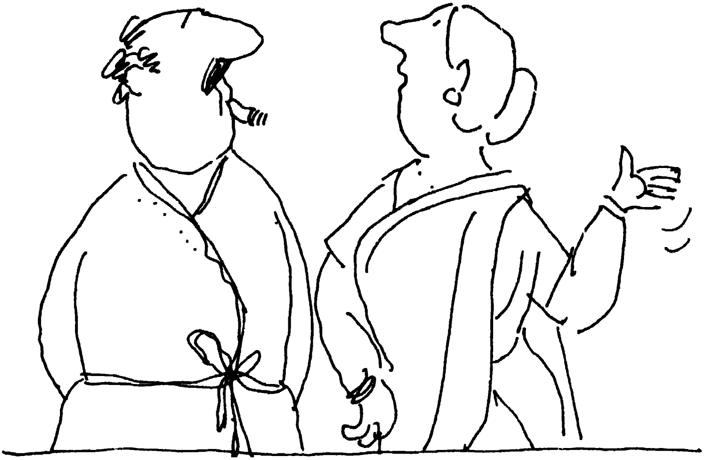
সব কিছুরই 'লোয়ার প্লেন' আর 'আপার প্লেন' আছে। শিবনেত্র যেমন সাধকের লক্ষণ, মেজাজ চড়ে গিয়ে যখন ব্লাডপ্রেসারের মতো উঁচু পর্দায় স্থির, তখন মেজাজী মানুষ। মজার মানুষ। সংসারের তুচ্ছ হিসেব-নিকেশের বহু ঊর্ধ্বে বিরাজমান।

মাইনাস লাখোপতি

রাগের গভীর ও ঘনীভূত রূপ হল অভিমান। যেমন দুধ। চিনিটিনি মিশিয়ে ফ্রীজে ঢুকিয়ে দিলে জমে আইসক্রিম। রাগ জমলে অভিমান। কর্তা প্রথম প্রথম খুব রাগতেন। থেকে থেকে কামানগর্জনের মতো কর্তার গর্জন। এঁকে ধাঁতাচ্ছেন। ওকে চাবকাচ্ছেন। কেবলই বলছেন, 'এসব আমি টলারেট করব না!' নাতি এসে দিদাকে বলছে, 'যেও না দিদা। বলছে টরালেট করবে না।'

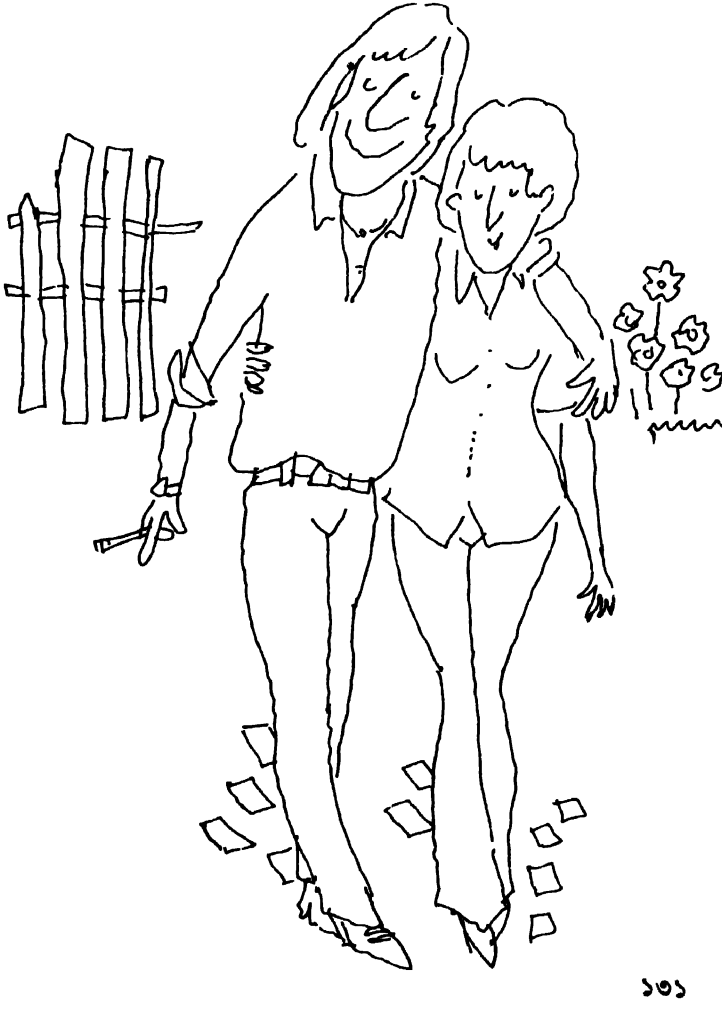
হঠাৎ কর্তা একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর ফায়ারিং-এ কোনও বুলেট নেই। সবাই জেনে গেছে ফাঁকা আওয়াজ। কর্তার কোনও ক্ষমতা নেই। যাকে বলেন দূর করে দোবো, সে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাথরুমে ঢুকে প্রাণ খুলে সিটি মারে। মাথায় পুং-বব, গলায় প্রেমঞ্জয় পদক। চামড়ার চাকতি বসান ট্রাউজার অ্যাতো টাইট, যে বাবু ভালো করে বসতে পারে না। চামড়ার সেলাই তবু পটপট করে। তাই বাবু ঠ্যাং ছড়িয়ে কাটোয়ার ডেঙ্গো। তাকালে কর্তার পা থেকে মাথা জ্বলে যায়। ভেতরে মাইকেলের মেঘনাদ গুনগুনিয়ে ওঠে—সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি।

আজকাল তো লেখাপড়ার কোনও ব্যাপার নেই। বাঙালী সব কিছুই উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। যেমন বাড়ি। বাগান। গাড়ি। গহনাগাঁটি। ব্যবসা। তেজারতি কারবার। জ্ঞান। পাণ্ডিত্য। সবই পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া। উত্তরপুরুষের তো আর কিছু করার নেই। যেমন চাষবাস। সবই করা হয়ে গেছে। মাঠ ভর্তি ফসল হিলহিল করছে। উঁচু মাচায় বসে উত্তরপুরুষ ফুরফুরে হাওয়া খাবে আর চেরা বাঁশের শব্দ করে চড়ুই তাড়াবে। সবই তো হয়ে গেছে। হয়ে আছে। এখন প্রেম ছাড়া আর তো কিছুই করার নেই। সব সংসারেই চলেছে সখী-সংবাদ। পেছন থেকে দেখলে বোঝা দায়, কে ছেলে, আর কে মেয়ে। মেয়েরা সব গহনাগাঁটি খুলে ঝাড়া হাত পা। সামান্য একটা ব্রেসলেট অথবা রিস্টলেট। কানে দুটো ইয়ারিং। চুলে মুড়ো ছাঁট। সেকালে মেয়েরা কোনও অপরাধ করলে চুল যেভাবে পুঁচিয়ে দেওয়া হত। ছেলেদের 'লড়লপেট' এখন মেয়েদের হার মানায়। কবজিতে হংকং-এর কবজ। জলন্ধরের বালা।



গলায় 'আই লাভ ইউ ডারলিং' লকেট। কারুর কারুর গলায় কংখলের রুদ্রাক্ষ। মন্ত্রঃপূত স্ফটিক মালা। লটবহরের অভাব নেই। আধুনিক যুবককে সার্চ করলে কি কি পাওয়া যাবে—পদক তিন চার রকম। তাগা তাবিজ। বগলের পাশ থেকে ঝোলা খোপ খোপ ব্যাগ। চিরুনি, অবশ্যই মেয়েলী। কারণ সকলেই পুং-ববের অধিকারী। লাইটার। সিগারেটের প্যাকেট। কোমরে হরেক কায়দার বেল্ট। আবার সেকাল-একাল, ইহকাল-পরকাল সবই তো একসঙ্গে চলেছে। ফ্রি সেক্স, লিভিং টোগেদারের পাশাপাশি, অষ্টমে শনি, একাদশে রাহু। ফলে এ আঙুল, সে আঙুলে গোটা কতক আংটি থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই। জাত হিসেবে বাঙালীর ভ্যালুয়েশন না বাড়লেও, আধুনিক যুবকের ভ্যালুয়েশন খুব বেড়েছে। একটাকে ধরলে, মরলগ অনেক টাকার ক্যাচ হবে। প্যাণ্ট জামা ভেস্ট আণ্ডার গার্মেণ্ট সবই 'ফোরেন' অথবা দিশী 'ফোরেন'। শ' পাঁচেকের মত ইলেকট্রনিক ঘড়ি। পায়ে শ' আড়াই টাকার জুতো। মোজা গোটা চব্বিশ টাকা যৌবন খুব কস্টলি। সেকালের একটা ছেলেকে ধরলে, কত হত? খুবই সামান্য। যাকে বলে ছুঁচো মেরে হাত-গন্ধ। একটা খেঁটে ধুতি। টুইলের হাফ হাতা জামা।

এই সমৃদ্ধি সহজে হয়েছে। সাধনায় হয়েছে। সুকৃতি। আমরা পেয়েছি।



কোথা থেকে পেয়েছি কি ভাবে পেয়েছি জানার দরকার নেই। বাঙালী হল। বাঙালী হল···। কি হল ? সে অনেক ব্যাপার। কর্তা তো সেইটাই সোচ্চারে উত্তরপুরুষকে জানাতে চান। জানিস তোরা কে! কোন বংশের ছেলে মেয়ে। আমাদের অমুক। আমাদের তমুক।

কর্তা যদি গিন্নির সাপোর্ট পেতেন তাহলে ছেলেমেয়েরা শুনত। বাঁখারির মতো বাঁকা সহধর্মিণীরাই যত নষ্টের মূল। তিনি অমনি পোকাখাওয়া দাঁতে সেফটিপিন খোঁচাতে খোঁচাতে বলবেন—চুপ করো। চুপ করো। ঝুনঝুনওয়ালার ছেলে কোটি টাকার উত্তরাধিকারী হয়। আর তুমি কিসের উত্তরাধিকারী হয়েছিলে। পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণের। বসতবাটি বেচে শোধ করলে। দুই মেয়ের বিয়েতে হয়ে গেল লাখ টাকা ধার। নাও এবার মরো। সেইটাই দিয়ে যাবে ছেলেকে। লাখপতিই হল। তবে টেম্পারেচারের যেমন প্লাস-মাইনাস আছে, সেই রকম আর কি! মাইনাস লাখোপতি। মাইনাস ক্রোড়পতি। বসে বসে কানে পায়রার পালক দিচ্ছ তাই দাও। ওরা যা করছে করুক। তুমি গীতা পড়। মা ফলেষু কদাচন।

কর্তা রাগেন। রাগে অগ্নিশর্মা। দুম দুম করে চলতেও পারেন না। গেঁটে বাত। হার্ট-এর বাঁধন ঝুলে গেছে। রাতে ঘুম হয় না। ছেলেদের ডাকলে বলে, লিলির সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। লিলি আর মিলি। রূপচর্চা। কেশচর্চা। মেয়েও গালে ক্রিম মেখে শুতে যাচ্ছে। ছেলেও তাই। বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে খড়ম পেটাতেন।

কর্তার রাগ জমে এখন ভীষণ অভিমান। একপাশে গুম মেরে থাকেন। হুঁ হাঁ ছাড়া কথা নেই। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কার বাপ। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আমি কারুর বাপ নই। বাঙালীর বর্তমান পুরুষ তাই সম্পূর্ণ অনাথ। বাপও নেই, মা-ও নেই। পথে বিপথে শুধু ম্যাও ম্যাও করে ঘোরা ॥

মেডইজি

মেড ইজি ॥ এই যুগের নাম 'মেড ইজি' যুগ। এই শব্দটি প্রথমে এসে ঢোকে ছাত্রমহলে। আমাদের সময়ে মূল বই পড়তে হত। হাতে 'মেড ইজি' দেখলে শিক্ষকমশাই ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন অথবা ছিঁড়ে ফেলতেন। বলতেন—চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না। শিখতে চাও, না পাশ করতে চাও! মার খাবার ভয়ে আমরা বলতুম শিখতে। সত্যিই কি আমরা শিখতে চাইতুম! আমরা পাশ করবো। চাকরি বাকরি যা হয় একটা কিছু জুটিয়ে নিয়ে, ঘোঁত ঘোঁত করে অফিস যাবো আবার হেলতে দুলতে ফিরে এসে লুচি আলুভাজা খাবো। তারপর পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে পাড়ায় আড্ডা মারতে বেরবো। শনিবার সিনেমা দেখবো। রবিবার দুপুরে মাংসর ঝোল ভাত খেয়ে ভোঁস ভোঁস দিবানিদ্রা। এই তো জীবনের লক্ষ্য ছিল। পুজোর ছুটিতে, ছুটিব সঙ্গে ক্যাজুয়েল লিভ জুড়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাওয়া। বছরে একবার অফিস ক্লাবের ফাংশান নিয়ে মেতে ওঠা। পারলে নাটকে ছোটখাট কোনও ভূমিকায় অভিনয় করা। অবশেষে একদিন প্রজাপতয়ে নমঃ হয়ে যাওয়া। তখন আর এক আমি। অফিস থেকে ফিরে এসে আর লুচি আলুভাজা নয়। মুড়ি আর চা। আড্ডা নয়। বাড়িতেই বসে থাকা। প্রজাপতির সঙ্গে বাক্যালাপ। প্রথম প্রথম বাক্যালাপ। পরে অম্লমধুর। অবশেষে শুধুই অম্ল। দিন যায়। প্রাণ যায়। হয় মোটা হওয়া, না হয় রোগা হওয়া। মাথাজোড়া টাক। দুচোখে মরা মাছের দৃষ্টি। হিসেব-নিকেশ। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। এই করতে করতে, ব্লাড-সুগার, আলসার, ক্যাটারাক্ট। শেষ পরিণতিটা এত বিশ্রী, এত অগৌরবের, ভাবলেই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

ছাত্র জীবনের সেই মেড ইজি এখন স্বীকৃত সত্য। সকলেই জানে, টেক্সট বুক পড়লে কপালে রসগোল্লা। নোটস আর মেড ইজিই সব। তুড়ি মেরে, ফুঁ দিয়ে, এম এ, এম বি বি এস বি ই। অভিজ্ঞরা বলবে, পাগলা, অম্বুটি সরিয়ে ক্ষীরটি গ্রহণ করতে শেখ। এই পৃথিবীতে বই পড়ে কিছু শিখতে হয়! অন্তত এ দেশে নয়। এ দেশে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সব অটোমেটিক কায়দায়

শিখতে হয়। এ দেশ কোনও নিয়মে চলে না। এ দেশ চলে নিজস্ব জ্ঞানে। যার যা মনে হবে, সে তাই করবে। মন্ত্রী থেকে আমলা, জমিদার থেকে জমাদার প্রত্যেকেই এক একটি কানুন। এক একটি শাস্ত্র। এর জ্ঞান, তার জ্ঞান, রামের জ্ঞান, শ্যামের জ্ঞান। জ্ঞানে জ্ঞানে ঠোকাঠুকি। অসি-যুদ্ধ। বিজলী খেলছে। ঘটনার পর ঘটনায় দেশ চমকে চমকে উঠছে। যাদের আছে, তারা এক পয়সাও ট্যাক্‌স না দিয়ে সমান্তরাল অর্থনীতি গড়ে তুলে দেশ চুষছে। আর যাদের কিছুই নেই তাদের গলায় আইনের ফাঁস পরিয়ে টান মারা হচ্ছে।

মেড ইজি সর্বত্র। পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে! কি করতে হবে! নিবারণের উপায় কি! ট্র্যাফিক সিগন্যাল উপড়ে ফেলে, নতুন চতুর্মুখ সিগন্যাল লাগাও। ট্র্যাফিক পুলিসের টুপিতে ফ্লোরেসেণ্ট রিবন। আর দশ হাত অন্তর ছোটখাটো টিলার মতো হাম্প। যারা গাড়ি চালাবে তাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দাও। হাম্প নিয়েও





রাজনীতি। ও দল আন্দোলন করে একটা হাম্প করাল, তো এ দলের টনক নড়ল। এই ভাবে হাম্পের পর হাম্প। রাস্তা যেন করোগেটের চাল। এক এক জায়গায় আবার হাম্পের রোমাঞ্চ। একের পর এক সাতটা ঢেউ। লোকে এত দুঃখেও রসিকতা ভোলেনি। ওই হাম্পে পড়ে মায়ের কোলে শিশুর দুলুনির মত তিরতির করে নাচতে নাচতে বলে—একেই বলে বাম্প-ফ্রন্টরে ভাই।

বিদেশে গিয়ে কোন্ বড়কর্তা দেখে এলেন ঝকঝকে রাস্তা রাতে আলোকিত হয়ে উঠছে আধুনিক মার্কারি অথবা হ্যালোজেন ভেপার ল্যাম্পের আলোয়। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল—লিয়ে এসো। কোদলানো, খোবলানো রাস্তার আঁস্তাকুড়ে দিন কতক চাঁদের আলো, সূর্যের আলো ঝরল। তারপর সেই—আমার কথাটি ফুরলো, নটে গাছটি মুড়লো। যে দেশে ইলেকট্রিসিটি ডাইরেক্টরেটের বদলে

ল্যাম্পো-ডাইরেকটরেটের কথা ভাবা হচ্ছে—সে দেশে মারকারি হ্যালোজেন। আলো আর জ্বলে না। পোস্টের সেই বরাভয় বাহু শীতে কেঁপে কেঁপে খসে পড়ছে। হায় আলো!

আজকাল বিদ্যুৎ থাকলেও রাস্তায় আলো না জ্বালানোটা, এই বেদ-বেদান্ত ও আলোর দেশের মানুষদের রেওয়াজ। একদা তিনি বলেছিলেন—লেট দেয়ার বি লাইট। আর এখন এঁরা বলছেন—লেট দেয়ার বি নো লাইট। অন্ধকারে এগনোর এই সুবিধে—কোথায় যাচ্ছি বোঝা যায় না।

মেড ইজির যুগে আর এক খেলা—হঠাৎ দেখা গেল মহাপুরুষের মূর্তি ঘিরে মাঁচা পড়েছে। সকালে এক দেশনায়ক এসে গলায় ঢাউস এক মালা ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেন। মঞ্চে ওঠার সময় নিচের দিকে তাকান আর কেবলই বলেন—পড়ে না মরি। কি গেরোয় ফেললে গুরু। বাস্ হয়ে গেল কর্তব্য। খাঁখাঁ দুপুর। জনশূন্য ময়দান। উঁচু পেডেস্টালে নিঃসঙ্গ মহামানব। শিল্পীর হাতের কেরামতিতে চেনাই যায় না। গলায় শুকনো মালা। পদতলে এক জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা। মহামানবের কাঁধে একটা কাক। কানের কাছে খা, খা করছে। নেহাত পাথরের কান!

এ যুগের মহামানবের সঙ্গে সে যুগের মহামানবের মতের মিল নেই। মালা একটা দিতে হয় তাই দেওয়া। ওই পাথুরে মূর্তি যা বলেছেন, যা কবেছেন সব ভুল। হেরিটেজ বলে আমাদের কিছু নেই। রেজিমে রেজিমে আমরা নতুন করে জন্মাচ্ছি। বন্ধুগণ, ডান দিকে চলো। বছর পাঁচেক চলার পর হঠাৎ দৈববাণী—বাঁ দিক।

ডান বাঁ, বাঁ ডান। সরীসৃপের মত মরছি ঘুরে। তিনি যা বলেছেন ভুল। আমি যা বলছি ঠিক। আমি যেই তিনি হলেন সঙ্গে সঙ্গে খারিজ। মানুষ বিরক্ত। সকলেই বুঝে গেছে—সব বেঠিক।

শুধু বম্বের ছবিই ঠিক—যাব বাণী হল

॥ দম মারো দম ॥

অরিজিন্যাল

যাক বাবা ! এ বেশ ভালই হয়েছে ! একে বলে শাপে বর। সবাই মিলে ক্ষেপে গিয়ে দেশটাকে যদি আমেরিকা কি জার্মানি বানিয়ে দিত, আমাদের অবস্থাটা কি হত। বসে বসে ন্যাজ নাড়ার দফারফা। ডেকে ডেকে, লিয়ে যা জ্ঞান লিয়ে যা বলে চেতল মাছের মত রকে চিতিয়ে পড়ে থাকার বারোটা বেজে যেত। এমন কি লাল দুনিয়ার রাশিয়া বানিয়ে দিলেও আমাদের এই মুড়ি তেলেভাজা, বেগুনপোড়া খাওয়া স্বভাবের কি হত ! নাকের জলে চোখের জলে।

স্ত্রীর শাড়ি দুভাঁজ করে, লুঙ্গির কায়দায় পরে, বুক খোলা গেঞ্জি গায়ে সকাল সন্ধে হ্যাঁগা, হ্যাঁগা, শুনছো শুনছো, বলে বেড়ালের মতো পায়ে পায়ে এ-ঘরে, ও-ঘরে বেড়ান বেরিয়ে যেত। 'আমি অফিস যাই', আর সেই সুবাদে বাকি সময় বসে বসে গোঁফে তা দি আর কাপ কাপ চা খাই, সেটি হবার যো থাকত না। আমাদের বেতো, ঢ্যাপসা জীবনের ছন্দই পাল্টে যেত। চটি ফ্যাটফেটিয়ে অফিস যাওয়া আর সারাদিন চেয়ারে আড় হয়ে বসে, এই যে হরেন, এই যে খগেন, শোনো শোনো মালবী, শাড়িটা বেড়ে লড়িয়েছ, আর কাজের কথা কয়ে বড় কত্তা একটু চোখ গরম করলে, ছোট ছেলে যেমন ঘাড় কাত করে বলে—এঁ দাঁলা নাঁ মাকে বলে দোবো, সেই রকম মুখ গোঁজ করে বলা, দাঁড়াও না ব্যাটা বলছি ইউনিয়ানকে। ঘিরে ধরে অ্যায়সা শ্লোগান চেল্লাবে সারা জীবন কানে শুধু ভোঁ ভোঁ শুনবে। এমন সব খাঁটি স্বদেশী কায়দা অচল হয়ে যেত।

সব রাস্তাঘাট, হাইওয়ে, সাবওয়ে মেরামত করে ঝকঝকে করে ফেলতে হত। সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার ! এখন যেমন খরচ হয় অদৃশ্য কাজের জন্যে আর বেদান্তবাদীদের কায়দায়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আজ আছি কাল নেই। দে দুটো ভাঙা ইট ফেলে দুরমুশ করে। আজ আছি কাল নেই, সবই যখন ক্ষণস্থায়ী তখন দীর্ঘস্থায়ী পথেব কথা কে ভাবে : ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। সেই ভাবটিকেই সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কাজের ধারায়। টাকা যেন খোলামকুঁচি। লাখ, বেলাখ, কোটি, অর্বুদ। প্রাপ্তি লবডঙ্কা। আর

সরকারী মাইফেলের নিরাসক্ত কর্মযোগীরা কেবল মাটি খুঁড়ে চলেছেন। কিপলিং বলেছিলেন, **East is East, West is West, the twain shall never meet**। ভুল বলেছিলে সাহেব। আমরা দেখিয়ে দেবো পূর্ব আর পশ্চিম মিলবেই। খুঁড়ে খুঁড়ে ফুটো করে ফেলেছি। এবার ওপর থেকে লেজটি ঝুলিয়ে ওয়েস্টের মাথার ওপর দোলাতে থাকব। সেতুবন্ধনের হিরো কে ছিল? হনুমান। সে কথা আমরা ভুলিনি। জয় শ্রীরাম। স্বীয় সাধনায় আগে হনুমান হয়েছি। তারপরে লাঙ্গুলটি ঢুকিয়েছি। 'ডিপওয়েস্ট' থেকে বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে কালচারের কাঁকড়া। শেয়াল এই কায়দায় কাঁকড়া ধরে। কথামালার হিরো শৃগাল। পৃথিবীর হিরো আমরা। ফুস্ করে স্বাধীনতা। সায়েবরা কোটটা পরিয়ে দিয়ে গেল। আমরা চেয়ারে বসে পড়লুম। তারপর মধ্যরাতে সারমেয়ের সচিৎকার খেয়োখেয়ির মতো, নেতায় নেতায়, চামচায়, চামচায়, দেশমাতার




MEN
AT
WORK

দেহখণ্ড নিয়ে ঘ্যাঁঘ্যাৎকার।

খুঁড়ে খুঁড়ে এই যে খোঁড়া কালচার তৈরি হয়েছে এর কি কোনও তুলনা আছে! আমি নেতা হলে প্রশ্ন করতুম, বৎস দেশবাসী, খাঁটি মাল চাই বলে খুব তো লাফান হয়! খাঁটি ঘি, খাঁটি মশলা, দুধ, খাঁটি মানুষ। নকল কেউ চায় না। চায় ওরিজিন্যাল। তা অবিজিন্যাল পৃথিবী কি রকম ছিল? পিচের ঢালাও মসৃণ রাস্তা ছিল? হোয়াইট হাউসের মতো বিশাল সুদৃশ্য বাড়ি ছিল কি? রাতে ঝলমলে আলো জ্বলত! পেট্রলের কালো ধোঁয়া ছেড়ে, বিকট হর্ন বাজিয়ে কলের গাড়ি ছুটত! অরিজিন্যাল পৃথিবী, মাদার আর্থ যেমনটি ছিল, আমরা সেই আদি অকৃত্রিম পৃথিবীকে একেবারে গাছপাড়া ফলের মতো স্বদেশবাসীকে উপহার দিতে চাই। সেই এবড়োখেবড়ো, খানাখন্দ বোঝাই ভূত্বক। দিনে আলো। রাতে অন্ধকার।

আরো বলতুম, একবার বুঝে দ্যাখো, আবর্জনা মানুষেরই সৃষ্টি, লাখ লাখ মানুষ, কোটি কোটি মানুষ, খাচ্ছে, ফেলছে, করছে, ভাসাচ্ছে। আমরা সবাই অমৃতের পুত্র। কেউ কারুর ক্রীতদাস নই। কে কার অপকর্ম পরিষ্কার করবে! বাঘ, সিংহ, হায়না, হাতি, শৃগাল, কুকুর এদের সমাজে মিউনিসিপ্যালিটি আছে? করপোরেশান আছে? অ্যাসেমব্লি আছে? পার্লামেন্ট আছে? ভুবনেশ্বরের পরিত্যক্ত মন্দিরে শত শত বাদুড়ের আস্তানা। ঢুকলে কি সেন্টের গন্ধ বেরোয়! চণ্ডীমণ্ডপে পায়রার আস্তানা। তলাটা কেমন হয়ে থাকে?

আমরা বেদান্তবাদী ঋষিপুত্র। ওই আকশে সূর্য। আর এই আমাদের পায়ের তলায় অরিজিন্যাল পৃথিবী। আমাদের কলকারখানা, কোর্ট কাছারি, অফিস সেরেস্তা, পাওয়ার প্ল্যাণ্ট কিছুই থাকবে না। চীন, জাপান, ইওরোপ, আমেরিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভোগবাদী। আসল ছেড়ে নকল নিয়ে সব ভুলে বসে আছে। মায়া, মায়া। বলো, ব্যোম শঙ্কর। গীতা বলছেন, উদাসীনবদাচরেত উদাসীন থাকো। কে চুবি করে ফাঁক করে দিলে! কে কালিয়া পোলাও খেলে। কে গাড়ি বাড়ি করলে, কোন্ দেশ উন্নতি করলে, বয়েই গেল। আমাদের দেখার দরকার নেই।

আমরা বাবা ওরিজিন্যাল।

কী বরাত

এক দিকটা বেশ ফুলছে। গাল নয় ? সমাজ। বিত্তে, বৈভবে, প্রতিপত্তিতে একটা দিক ফুলে ফেঁপে ঢোল। কি বোলবোলা! কি রমরমা! বলার কিছু নেই। আমরা পেরেছি। তোমরা পারনি। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসতি। যেমন বাণিজ্যই হোক, লক্ষ্য পয়সা। কালোতে, সাদাতে মিলেমিশে কাঁড়ি কাঁড়ি খোলাম কুঁচি। জড়ো কর আর উড়িয়ে দাও।

বিত্তবানদের দেখেও সুখ। কি আশ্চর্য জীবন! গম্ভীর, ভারিক্কি চেহারা। পরনে হয়তো সাফারি স্যুট। শিকার আর কি করবেন! একমাত্র শিকার মুনাফা। আর অর্থের ধর্মই হল, আসতে শুরু করলে বন্যার মতো আসতে থাকে। পাতা-জল। হাঁটু-জল। বুক-জল। শেষে ডুব-জলে হাবুডুবু। বাড়ি, লন, গাড়ি। গাড়ির ওপর গাড়ি। অবশেষে ধনের কয়েদে কয়েদী।

আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার উপায় নেই। কথাবার্তার মিষ্টতা চলে যায়। সব সময় হুঙ্কার। বেয়ারা। হুইস্কি সোডা। গেট থেকে গাড়ি। গাড়ি থেকে অফিস। অফিস থেকে গাড়ি। গাড়ি থেকে এখানে ওখানে, নানা অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ব্যাক টু বাড়ি। কখনও প্রথম রাত। কখনও মাঝ রাত। তরলে চেতনার তিনের চার অবশ। একের চারে বিছানা, বালিশ, শয্যা, আর পরিবার পরিজন।

কি দুঃখের জীবন! ধনবান হবার মতো শাস্তি আর কিছু নেই। 'যাও তোমাকে যাবজ্জীবন দিলাম।' সুগার, প্রেসার, বিকল হৃদয় নিয়ে নোটের পাহাড়ে বসে থাক। ভালবাসার কেউ নেই। ভালোবাসবার মতো কেউ নেই। শরীরে, মনে সর্বসময়ে অপটু। সব সময় দুশ্চিন্তা, এই বুঝি ফস্‌কে গেল। জোয়ারের জল এই বুঝি নেমে গেল!

মার্কিন মুলুকের এক বিলি, বিলি, বিলিয়নেয়ার একদিন সকালে তাঁর বহুতল বাড়ির ওপরতলা থেকে নিচের লনে মারলেন লাফ। কারণ, ছোট্ট একটি নোটে লিখে গেছেন, বলা তো যায় না, হঠাৎ যদি সব চলে যায়! তখন আমার কি হবে!

সত্যিই তো, কি হবে ! যে ফুটপাথে আছে, তার আর ভয় কি ! থাকলেই হারাবার ভয়। না থাকলে ঘোড়ার ডিম। জুটলে খাই। না জুটলে ঘুমোই। একপাশে বসে বসে তামাশা দেখি। সোনার দর উঠলো না নামল জানার দরকার নেই। শেয়ারবাজারের ওপর দমবন্ধ করে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে না। চা, তেল, চট, লোহা যে যেখানে যেমন আছে থাক না। আমার কিছু যায় আসে না। জগৎ একটা হলেও, মানুষের তৈরি জগৎ অসংখ্য।

ঘোড়ার জগতে যাঁরা আছেন, তাঁরা ঘোড়া ছাড়া আর কিছু জানেন না। মাঝে মাঝে ছেলে মেয়েকেও ঘোড়া বলে ভুল হয়। স্ত্রী হয় তো বললেন, 'শেলীর শরীরটা খারাপ হয়েছে।'

'অ্যাঁ, তাই না কি। সেরেছে। আরে মনসুন-র‍্যাফেলে শেলীই তো আমার ফেভারিট ছিল। তুমি কি করে জানলে ! বাবাঃ, ঘোড়া এমন জিনিস ? সাধে কি তারে ভালবাসি ?'



স্ত্রী খিচিয়ে উঠলেন, 'শেলী ঘোড়া নয়। তোমার মেয়ে। বুঝতে পেরেছ মোটা মাথা ?' জনৈক অশ্বপ্রেমী রোজ রাতে ঘোড়ার স্বপ্ন দেখতেন। ভীষণ উত্তেজনা। মাঠভর্তি ঘোড়া ছুটছে। আর স্বপ্নের ঘোরে তিনি বালিশ খামচে ধরে, 'বাক আপ। বাক আপ' করছেন। ফর্দাফাঁই বালিশ। সকালে ঘুম থেকে উঠলেন, শ্বেত ভল্লুক। 'চা হয়েছে চা!'

ফিল্মের জগতে যাঁরা আছেন তাঁদের কি যন্ত্রণা! প্রথমে যৌবন ধরে রাখার অকথ্য সাধনা। পর্দার জীবনে দেহই সব°। মুখে ময়দার পুলটিস মেরে চিৎ হয়ে পড়ে থাক। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ আজ খায়, আবার কাল খায়। কি খায় তা বিধায়করা জানেন না। জানেন বিধাতা। প্রোটিন, ভিটামিন, নিউট্রিশান, ম্যালনিউট্রিশানের কুচকটালে হিসেবের বাইরে অধিকাংশ মানুষ পবন-আহারী



পওহারী, বাবা। সেই দেশে রোজ পুলটিস মারছেন মুখে চিত্র-তারকা থেকে শুরু করে সৌন্দর্য সচেতন যুবক যুবতী। পুলটিসের ফর্মূলা : মধু, অলিভঅয়েল, মৌচাকের মোম, ডিম, বাদাম বাটা, যাবতীয় দামী-দামী উপাদান। তালটা মুখ থেকে তুলে ফেলে দেবার পর, বেকিং ওভেনে ঢুকিয়ে দিলেই সুস্বাদু, দামী কেক। পায়ের গোড়ালি নিয়ে কী যন্ত্রণা! গোলাপী গোড়ালি চাই। মোমের মত মসৃণ। কিছু পা পৃথিবীর পথে হাঁটার নয়। হাঁটবে কার্পেটে। তেলা মেঝেতে। নাও এখন বসে বসে পায়ে পিউমিস ঘষ। গরম জলে সোডিবাইকার্ব ও আরও মালমশলা গুলে পা ডুবিয়ে বসে থাকো। ত্বকের চেকনাই বজায় রাখার জন্যে গেলাস গেলাস ফ্রুট জুস। থেকে থেকে ঠাণ্ডা দুধ। সর্ব সঙ্গে সৌন্দর্যপ্রলেপ লাগিয়ে সুন্দরী সোফায় বসে কচরমরচ করে লেটুসপাতা আর গাজর চিবিয়ে চলেছেন। আলু-সিদ্ধর মতো মাঝে মাঝে মুখমণ্ডলকে বাষ্পসিদ্ধ করে নিতে হয়। লক্ষ প্রকার অ্যাসট্রিনজেণ্ট আর লোশনের ছড়াছড়ি।

'কই রে তোরা কোথায় গেলি?'

'আজ্ঞে দিদিমণিরা বিউটি করছেন।'

সে আবার কি! গড়াগড় তিনটে খাট। তিনটে মুণ্ডু ঝুলছে। পাশে একটা টেবিল ঘড়ি ক্যাটর ক্যাটর করছে। দেহ খাটে কাটা কদলিকাণ্ড, মুণ্ড ঝুলছে ছুঁই ছুঁই মেঝে। পনের মিনিটের সেশান। দেহের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমবে। লাল টুকটুকে মুখ। সাদা ঝকঝকে দাঁত।

মানুষের কি বরাত! পরিবারের মাথা টাকা টাকা করে পাগল। টেনশান আলগা করার জন্যে—হোয়েন দি সান গোজ ডাউন, সামনে সারি সারি বোতল। মাঝ রাতে জড়ানো গলা—বলতে পারো, আমি কে?

হ্যাঁ পারি। তুমি চিনির বলদ। তোমার বউ ওড়াচ্ছে। মুখে ফেসিয়েল নিয়ে পড়ে আছে মেয়ে। ছেলে হাইফাই নিয়ে হাঁসফাস করছে। আর তুমি! মরণকালে ধুনী ছাড়া রবে না তো কিছুই পাশে॥

দ্বিতীয় রিপু

দ্বিতীয় রিপু ক্রোধ। কেউ কেউ স্বভাব রাগী। সব সময় রেগে টং। কথা বলেন ধানীপটকার মতো। মেজাজ যেন ছিলে-টান-ধনুকেব মতো। কাছে যেতে ভয় করে। আর কেউ কেউ এমনি ঠাণ্ডা মানুষ। মাঝেমধ্যে রেগে যান। আব সবাই বলেন, আছে তো আছে। বেশ আছে। রেগে গেলেই সর্বনাশ। জ্ঞান থাকে না। তখন কি যে করে ফেলবে কেউ বলতে পারবে না।

রাগের হরেক রকম বহিঃপ্রকাশ। কেউ গুম্ মেরে থাকেন। মুখ চোখ লাল থমথমে। এই স্বভবের মহিলারা রেগে গেলে সংসারের বেশ উপকার হয়। রাগে ভেতরটা পুড়ছে। গায়ে হাত ঠেকালে আঙুল ছ্যাঁক করে উঠবে। গুম গুম্ করে এধার ওধার ঘুরছেন আর কাজ কবে চলেছেন। কেউ সাহায্য করতে গেলে শীতল গলায় বলছেন,'থাক। থাক। খুব হয়েছে। আমাকে সাহায্য করতে হবে না। আমি তোমাদের জন্যে মরতে এসেছি, আমাকে মরতে দাও।' যে সব কাজে সাধারণ অবস্থায় হাত পড়ে না, রাগের অবস্থায় সেই সব কাজ ধরে টানাটানি। হয় তো স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতে হতে খাণ্ডবদাহন। হয় তো কথা চালাচালিব মুহূর্তে তিনি বলে ফেলেছিলেন—এ তো বেওয়ারিশ সংসার! কে আর কি দেখছে! কে ঝুল ঝাড়ে। কে বিছানাব চাদর কাচে! টেবিল চেয়ার যেন অপরাধী ধরার ফাঁদ! হাত দিলেই ফিঙ্গাবপ্রিন্ট। আমি বলেই এমন ময়লা গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াই। এখন রোজগাব করছি, তাইতেই এই খাতির। রিটায়ার করলে কি হবে! বলতে পারো কি হবে! ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ধাপায় দিয়ে আসবে টান মেরে ফেলে।

সংসারে রাগের তো একটিই উৎস। স্বামী স্ত্রী দুই চকমকি। ঠোকাঠুকি, ঠোকাঠুকি। আগুন। সেই আগুন দাবানলের মতো ছড়াবে। পুড়বে ছেলে মেয়ে। শ্বশুর শাশুড়ী। তা যে হেতু কর্তা বলেছিলেন, কাচাকুচি হয় না। চতুর্দিকে ময়লা, আবর্জনা। লাগাও। আজ সারা বাড়ি ঝেঁটিয়ে সাফ করা হবে। যেখানে যা কিছু আছে সব কাচা হবে। এমন কি কর্তা যা পরে আছেন সেটিও খুলে নেওয়া হবে। খোলো। চালাকি পেয়েছ, কাচা হয় না? প্রাণে বাঁচার জন্য

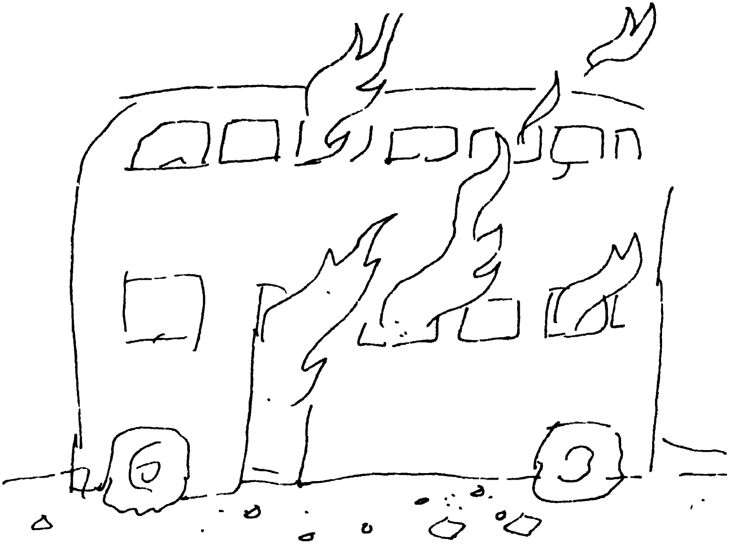


কর্তা কটিবস্ত্রটি মাত্র দু'হাতে পাকড়ে ধরে শোবার ঘরের কোণটিতে বসে আছেন। ঘূর্ণী ঝড় বইছে। এক টানে চলে গেছে বিছানার চাদর। আলনা উল্টে পড়ে আছে একপাশে। ছেলেমেয়েরা উদোম।

ধোলাই দু'রকমের। সাধারণ ধোলাই, আর রাগের ধোলাই, রাগের ধোলাই খুব একটা কাজের হয় না। রাগের কোনও কাজই তেমন সুবিধের হয় না। ধুম ধাড়াক্কা। রাগে একটা কাজই ভালো হয়—ভাঙচুর।

তখন দুর্বলও ভীষণ সবল হয়ে পড়েন। যেমন ট্যাকসিচালকের ওপর রেগে গিয়ে একজন দরজার হাতল ধরে অ্যায়সা টান মেরেছিলেন, হাতলটা খুলে চলে এসেছিল হাতে। বেতের মত লিকলিকে একজন মানুষ 'যাও' বলে তাঁর ব্যারেলের মতো বউকে অ্যায়সা ধাক্কা মেরেছিলেন, তিনি পড়ে গিয়ে এক মাস বিছানায়।

রাগ হল শক্তি। নদীর শক্তিকে বেঁধে যেমন বিদ্যুৎ, রাগকে পরিচালিত



করতে পারলে তেমনি কর্ম। ভাঙাটাও তো কাজ। একটা স্টেটবাস, কি একটা ট্রাম কত বিশাল! কিন্তু জনা চারেক মানুষ রেগে গেলে কত সহজে খণ্ড খণ্ড, লণ্ড ভণ্ড করে দিতে পারে।

রাগের প্রকাশটাকে কোনওরকমে উল্টে দিতে পারলে, ঘুরিয়ে দিতে পারলে কি কাণ্ডই না হত। রেগে গিয়ে সব আগাছা সাফ করে একটা সুন্দর বাগান তৈরি করে ফেললে। কি মশার ওপর রেগে গিয়ে কর্পোরেশান কর্তৃপক্ষ যেখানে যত নর্দমা আছে সব পরিষ্কার করিয়ে, তেল ছিটিয়ে এমন এক কাণ্ড করে ফেললে, আঃ, কি চমৎকার, সন্ধ্যেবেলা ঘরে ঘরে, কত্তা নাচে, গিন্নি নাচে, ছেলে নাচে, মেয়ে নাচে, এ দৃশ্য আর নেই। মশক শূন্য মধুর রাত। গড়াগগড় মশারির জালে মধ্যরাতের মানুষকে আর কাঁদতে হয় না—হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা।

বা মহামাত্যের গাড়ি গর্তে পড়ে এমন লাফিয়ে উঠল তিনি একেবারে রাগে

অগ্নিশর্মা। ডাকো তাঁকে, সেই শহররক্ষককে। ঠিকাদারদের ডাকো। চুরি আর চলবে না। রাস্তা চাই রাস্তা। সবাই মিলে রেগে গিয়ে এমন এক কাণ্ড করলেন, দেশবাসী অবাক—এ কি রে বাবা! জাতে ভারতীয় অথচ কাজে ইওরোপীয়। লয়াবয়া সাপের মতো মসৃণ সব রাজপথ দেশজুড়ে খেলছে। দশহাত যেতে বিশ বার লাফাতে হয় না। যে কোনও যানে ভ্রমণ টাট্টু-ভ্রমণ বলে মনে হয় না।

তা কিন্তু হয় না। রেগে গিয়ে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েন। দেশও ঘুমিয়ে পড়ছে। রাগতে রাগতে ক্লান্ত হয়ে মানুষ একসময় বলে, যাঃ, মরগে যা। আমার কি, বয়ে গেছে! রাজা, প্রজা, মাত্য, অমাত্য, কোটাল, নগরপাল, সকলেরই এক কথা—যাঃ মবগে যা। যেখানে যা হচ্ছে, যেমন হচ্ছে হয়ে যাক। আমার কাঁচকলা।

অনেকে রেগে গিয়ে গৃহত্যাগ করেন। গেট দিয়ে বেরিয়ে হন্ হন্ হাঁটা। কোথায় গন্তব্য। কি ভবিতব্য কিছুই জানা নেই। রাগে হাঁটা। গমগম করে এগিয়ে চলা। হয় তো এক সময় থমকে দাঁড়াতে হবে। ফিরতেও হয় তো হবে। কিন্তু রাগ। রাগী কখনও অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না।

তা, আইন রেগে গেছে। কেউ মানে না। আইন আর নেই। দেশত্যাগী। আদর্শ! তারও একই অবস্থা। শিক্ষা! রেগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগী, তা বেশ মজা! এতকাল কিছুই হল না দেখে দেশ থেকে দেশটাই বেরিয়ে চলে গেছে। থাকার মধ্যে আছে ধুমধাম।

জনৈক রাগী পিতা ছেলেদের ডেকে বলেছিলেন, 'কুলাঙ্গারের দল বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে খেয়োখেয়ি করে মরছিস। দেবো একদিন সব ভুষ্টিনাশ করে।' দামড়া ছেলেরা সতর্কবাণী শুনলে না। অবশেষে বৃদ্ধ একদিন রাগের তুঙ্গে উঠে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ধেই ধেই নাচ শুরু করলেন—'আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া কাল আমাদের দোল।'

সেই ন্যাড়াপোড়ার ধোঁয়া কি আমাদেব চোখে লাগছে!

ভাল্লাগে না

আজকাল কেন জানি না বেঁচে থাকার আর সেই মাদকতা নেই। সব সময় জীবনের সেতারে ঝালা চলেছে—ভাল্লাগে না। ভাল্লাগে না।

কেন লাগে না ?

সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারবে না। ভাল্লাগে না এক সংক্রামক ব্যাধি। বাপ বলছে ভাল্লাগে না। মায়ের প্রতিধ্বনি ভাল্লাগে না। সাত বছরের শিশু চোখে শেয়ালপণ্ডিতের চশমা। সেও গম্ভীর মুখে বলছে, ভাল্লাগে না। এ যেন যুগের ফ্যাশান। চুলে তেল নেই। পাগলা দাশুর মতো বাতাসে এলোমেলো উড়ছে। ফ্যাশান। জামার হাতা নেই। ফ্যাশান। পুরুষ, ছেলে, গলায় লকেট, হাতে বালা। ফ্যাশান। পায়ে হাই হিল, ফ্যাশান। টাটকা ছেড়ে ফ্রিজের মর্গ থেকে পশুর ডেডবডি বের করে খাওয়া ফ্যাশান।

উদাস মুখে, উড়ুউড়ু চুলে, ভাল লাগছে না বলার মধ্যে একটা আঁতলামোর ভাব আছে। বিশ্বের বিশাল বিশাল বুদ্ধিজীবীরা হতাশায় ভোগেন। আমিও ভুগি। অতএব আমিও বুদ্ধিজীবী। এই রকম একটা বাতাস বইছে ঠিকই, তবে সত্যিই আর ভাল লাগছে না।

শিশুর লাগছে না। বয়স্কদেরও লাগছে না।

কি করে লাগবে ? মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি শিশুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাক। বসবাস ফ্ল্যাটে। অথবা দু'কামরার খুপরিতে। যেদিকেই তাকাও দেয়াল। হয় সাদা। না হয় প্যাস্টেল। হালকা নীল। অথবা পিঙ্ক। এ দেয়ালে একটা ছবি। ও দেয়ালে ক্যালেণ্ডার। কোনও কোনও দেয়ালে আবার বকের সারি ওড়ে অথবা হাঁস। মাটি চেপ্টে তৈরি। চিড়ে চ্যাপ্টা 'গাগরী ভরণে যায়' সুন্দরী কোনও কোনও দেয়ালে আড় হয়ে থাকে। যাঁরা আবার সংস্কৃতি নিয়ে উস্তমখুস্তম, তাঁদের দেয়ালের একপাশে মাদুর সাঁটা থাকে। কান উঁচু বাঁকুড়ার ঘোড়ার চল হয়েছিল এক সময়। ঘরে ঘরে ঘোড়ার ঔদ্ধত্য আর তেমন চোখে পড়ে না। এখন মানুষের জীবনই এক একটি 'ওয়েলার' ঘোড়া। টগবগিয়ে ছুটে বেড়াতে হয় চারদিকে।

দেয়ালের রঙ কি আর মনে ধরে? মন বিবর্ণ।

জানালার বাইরে আকাশের হাতছানি নেই। সেখানেও সারসার দেয়াল। অহঙ্কারী বাড়ি আকাশে মাথা ঠুকছে। বারান্দার রেলিং-এ, জানলার গ্রিলে রাজ্যের কাপড়চোপড় ঝুলছে। ক'জনের ভাগ্যে ছাদের বিলাসিতা জোটে।

অ্যাডভেঞ্চার একটাই—রাস্তায় বেরিয়ে প্রাণ নিয়ে 'ওয়ান পিস' ফিরে আসা। পাসটাইম বা অবসর-বিনোদন হল ঝগড়া, খেয়োখেয়ি।

অফিসে সহকর্মীর সঙ্গে চিপটেন কেটে কথা। দলবাজি।

রাস্তায় পরস্পরে ধস্তাধস্তি।

বাজারে কাড়াকাড়ি।

সংসারে চুলোচুলি। ভায়ে ভায়ে। বোনে বোনে। ভাইবোনে। স্বামীস্ত্রী মুখোমুখি হলেই টেনিসের সিঙ্গলস। কথার সার্ভিস। রিটার্ন। প্লেসিং। স্ম্যাশ। এরই মাঝে বৃদ্ধা মালা জপছেন। বৃদ্ধ ভয়ে ভয়ে বেড়িয়ে ফিরছেন।

শহুরে পাখি বলতে কাক। সারাদিন খ্যাখ্যা করছে। দুএকটি কঙ্কালসার গাছে

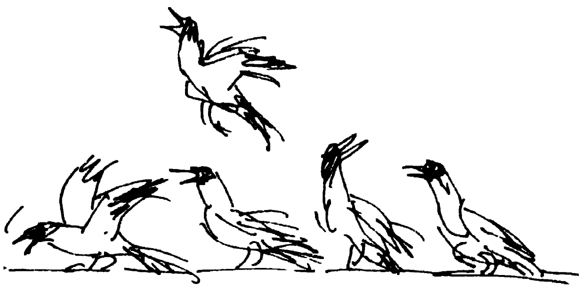


বসন্তের ফিকে সবুজের ছোঁয়া। মাথার পর নীল আকাশের ফ্রেম। দেখার উপায় নেই। ঘাড় উঁচু করতে হবে। ঘাড়ে ঘাড়ে স্পণ্ডিলাইটিস। সভ্যতার ব্যাধি। সব মানুষই সারমেয়। কারণ বড় ছোট সকলেই জীবিকার দাস। সেই অর্থে কেউ অ্যালসেসিয়ান, পেরিয়ার মাউণ্ট, সেণ্টবারনার্ড। কেউ নির্ভেজাল ভুলো। কোনও না কোনও পা কেউ না কেউ চাটছে। তা না হলে রুটি জুটবে না।

কোনও রকম নিরাপত্তা নেই।

যার বাড়ি আছে সে ভাড়া দিতে পারবে না। বিপদে পড়লে বাড়ি ভাড়া দিয়ে রোজগারের পথ বন্ধ। ভাড়া তো মিলবেই না, উলটে বাড়িটাই হয় তো বেদখল হয়ে যাবে। তার ওপর ট্যাক্স। অ্যায়সা ট্যাক্স ধার্য হবে ভিটেমাটি চাঁটি। বাঙালীর চিরকালের ধারণা বাড়ি হল সিকিউরিটি। সে ধারণা ভুল।

চাকরি সহজে মিলবে না। আর যদিও বা মেলে, নিচেব দিকে সেই 'বেড



অফ প্রোক্রাসটেস'। এই গ্রীক রসিকের একটি খাট ছিল। তিনি আবার ছিলেন অতিথিপরায়ণ। রোজ রাতে একজন না একজনকে পাকড়ে আনতেন। পানভোজনে আপ্যায়িত করে শুতে দিতেন খাটে। যিনি শুলেন, তিনি যদি খাটের মাপের চেয়ে বড় হতেন, সঙ্গে সঙ্গে কোপ মেরে বাড়তি অংশ কেটে ফেলা হত। আর মাপে ছোট হলে টেনে লম্বা করা হত।

নিচের দিকের চাকরির রোজগার হল সেই খাট। প্রয়োজন যত বড়ই হোক ছেঁটে ছোট করো। সারাজীবন পঙ্গুর জীবন। ওপরের দিকের চাকরির হ্যাঁপা অনেক। সামান্য এদিক ওদিক হলেই এশট্যাবলিশমেণ্ট মারবে লাথি।

এই বাতাবরণে শিশু ডিম খায়, ছানা খায়, কলা খায়, আপেল খায়, 'সিট অ্যাণ্ড ড্র' করে, আবৃত্তি করে, বইমেলায় ছোটে। শিশু হাসে না। মুখ দেখলে মনে হয়—গ্রেভ দার্শনিক।

পা মচকে গেলে, পায়ে গরম পুলটিস মেরে ফ্লানেল জড়িয়ে রাখা হয়। আমাদের মচকানো জীবনও সেইরকম সভ্যতার গরম পুলটিসে লেঙচে লেঙচে চলেছে। কোথাও আনন্দ নেই। মুক্তির সন্ধান নেই। আধুনিক সংগীতে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি চিৎকার। হিন্দি সিনেমার এমন একটা পোস্টার নেই, যে পোস্টারে তিনটের কম রিভলবার আছে। তিন দিকে তিনটে উঁচিয়ে আছে। মাঝখানে লাস্যময়ী নায়িকা নাচের জিলিপির প্যাঁচ মারছে।

এরই মাঝে যুবকরা ক্ষেপে গিয়ে কখনও প্যাণ্টের ঘের ইয়া ফাঁদালো করছে, কখনও চোঙা। মেয়েরা বিরক্ত হয়ে ব্লাউজের হাতা আর স্যাণ্ডো গেঞ্জির হাতা এক করে ফেলেছে। ধ্যাত তেরিকা। যায় যাক ভেসে যাক জীবন যৌবন ধন মান। চুলে ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছে। এরপরের স্টেজে মহাপ্রভু ছাঁট। পেছনে লাউয়ের বোঁটার মত এট্টুকু একটি চুটকি। তাই দেখে মডার্ন কবি লিখবেন :

চুল তার নেই আর ॥ আছে চুলোচুলি
লাউয়ের বোঁটাটি ধরে ॥ বিরহেতে মরি ॥

টাকা আর চাকা

সময়ে সরে আসতে হয়, নইলে দুঃখ বাড়ে। আপনজন সেই একজন যাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না। নির্ভর করবে কার ওপর? না নিজের ওপর। সুখ কি? কোনও অভাবের বোধ না থাকা। দুঃখের কারণ? মানুষের প্রত্যাশা।

দুটো পৃথিবী। চাকার পৃথিবী আর থাকার পৃথিবী।

চাকার পৃথিবী গড়গড় গড়িয়েই চলেছে। থামবে কোথায় কে জানে? পৃথিবীর সম্পদ বেড়েই চলেছে। ধনে, জনে, সম্পদে। আরও, আরও। টাকা আর চাকা প্রগতির সার কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :

মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ।...মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইঁহার প্রতিই আমাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইঁহার প্রতিমা নির্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইঁহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম প্রভৃতিতে ইঁহার সিংহাসন রচিত হয়। মনুষ্যগণ রাত্রিদিন ইঁহার ধ্যান করে এবং কিসে ইঁহার দর্শনপ্রাপ্ত হইবে, সেইজন্য সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়...

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে। যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে ার অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে। মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।

যুগ পাল্টেছে। বিজ্ঞান, যন্ত্রযান, বিদ্যা, মহাবিদ্যা সব মিলিয়ে জীবন উল্টেপাল্টে গেছে। গেলে কি হবে, ধন, দৌলত থাকে তো লোকে মানে, নয়

তো তুমি এক ফেকলু। সাধারণ মানুষ, 'লিট্‌ল ম্যান', 'কমান ম্যান', মধ্যবিত্ত, অর্থনীতির অবমূল্যায়নে যারা নিম্ন, নিম্নতর বিত্ত, তাদের সত্যিই কোনও ট্যাঁফোঁ চলে না। বিশ্বসভায় এমনিই ভারত দরিদ্র দেশ। তেমন কোনও সম্মান নেই। জনসাধারণ আরও দরিদ্র। এর মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা তো 'হ্যাগার্ড'। দুনম্বরী রাস্তায় রোজগারের মুরোদ নেই। আয় নেই। থাকার মধ্যে আছে এক ডায়েরি। পাতায় পাতায় কুটিকুটি হিসেব।

প্রয়োজনের শেষ নেই। লোভের জগতে প্রতিদিনই নতুন নতুন লোভ তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে সেই লোভ জলাতঙ্কের মতোই ছড়াচ্ছে। কাপড়, জামা, শাড়ি, গাড়ি, প্রসাধনী, ভোগ্যপণ্য। ভেতরটা লেলিহান হয়ে উঠছে। সেই এক দ্বীপ ছিল, যে দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় নাবিকরা নিজেদের বেঁধে



রাখত মাস্তুলের সঙ্গে। তা না হলে দ্বীপ থেকে ভেসে আসা মোহিনী সঙ্গীতের সুরে ছিটকে সমুদ্রের জলে এবং শেষ।

সেই 'সাইরেন কল এখন আমাদের সব সময়েই জীবনতরণী থেকে টেনে ফেলে দিতে চাইছে। নিজেকে মাস্তুলে সংযমের দড়ি দিয়ে হয়তো বেঁধে রাখা গেল, কিন্তু সঙ্গে আর যারা দুলকি চালে চলেছে তাদের সামলাবে কে?

এটা দাও, ওটা দাও, এই আন, সেই আন। আবদার রাখতে পার ভাল, না পারলেই মুখ তোলো হাঁড়ি। আচার আচরণ, স্বভাবচরিত্র সব পালটে যাবে। কে কত আপনার বোঝা যাবে তখনই।

প্রেমের গভীরতা,সম্পর্কের গভীরতা মাপবার জন্যে ডুবুরী নামাবার প্রয়োজন



নেই। শুধু একবার বলো, তেলের খরচ একটু কমাও। অত তেলানী ভালো নয়। কিম্বা বলো, তিন দিনে একটা গায়েমাখা সাবান, ভেবেছ কি ? অথবা এই তো গত মাসে প্যাণ্টজামা হল, তিনটে মাস রেহাই দাও না।

বাস্, মুখের মোলায়েম হাসি খসে গেল বুড়ো পাখির পালকের মতো। মুখের চেহারা হয়ে গেল ভীমরুলের মতো। বেরিয়ে এল কথার হুল। বিশ বছরের বিয়ে করা স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল শ্বশুর মহাশয়ের কন্যা। টাইটেল চেঞ্জ করে গেল। পুত্র, কন্যা হয়ে গেল স্বয়ম্ভু। যেন মটি ফুঁড়ে উঠেছে গেঁড়ের গাছের মতো। বাপ আবার কে। যে বাপ টাইম্‌লি মালমশলা সাপ্লাই দিতে পারে না, শুধু নাকে কাঁদে তাকে অ্যাযসা টাইট দে যেন বাপ্ বাপ্ করে পালায়।

মরার পর দিন-সাতেক বাড়ির লোকের মন একটু মেঘলা থাকবে। কোনও এক আপনজন চলে গেছে। তারপর যে কে সেই। হ্যা হ্যা। হা হা। বয় ফ্রেণ্ড আসছে। গার্ল ফ্রেণ্ড আসছে। শালা আসছে। শালী আসছে। মালাই আসছে। ক্ষীরকদম আসছে।

পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে জীবনের রেকর্ড থেকে পিন তুলে নাও। আর বেজ না। যৌবনের কথা তবু লোকে শোনে। প্রৌঢ়ের কথা 'ব্যাবলিং', যার বাংলা ব্যাজর ব্যাজর। বাইরে আমাদের কেউ কিছু বললে, ফোঁস করে উঠি। আঁতে লেগে যায়। আমায় অপমান করলে। অথচ বাড়িতে ? মুহুর্মুহু শুনতে হবে, 'চুপ করো। তুমি আর বেশি ব্যাজোর ব্যাজোর কোরো না।' 'সব ব্যাপারেই নাক গলানো চাই।' 'তুমি কিছু বোঝো না।'

ফিসফিসানি কানে আসবে, 'অ্যাঃ, বসে বসে খালি জ্ঞান দিচ্ছে।' 'বকছে, বকতে দে। কান দিসনি। ভীমরতি হয়েছে।'

কোটিপতি হলেও ওই সব কথাই বলবে। তবে জনান্তিকে। অতটা জোরে নয়। মুখে দেখন হাসি। অভিনয়। সে আর মন্দ কী। জগৎটাই তো অভিনয়। পয়সা ফেলেছি, ভাল নাটক, সুখের নাটক দেখেছি। পয়সা না থাকলে, খ্যানখেনে গলায় থার্ড ক্লাস অভিনয় দেখ। আর মরমে মরতে থাক।

নাড়িয়ে দাও

কী রে একটু নাড়িয়ে দিয়েছিস ?

কোনও বাড়িতে হঠাৎ এই রকম কথা কানে এলে কি মনে হবে ? কি মনে হওয়া উচিত ! মনে হতে পারে, উনুনে হয়তো খিচুড়ি বসানো হয়েছে তাই মা মেয়েকে বলছেন নেড়ে দিতে। তলা না ধরে যায়। ঘোল নাড়াবার কথাও বলতে পারেন।

তা নয় ! এ একটি ঘড়ির কথা। টাইম পিস। প্রথমে দু ঘণ্টা অন্তর অন্তর নাড়াতে হত। এখন এক ঘণ্টা অন্তর। একটা পারিবারিক দায়িত্ব। পরস্পর পরস্পরকে মনে করিয়ে দিতে হয়, হ্যাঁ রে নাড়িয়ে দিয়েছিস ? না নাড়ালেই বন্ধ হয়ে যাবে। বেশ চলছে কট কট শব্দে। হঠাৎ বন্ধ। বেশ নাড়িয়ে দাও, ঝাঁকিয়ে দাও, শুরু হবে চলা।

কোনও বাড়িতে একটা পেণ্ডুলামওলা ওয়ালক্লক ছিল। তারও ওই এক ব্যায়রাম। চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যাওয়া। দাওয়াইও জানা ছিল। পেণ্ডুলাম ধরে নিচের দিকে টেনে নাড়িয়ে দিলেই আবার চলতে শুরু করল। টানতে টানতে, টানতে টানতে একদিন হল কি, পেণ্ডুলামটাই ছিঁড়ে চলে এল।

সংসারে এই রকম সব মজার মজার জিনিস থাকলে ভালই লাগে। খেয়ালী মানুষ। খামখেয়ালী ঘড়ি। বেশ লাগে। তবু একটা কাজ পাওয়া যায়।

একবার খুব শখ হল, ভালো একটা ঘড়ির। এক স্মাগুদা একটা ঘড়ি এনে দিলেন। অটোমেটিক। ডে, ডেট। বেশ স্বাস্থ্যবান, তাগড়াই ঘড়ি। প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কাজেও ব্যবহার করা চলে। ছুঁড়ে মারলে কপাল কানা হবেই।

ওই ধরনের ঘড়ি পরার মত কব্জি এদেশের সাধারণ মানুষের নেই। পরামাত্রই মনে হয় হাতটা খুলে পড়ে যাবে। তবু বিদেশী ঘড়ি। কি তার বাহার ! ডায়ালে মাঝে মাঝে শরতের সাদা মেঘ ভেসে উঠছে। সেকেণ্ডের কাঁটা সাতপাকে ঘোরার মত সহস্র পাকে ঘুরেই চলেছে। কি জিনিস বানিয়েছে সায়েবরা। ফাটিয়ে দিয়েছে।

বাসে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা কটা বাজল ?'



'বারোটা পনের।'

'অ্যাঁ, সে কি মশাই! সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। পাখিরা সব কুলায় ফিরছে। এখন বারোটা পনের! দিন বারোটা না রাত বারোটা?'

'তাই তো! ঠিক বলেছেন! অত সব খেয়াল করিনি।' ঘড়ির এই একটাই ডিফেক্ট, এক একটা সময় দু'বার বাজে। রাত একটা হয় আবার দিন একটা হয়। সকাল দশটা আবার রাত দশটা। কাঁটা ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় আসবে। আকাশ দেখে বুঝতে হবে। পাতালে থাকলে হয়ে গেল। দিন রাতের বারোটা।

যাই হোক সেকেণ্ডের কাঁটা দেখে বুঝলুম, ঘড়ি অচল। চলছে না। স্যাগুদাকে পাকড়ালুম। 'কি মাল ছেড়েচো গুরু। মানসম্মান যায়।'

'কোন হাতে পরেছেন?'

'কেন বাঁ হাতে। পুরুষ মানুষ তো বাঁ হাতেই ঘড়ি পরে।'

'সে ঘড়ি, এ ঘড়ি নয়। এ হল অটোমেটিক ঘড়ি। হাত রেস্টে ফেলে রাখলেই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার গাড়ি আছে?'

'গাড়ি? একটা ঘড়ি কিনে দু রাত ঘুমোতে পারিনি। কি করে দেনা শোধ



হবে !'

'তাহলে তো বন্ধ হবেই। স্টিয়ারিং ধরা হাত চাই।'

'এখন উপায় !'

'ঘাবড়াবেন না। সব সময় হাত নেড়ে যান। জল ঝাড়ার মতো ঝাড়বেন।'

'সব সময় ?'

'হ্যাঁ, সব সময়। হাত ফেলে রাখবেন না। তাহলেই বন্ধ হয়ে যাবে। এর নাম হাতঘড়ি। ঠিক ঠিক হাতঘড়ি। দমঘড়ি নয়। হাত চলবে, ঘড়ি চলবে। অভ্যাস করুন। অভ্যাস হয়ে গেলে আর অসুবিধে হবে না।'

'সে কি মশাই ?'

'হ্যাঁ মশাই। আর সকালে স্ত্রীর ডান হাতে পরিয়ে রাখবেন। খুন্তি নাড়া আর স্টিয়ারিং ধরা প্রায় এক। এ ঘড়ি সহজে পাবেন না। অনেক কষ্টে এক পিস জোগাড় করেছি আপ কে লিয়ে।'

দিন কতক প্রাণের দায়ে হাতঝাড়া অভ্যাস করলুম। অনেক খেসারতও দিতে

হল। কাপ ছেটকাল। গেলাস ভাঙল। বাচ্চার চোখে আঙুলের খোঁচা লাগল। সহযাত্রীর চোখ থেকে চশমা ঠিকরে গেল। অফিসের বড় কর্তা বললেন, 'সোনপাঁপড়ির ব্যবসা ছিল না কি! সর্বক্ষণ হাত ঝাড়ছেন? না মুদ্রাদোষ? একজন সাইকোলজিস্ট দেখান।'

কি আর বলি, দুঃখের কথা। কবজিতে বাঁধা সাতশো টাকার ঘড়ি।

শেষে ফেডআপ। আর পারি না। কেউ সময় জিজ্ঞেস করলে, পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে সময় বলি। নিজের ঘড়ির ওপর আর বিশ্বাস নেই। বাইরে যেতে গিয়ে বার তিনেক ট্রেন ফেল।

অবশেষে সেই ঘড়ি গৃহিণীর হাতে। রান্নার ঘড়ি। খুন্তি নাড়লে সময় এগোয় নয় তো স্থির। উলবোনার তালে তালে চলে। সেলাই মেশিন চালাবার ছন্দে চলে। ভাবছি এক জোড়া তবলা কিনে দোব। ছেলেমেয়ের মাথায় তাল সাধে। অবশ্যই ঘড়ি পরা হাতে। প্রতিবাদ করলেই বলে, এ মার সে মার নয়। ঘড়ি চালাবার মার। তবু যদি তবলা সাধে, অবোধদের মাথা বাঁচবে। তা ছাড়া মহিলা তবলচি নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম্ হবে।

কেমন দৃশ্য! মাঝরাতে ওঁত পেতে বসে আছে কেউ। না কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই। সারাবাড়ি ঘুমে অচেতন। বারোটা বাজতে পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক, শূন্য, অ্যাকসান। কি অ্যাকসান! ইলেকট্রনিক ঘড়ির তারিখ এলোমেলো হয়ে গেছে। আলপিনের মাথা দিয়ে পুঁটকি 'নব' পটাপট টেপো। ওই সংশোধনটি রাত বারোটা ছাড়া হবে না। ওই সময়েই দিন বদলায়। মাসের তিরিশ, একত্রিশ, আঠাশের গ্যাঁড়াকল আছে। ডেটের গোলমাল হবেই।

মাঝরাতে ফিসফিস নারীকণ্ঠ—'নাড়িয়ে দিয়েছ?'

ঘুমচোখে উঠে গিয়ে নাড়াই, একবার, দু'বার, তিনবাব। ভারি সুদৃশ্য টেবিল ঘড়ি। ডিভানের মাথার কাছে টেবিলে সারারাত ক্যাচ ক্যাচ করে। রাত দুটোয় আমাকে জল খাওয়াই. আর তাকে খাওয়াই মাড়া। ঘড়িকে ঘাড় ধরে নাড়ান যায়। এত বড় দেশটাকে কে নাড়াবে! প্রায় অচল হয়ে আসছে যে॥

বলো বীর

•

বীরত্ব কাকে বলে ?

খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে শীর্ষে ওঠা !

না, ও বড় সেকেলে বীরত্ব। উঠে উঠে শেষ করে দিয়েছে। ওই অমন একটা এভারেস্ট, তার বারোটাও বাজিয়ে দিয়েছে। বছরে তিন চার বার চেপে বসে থাকছে। এরপর ওখানে রোল-কাউন্টার খুলে না বসে !

তা হলে বিমান থেকে প্যারাচ্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়া ?

নাঃ। উহাতেও কোনও বীরত্ব নাই। বড় বাড়ির ছাদ থেকে, ব্রিজ থেকে, মিনার মনুমেন্ট থেকে প্যারাচ্যুট ছাড়াই লাফ মেরে মেরে লাফের বীরত্ব ফিনিশ করে দিয়েছে।

যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ?

ধুস্। ও তো চাকরি। পেশাদার সৈনিককে কম্যাণ্ডার যা বলবে তাই শুনতে হবে। সেখানে এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা। অতএব যা থাকে বরাতে। চোখ কান বুজিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। যুদ্ধে আজকাল আর বীরত্ব নেই।

তাহলে, কেউ কাউকে ছুরি মারছে, সেই সময় ছুটে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা কি বীরত্ব ?

মোটেই না। ও হল সমাজবিরোধিতা। বিপ্লবে বাধা দেওয়া। যে ছুরি ধরেছে সে হয়তো বৈপ্লবিক কারণেই ধরেছে। অথবা শ্রেণীশত্রু খতম হচ্ছিল। বাধা দেওয়া মানে মহৎ একটা ব্রত পণ্ড করে দেওয়া। একে বীরত্ব বলে না। বলে অন্যের ব্যাপারে নোংরা নাক গলান। সেকালের উপন্যাসে ও-সব দেখা যেত। তখন ছিল বোকার দুনিয়া। মানুষ এখন কত চালাক, কত বুদ্ধিমান হয়েছে। শিক্ষার আলোকে কত সুসংস্কৃত হয়েছে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় কারা ? যারা অসভ্য তারা। যে যার চরকায় তেল দাও ভাই। অয়েল ইওর ওন মেশিন। ওকে বীরত্ব বলে না। বলে অসভ্যতা।

তাহলে রকে বসে একপাল ছেলে পথচারী একটি মেয়েকে দেহতত্ত্ব

শোনাচ্ছিল, একজন অসহ্য অসভ্যতা মনে করে তেড়ে গেল। তারপর খেড়িয়ে গেল। তারপর ছবি হয়ে ঝুলে পড়ল দেয়ালে? ইজ ইট বীরত্ব?'

নো। নেভার। একে বলে অন্যের ফাণ্ডামেন্টাল রাইট্স-এ হস্তক্ষেপ। স্বভাবে হস্তক্ষেপ। কবি কি গাহিয়াছেন—কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়। শেয়াল প্রহরে প্রহরে কা হুয়া গাইবে। বাঘ হালুম হালুম করবে। যার যা স্বভাব সে তাই করবে। এর পাশ দিয়েই আমাদের চলে যেতে হবে। ঝড়, শিলাবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মানুষ পথ চলে না। আজকাল একটা কথা খুব শোনা যায়—হোলিস্টিক ভিউ। সব মিলিয়ে গোটা একটা পৃথিবী। টাইট একটা ব্যাপার। সাপ, বাঘ, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, কুকুর, হনুমান, সব থাকবে। ছোবল মারার



চেষ্টা করবে, খাবলা মারার ধান্দা করবে, ফ্যাঁস করবে ফোঁস করবে, তার ভেতর দিয়েই যেতে হবে পাশ কাটিয়ে। টপকে টপকে।

তা হলে একে কি বীরত্ব বলব, স্ত্রীর ফিসফিসিনি শুনে ঘাড় ধরে বুড়ি মাকে ফুটপাথে ফেলে দিলুম। তারপর দুম করে দরজা বন্ধ করতে করতে বললুম, 'গুলু ঘোষ' কোনও অন্যায় টরালেট করেনি। করবে না। সে ফাদারই হোক আর মাদারই হোক।'

'ওটা টরালেট নয় টলারেট।'

'ওই হল আর কি। রাগের সময় জ্ঞান থাকে না।'

'হ্যাঁ এটা বীরত্ব। প্রথম শ্রেণীর বীরত্ব। গর্ভধারিণী মাকে এক কথায় বেড়ালের মতো ফুটপাথে ফেলে দিয়ে আসা। এ একমাত্র গেস্টাপোদের দ্বারাই সম্ভব, আর সম্ভব আমাদের মত বীরপুঙ্গবদের দ্বারা।'

'আচ্ছা এটাও কি বীরত্ব ? রাত্রির মধ্যযামে স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে ওঠ-বোস করানো ?'

'অবশ্যই। অবশ্যই। এবম্বিধ বীরত্বে বাঙালীর কোনও জুড়ি নেই। যুগ যুগ ধরে অবলা নারী নির্যাতন আমাদের ধর্ম ; কিন্তু মানিক, যেদিন পাল্টা ঝাড় খাবে সেদিন বুঝবে ঠেলা। আর সেদিন এসে গেছে। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ-নন্দাই



অ্যাণ্ড কোং লন মোয়ার আর রোড রোলার চালাবে আর পুড়ে মরবে গৃহবধূ এই সব ইয়ারকি আর বেশিদিন চলবে না।

প্রগতির শেষ সীমায় আমরা পেণ্ডান্টের মতো দুলছি তো। সবই হয়ে গেছে। নিউ ইয়র্কের মত শহর। কি শোভা! পাতাল রেল পেট ফুটো করে চলেছে। শিক্ষায়দীক্ষায় একেবারে বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। পোশাক আশাক! পাকা ইয়াঙ্কি। 'স্টোনওয়াশ' পরে ছেলেও ঘুরছে, মেয়েও ঘুরছে। স্ত্রী বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বামীকে ডাকছে—শোন ও সিধু। লজেঞ্চুসের মত মারুতি গাড়ি বেরিয়েছে। সুশাসন আর সাংঘাতিক পরিকল্পনায় আমাদের ঘরে ঘরে আলো, আর উঠতে বসতে মালপোয়া। মায়ে পোয়ে মালপোয়া। ধুরন্ধর ব্যবস্থায় 'স্ট্যাণ্ডার্ড অভ লিভিং' কি হাই হয়েছে রে ভাই। বাসের ছাদে ছাড়া ওঠার জায়গা নেই। 'টপ' অবস্থা। বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। চড়াবার দরকারও নেই। 'ডগে'র সংখ্যা খুব বেড়েছে। আর হট হয়ে আছে সব সময়। আমেরিকায় ওরা হটডগ কামড়ায়', এখানে হট ডগে আমাদের কামড়ায়। ওই একই ব্যাপার। সামান্য উনিশ বিশ।

একটা জিনিসের খুব অভাব ছিল। যে কারণে দেশটা বিলেত হয়েও হচ্ছিল না। যাক বাবা সে অভাব পূর্ণ হল। জয় বিরিঞ্চীবাবার জয়। মোড়ে মোড়ে অফিসপাড়ার কোণে কোণে 'বিয়ার পাব'। চালাও পানসি। অফিসে তো এমনিই ড্যাংগুলি ছিল। চেয়ারে চেয়ারে শূন্য কায়া, আছি হে আছি ভায়া। মাসমাইনেটি নিত্য দুপুরে বিয়ারায় নমঃ। গেরস্ত চোষ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। নিট লাভ ভুঁড়ি। আর উত্তরপুরুষের লাভ দেনা। আর হাতে গরম পাওনা, টলটলে বীর ডিক্যান্টারের মতো গৃহে ফিরবেন। প্রথামত আস্ফালন। অতঃপর স্ত্রীধনকে ছাতপেটাই। বিয়ারের বীরত্ব এখন 'বেয়ার' করতে পারলে হয়।

তবে শ্রেষ্ঠ বীরত্ব হল—রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প করা আর হর্ন দিলে না সরা। গুরু বলেছেন—চেলা, হরেন শুনে সরবি না। ভরপুক। তখনই সরবি যখন গান গেয়ে বলবে—পথ ছাড়ো ওগো শ্যাম, মিনতি রাখো॥

গুরুপাক লঘুপাক

এ যেন পাঞ্জাবী রেস্তোরাঁ। সবই গুরুপাক। ঝালঝাল, লাল লাল। তন্দুরী। মসল্লম। রেজালা। রোগনজুস। ঝোলভাতের কোনও কারবার নেই।

আগে নাটকে ছিল ক্যাবারে। এখন একেবারে তিন ক'এর খেলা। ক্যারাটে, ক্যাবারে, কুংফু। নাও ঠ্যালা সামলাও। কী সিনেমা, কী নাটক, কোথাও একটা সুস্থ সুন্দর কাহিনী পাওয়া যাবে না।

আচ্ছা বেশ, প্রেম ছাড়া জীবন হয় না। ভালো কথা। যুগ পাল্টেছে। নারী-স্বাধীনতার যুগ। ছেলেতে মেয়েতে দেখাদেখি হবে। হয় মিলন। না হয় বিরহ। ও ব্বাবা, কোথা থেকে ছোরাছুরি, বোম, বন্দুক আসে!

পেটা কড়াইয়ের মতো, পেটা কাহিনী। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। গান, নাচ। পাকাপাকা কথা। বেশ। হচ্চে হোক। তারপর বিবাহ, সংসার, পুত্র-কন্যা মৃত্যু। না, তা হবে না। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ স্থান পাবে না নাটকে, উপন্যাসে, সিনেমায়। আজকাল একটা কথা চালু হয়েছে—পাবলিক খাবে না। পাবলিককে খাওয়াবার আলাদা ফর্মূলা আছে। আগে একটা ভিলেনেই হয়ে যেত এখন গোটা দুই চাই।

শুনেছি ধর্মের পথ দুস্তর। প্রেমের পথ যে কি সাংঘাতিক, সে জানেন বোম্বে ছবির হিরো, হিরোইন। বাধা ছাড়া এক পা এগনো যাবে না। কোথা থেকে ঢ্যালা ঢ্যালা চোখ বিকট চেহারার এক ভিলেন এসে হাজির হবে। আদা-জল খেয়ে লেগে যাবে। নায়িকা তটস্থ। নায়কের ঘুম নেই। পৃথিবীতে আর যেন কোনও কাজ নেই। গোটা কতক দামড়া চকরাবকরা জামা পরে একটা মেয়ের পেছনে ছুটছে। এ বলে 'আ যা'। ও বলে 'আ যা'। দেশে কল নেই কারখানা নেই, উৎপাদন নেই, চাষবাস নেই, লেখাপড়া নেই, ঘরকন্না নেই, সুখ দুঃখ নেই, চাকরিবাকরি নেই। আছে প্রেম। প্রভাতে উঠেই মারো সিটি। বেরিয়ে এল আপেলমুখো নায়িকা। ছুটলো গাড়ি। গাছ চাই, ঝরনা চাই, পাহাড় চাই, সবুজ ঘাস চাই। হুড়হুড় গান। ধিতিং ধিতিং নাচ। অত নাচেরই বা কি আছে। বাস্তবে আমরা কি মাসের পর মাস নেচে নেচে, গেয়ে গেয়ে আমাদের হবু স্ত্রীকে

প্রেমে একেবারে জরজর করে দিয়েছিলুম ? রসে পড়া আরসোলার মত। কটা ভিলেন আমাদের তাড়া করেছিল বড় রাস্তায় ! ছোটখাটো সিটি, টুকটাক মন্তব্য, গুরুজনের তিরস্কার কখনও কখনও জুটেছে। তবে কখনই কোনও গোদা ভিলেন, তার সঙ্গী স্যাঙাত নিয়ে, বোমা, রিভলবার উঁচিয়ে তাড়া করে কোনও গুদাম ঘরে ঢোকায়নি। ঢিসুম ঢিসুম ঘুসি ! ড্রাম ওল্টাচ্ছে। ভাঙা বোতল নিয়ে তেড়ে আসছে। পাকানো সিঁড়ি বেয়ে চোদ্দতলার ছাদে। কার্নিস ধরে আমি ঝুলছি, আমার ঠ্যাং ধরে ঝুলছে আমার স্ত্রী মাধবী। আর আমার বন্ধু গদাই ভিলেন হয়ে হাতের আঙুলে বুটের চাপ মারছে। এমন করে বিয়ে করার চেয়ে আইবুড়ো থাকা ভালো।

বাস্তবে যা ঘটে তার মধ্যেও ড্রামা আছে। সে ড্রামা অন্যরকম। যেহেতু পাবলিক খাবে না, সেই হেতু ভীষণ ভীষণ সব কাণ্ড ঘটাতে হবেই। সিনেমার ধরনধারণ বিচার করলে জীবনের যে নকশা বেরিয়ে আসে তা বাস্তব জীবন থেকে দূরে, বহুদূরে। আদৌ বাস্তবই নয়। কল্পনার মুর্গমসল্লম। তেল



ব্যাড়বেড়ে। পেঁয়াজ, রসুন চটকানো। দু যুগ আগে ছিল, একটি পরিবার, দু ভাই। বড় ভাই আর বড় বউ, ভোলে ভালে, দেবতুল্য। দুই আর দুই-এ চার, এইটুকুও বুঝতে অসুবিধে হয়। বড় ভাইয়ের কিছুই মনে থাকে না। বড় বউ সংসার মাথায় করে রাখে। পরের ভাই যত না দুঁদে তার চেয়ে কুচুটে তার বউ। হাড়ে একেবারে দুব্বো গজিয়ে ছেড়ে দেয়। নাটক হল, সংসার যৌথ থাকে কি যায়। হাঁড়ি আলাদা হয় আর কি! বড় বউ রোজ রাতে শোবার ঘরে সদাশিব স্বামীর কাছে ফ্যাঁসফোঁস কাঁদেন। কান্নাঁর কারণ ছোট আমাকে বুঝলে না। দেবরকে প্রায় মাতৃস্নেহে মানুষ করলেন, তার এই আচরণ ' ভিলেন ছোট ভাইয়ের বড়লোক শ্বশুর। তার উস্কানিতে আধুনিকা ছোট বউ বাঁকছে। আর যৌথ পরিবারে ফাটল ধরছে। বড় ভাই থেকে থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে তোতলাচ্ছেন—এ কি করছিস বিনু' ! ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড। ডিভাইডেড উই ফল।

সে যুগের পাবলিক খুব খেয়েছিল এই কাহিনী।



·যুগ পাল্টাল। বিজ্ঞান এল। সায়েবরা যাবার পর আমরা আরও সায়েব হয়ে গেলুম। চাক না চাক সেক্‌স দিয়ে, ভায়োলেন্‌স দিয়ে মসল্লম ব্যাপার স্যাপার পরিবেশন করতে হবে। ধারণা, পাবলিক তা না হলে খাবে না। সেন্‌সারোচিত সেক্‌স, ভেতো ফাইটিং, বেতো গান আর নো-কাহিনী। দাও খালাস করে। একে বলে কপালে সিনেমা। পাবলিক খায় ভালো, না খায় গেল টাকা কর্পোরেশানের। এখন তো দেশ জুড়ে গৌরী সেনের খেল চলেছে।

নাটকও শেষ হয়ে গেছে। জোতদার মারো। অট্ট হাস! আর ফ্রিজ হয়ে যাও। এই ফ্রিজের ঠ্যালায় নাটক শেষ! কথায় কথায় ফ্রিজ। নিটোল সুন্দর গল্প আধুনিকতায় অচল। শাড়ি ধরে টানো। মিচকে পটাশের মত হাস। আর শেষ দৃশ্যে আড়ং ধোলাই খেয়ে মরো।

কি যন্ত্রণায় যে পড়া গেছে! সিনেমা আর নাটকের বাস্তবে, বাপ অ্যাজমায় হাঁপাচ্ছে। বোন চাকরি করতে গিয়ে ফোকলা মালিকের 'অ্যাপেটাইজার' হচ্ছে। বেকার ভাই চিবিয়ে চিবিয়ে বিপ্লবের কথা বলছে। ক্ষয়া ক্ষয়া চেহারার মা থেকে থেকে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। শেষে বেকার ভাই শেষ দৃশ্যে হাঁড়িকুঁড়ি গেলাসফেলাস ভেঙে হাঁটু গেড়ে মুঠো হাত আকাশে তুলে ফ্রিজ।

কি যে করা যায়। নাট্যশালার বাইরে ধোপদুরস্ত জগৎ। যাঁরা দেখছেন, যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের প্রত্যেকের জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। নাটকের সঙ্গে মেলে না। পার্কস্ট্রিটের বারে মদের ফোয়ারা। জেলায় ব্লাডারে ব্লাডারে চোলাই। সিল্কের শাড়ি। দামী ট্রাউজার। ইংলিশ মিডিয়াম। লিভ ট্রেভেল্‌সে বিদেশ ভ্রমণ। আর গামছা কাঁধে অপরিচ্ছন্ন মানুষ ঘরে ঢুকে খাবার টেবিলে সহভোজনে বসতে চাইলে মাথায় বজ্রাঘাত।

সেই মানুষটি যদি বলে, বন্ধু একটু আগেই যে তুমি আমার ভূমিকায় অভিনয় করে এলে?

উত্তর: সে তো 'ড্রেসারের' দেওয়া ডিস-ইনফেকটেড পোশাকে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চে। বাস্তাবে তোমার আর আমার মধ্যে ব্যবধান যোজন তিনেক দূর॥

কর্মা আর অকর্মা

মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কর্মী, সমালোচক আর উদাসীন। কর্মী যাঁরা তাঁরা হেঁপেদুপে কাজ করে চলেন। লিখছেন, পড়ছেন, নাচছেন, গাইছেন, কলকারখানা বসাচ্ছেন, সমাজসেবা করছেন। কর্মতৎপরতার শেষ নেই।

উদাসীন যাঁরা, তাঁরা কোনও কিছুর তোয়াক্কা করেন না। কাজ করলেও হয়, না করলেও হয়। দেশ এগলো না পেছলো, মানুষ মরল না বাঁচল, জনডিস, হেপাটাইটিস, এন্টারাইটিস মহামারীর আকারে ছড়াল কি ছড়াল না, এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে উৎসাহ নেই বললেই চলে। যা হচ্ছে হোক। বেঁচে থাকলে থাকবো। মরলে মরব। দূর ঘোড়ার ডিমের জীবন।

'অমুকে পাঁচতলা বাড়ি বানিয়ে ফেলল। কি করছিস কি! ওঠ। অন্তত ছটাকখানেক জমি কিনে একটা পায়রার খোপ বানা।'

'ধুস্, কি হবে কি? যার পাঁচ, যার সাত, যার মাঠ, গাছতলা, সকলেরই ওই এক পরমাগতি। চলে আয়, তুই ক্যানসারে আয়, তুই আলসারে আয়, তুই ভোজালি খেয়ে আয়। অথবা ওই ভদ্রলোকের মতো, বউ মেরে, দশতলা থেকে উড়ে চলে আয়। যে জায়গা চিরকালের নয়, সে জায়গায় গেঁড়ে বসতে নেই। ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।'

বেশ হালকা, উড়ু উড়ু মেজাজে, ফুরফুর পৃথিবী বেড়িয়ে যাও। দিল্লি দেখো। বোম্বাই দেখো। টিকিটটি কেটে সরে পড়।

অমুকে খুব করিতকর্মা। বাড়ি করেছে। গাড়ি করেছে। হ্যান করেছে, ত্যান করেছে। এই সব বলে নাচিয়ে দেবার লোকের অভাব নেই। আর নেচে উঠলেই হয়ে গেল। জীবনটাই নষ্ট। সব অদৃশ্য। শুধু টাকা।

এক একজন মানুষের কি অমানুষিক কষ্ট! ভোর থেকে মাঝরাত, কত কি যে করেন তাঁরা! এঁদের আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরি থাকে। সকাল আটটায় ঘুঘুডাঙ্গায় সান্যালবাবুর সঙ্গে দেখা করেই ছুটছেন সাঁতরাগাছিতে। সত্যেনবাবুর সঙ্গে সাড়ে দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। পেরেক থেকে পেটিকোট, ছাতা থেকে ছাতু, অ্যানি ড্যাম থিং, অর্ডার ধরো আর সাপ্লাই করো। বেশ মোটা ডিমভরা



কইয়ের মতো একটা ডায়েরি সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। স্ত্রীর মতো। তার পাতায় পাতায় কুটি কুটি হিসেব।

দেনাপাওনা, হিসেব-নিকেশে জর্জরিত হয়ে, ছোট ব্যবসা থেকে বড় ব্যবসা। ফলাও ব্যবসা। জমি, বাড়ি, গাড়ি। প্যাঁক প্যাঁক ছেলে-মেয়ে। ধনগর্বী গৃহিণী। চালবেচালের কথা। সুদিন সুধীনকে শেষ করে দিলে। দু চোখের নিচে পাউচ। ধামার মত পেট। ভূত দেখার মতো চুল। 'দাও, দাও, দাও আমায় ভুলতে দাও ॥ রাত নামলে গেলাস দাও ॥'

যে কোন রেসপেকটেব্‌ল একটি বারের নির্দিষ্ট একটি কোণ। অনুরূপ কয়েকজন ভাগ্যতাড়িত মানুষ। মদের দোকানের কোণ যেমন হয়। মেশিনের ঠাণ্ডা। মৃদু আলো। দর্শনীয়, তোমার মুখ, আমার মুখ, আর গেলাস। শ্রবণীয়?

কাল মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লি যাচ্ছি। দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে। কৃষ্ণমূর্তি বড় ঘোড়েল লোক। ব্যাটা গিলেও গিলছে না।

সামনের সপ্তাহে দুর্গাপুর যাচ্ছ না কি!

কাল আমাকে আবার ভাইজাগ যেতে হবে।

খুব আটকে গেলাম রে ভাই। কিছুতেই ব্যাঙ্কের স্যাংশানটা পাচ্ছি না।



প্যাটেল আসছে। ব্যাটার আবার দুটো 'ম'ই চাই। এই বয়েসে জ্যান্ত ম ধরা আর কি পোষায় রে ভাই।

রাত বাড়ে। পেটে মাল বাড়ে। চোখে ঘোর লাগে। শ্বাস দীর্ঘ হয়। অবশেষে গাড়ির পেছনের আসনে করিতকর্মা কাত। প্রেসার। সুগার। হার্ট। আলসার। অ্যাসিড। আর ঠিক সেই সময় অকরিতকর্মা গ্রামের মেলায় ঘুরছে। এখানে কড়ায় বালির বিছানায় চীনেবাদাম মুচমুচে হচ্ছে। জিলিপির প্যাঁচ মারছে হালুইকর। হলুদ শাড়ি পরা শ্যামলা মেয়ের গোল হাতে কাঁচের চুড়ির কসরত চলেছে। নাগরদোলা ক্যাঁচকোঁচ করছে।

রাধামাধবের মন্দিরে আরতি হচ্ছে মহাসমারোহে। একটু পরেই শুরু হয়ে যাবে নামগান। কাশীর মাকে কেউ দেখে না। মন্দিরের অন্ধকারে ছানিকাটা চশমা পরে বসে আছে আপন মনে। আগে খুব গাল দিত। ছেলেকে। ছেলের বউকে। জ্ঞাত-গুষ্টিকে। এখন চুপচাপ। বুঝে গেছে। এই হল পৃথিবী। কারুর ক্ষীরে লুচির খোসা। কারুর শাকে বালি।

মিঃ দত্ত ছাদে সুইমিংপুল দিয়েছেন। নিজের সময় কোথায়। জলকেলী করবেন! তা ছাড়া অ্যাজমা আছে। মেয়ে বয় ফ্রেণ্ড নিয়ে বোম্বে অভ্যাস

করছে। ছেলে ছোঁক ছোঁক করছে ছবিকে নামাবেই।

বহুদূরে জলের কিনারায় সেই অকরিতকর্মা বসে আছে। দত্তম্যানসান চোখে পড়ছে। ছটা টিভি অ্যান্টেনা জড়াজড়ি করে আছে। অকরিতকর্মা জলের দিকে তাকিয়ে আছে। সরু একটা ঘাসের ডগা, তুলির রেখার মত ঢেউয়ের তরঙ্গে বড় আপনজনের মত কাঁপছে। ছোট ছোট জলচর পোকা জলের বুকে নখের আঁচড় টেনে টেনে দৌড়োদৌড়ি করছে। অকরিতকর্মা জানে—সব ধুস্। মিত্তিরও খুব উঠেছিল। খুব বোলবোলা। কথা প্রায় বলতই না। গলা খ্যাঁকারিতে কাজ সারত। শেষটায় পৃথিবীর কোনও কোনও অঞ্চলের ছ'মাস দিন ছ'মাস রাতের মত, বাবুর অর্ধদিবস সাদা চোখ, অর্ধদিবস লাল চোখ। তারপর ঝাণ্ডা, ডাণ্ডা, চলবে না, নড়বে না। সব লাটে। কারখানায় তালা। মিত্তির নামতে নামতে, যখন মাটির কাছাকাছি নেমে এল, তখন সে প্রকৃতই উঁচু মানুষ হল। সকলের সঙ্গে ভাই বলে কথা বলত। স্ত্রীর শেষ গয়না বেচে বন্ধুর বউয়ের অসুখ সারাল। যদি জিজ্ঞেস করা হত—মিত্তির আর উঠবে ওপরে! ভয় পেয়ে যেত।

তার মানে, ওপরে ওঠা হল নিচে নামা। একেবারে মিশে যাওয়া।

করিতকর্মা, অকরিতকর্মা ছাড়াও সুখী হলেন তাঁরা যাঁরা সমালোচক। সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। সজারুর মত। ধরতে গেলেই খোঁচা কাঁটা। শুধু মাথা নেড়ে যাওয়া না না না, ঠিক হল না। না না করাটা মস্ত বড় এক সাধনা। নেতি নেতি করে ইতি মানে চিতায় চিৎ। এক সমালোচক। কোনও রান্নাতেই সন্তুষ্ট নন। একজন তরিবাদি করে মাংস রেঁধে খাওয়ালেন। নিখুঁত রান্না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি কেমন হয়েছে? ভালো না?

সমালোচক বললেন, ভালো, তবে আর একটু বেশি নুন হলেই মাটি হয়ে যেত।

খুঁত নিয়ে খুঁতখুঁত অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। এক সমালোচক অবশেষে বললেন—পৃথিবীর বলবেয়ারিং-এই খুঁত। পৃথিবী টাল খেয়ে চলছে। ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হলে ডাইনামিকসটা শিখিয়ে দোব।

বাঁদর নাচ (লে হালুয়া)

মেয়েদের নিয়ে সংসার করা। বাঁদর নাচ। আবার মজা এই, শাস্ত্র বলেছেন, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তেনারা না থাকলে সংসারও নেই। কাঁথা বগলে ঘুরে বেড়াও। আবার কি মজা, তীর্থস্থানে, ধর্মশালায় কোনও পুরুষ একা স্থান চাইলে পাওয়া মুশকিল। সন্দেহের চোখে দেখবে। ব্যাটার কি মতলব কে জানে। ভাগিয়ে দেবে। সস্ত্রীক যাও, আহা! হরপার্বতী এলেন। প্যান্টশার্ট পরা মহাদেব, সঙ্গে মেক-আপ করা গৌরী।

কিন্তু মেয়েরা যে কি নাচন নাচাতে পারে। অমন শ্রীরামচন্দ্র, অমন সুযোগ্য লক্ষ্মণ ভ্রাতা, সীতা দেবী এমন কাণ্ড করলেন। জানেন সোনার হরিণ হয় না। রাবণ মায়া ছেড়েছেন। আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই। রামচন্দ্র, তিনিও জানেন হরিণ সোনার হতে পারে না, তবু স্ত্রীর কথায় নেচে উঠলেন। ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মণ ভাইও দাদার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। ব্যাস্ হয়ে গেল সীতাহরণ। তারপর কত কাঠ খড় পুড়িয়ে, বানর সেনা নিয়ে লঙ্কায় গিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করে, যদিও জানকী মাঈকে উদ্ধার করে আনলেন, হয়ে গেল পাতালপ্রবেশ।

রাত দশটার সময় হুকুম হল। কি হুকুম? দই নিয়ে এসো। দই কি হবে? দম্বল। দশটার সময় দম্বল! অমাবস্যার রাত। লোডশেডিং। আকাশে মেঘের তর্জন গর্জন। ছোট দোকানে। দশটার সময় দই থাকে মশাই? লগনসার বাজার। তার ওপর পেটরোগা বাঙালী। দইয়ের কি ডিম্যাণ্ড! সাতটার মধ্যেই হাঁড়ি চাঁছপোঁছ। তিনচারটে দোকান ঘুরে, বৃষ্টিতে আধ ভেজা হয়ে ফেল করা ছাত্রের মতো বাড়ি ফিরে এস।

মেয়েদের হুকুম তামিল করে বাড়ি ফিরতে পারলে, নিজেকে হিরো হিরো কত্তা, কত্তা, বীর বীর মনে হয়। বোলচাল মারা যায়। মাথা উঁচু করে বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়ান যায়। তা না হলে যত বীর পুরুষই হোক, কেমন যেন চাকর চাকর, চোর চোব, দীন হীন মনে হয়। ভাষা পর্যন্ত পালটে যায়।

'পেলুম নি গো 'দিদিমণি।'

দিদিমণির চোখে তখন কি দৃষ্টি ? তিরস্কার ভর্ৎসনা মেশানো তড়কা ধরনের একটা চাহনি।

'পেলে না ?'

'আজ্ঞে না।'

'কোথায়, কোথায় গিয়েছিলে ?'

'ঘোষ মশাই, বোস মশাই, দত্ত মশাই কেবল বেয়াইমশাইটাই বাকি আছে।'

'এখন কি হবে ?'

'বারোটা বাজল, আলো নিবিয়ে দুর্গা বলে শুয়ে পড়া হবে।'

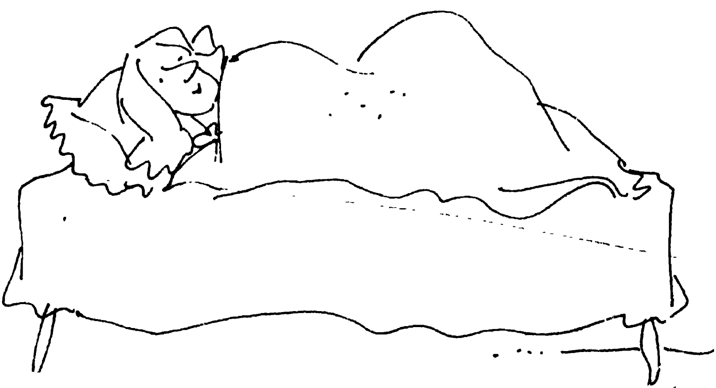
'আর দুধ ? এই এতটা দুধ এখন কি হবে ?'

রাত বারোটা। সামনে এক ডেকচি দুধ। এপাশে ঘাড় চুলকোচ্ছেন কত্তা, ওপাশে কোমরে দু'হাত রেখে কুচিপুডি নাচের ভঙ্গিতে গিন্নি। শেষে টেন কম্যাণ্ডমেন্টস-এর মত, টেন প্লাস ওয়ান কম্যাণ্ড,

'খেয়ে নাও।'

'খেয়ে নাও !'

'হ্যাঁ খাবে। সারা রাত বসে বসে খাবে। পয়সার জিনিস নষ্ট হবে ? দুধের কত টাকা কিলো জানো ? সংসার তো আর করতে হয় না !'



'তা ঠিক। সংসার তো আমি করছি না, করছ তুমি।'

'তুমি তো মাস গেলে কয়েকটা টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে সারা মাস সিটি দিয়ে বেড়াবে। নাও বসে বসে খাও।'

'দুধের কিলো তো শুনলুম। আমার কিলো জানো? খেয়ে টেঁসে গেলে আর পাবে? দুধ পাবে। প্যাকেট প্যাকেট, বোতল বোতল। আমি কিন্তু এক পিসই তৈরি হয়েছি। গেলে দ্বিতীয় জোড়া আর মিলবে না।'

কথাটা তেমন যেন ধরল না মনে। এই এক মজা। সংসারে তেল, চাল, দুধ, চিনির দাম কত্তাদের দামের চেয়ে ঢের বেশি। আমরা সব বিনাপয়সার মাল। ওই, 'দাম জানো?' প্রশ্নটির মধ্যে আমরা পড়ি না। আমাদের তো কিনতে হয় না। মুফতে পাওয়া যায়। দে একটা টোপর চাপিয়ে। দশ পয়সার লাল একফালি সুতোয় এক নুটি দুব্বো বেঁধে পরিয়ে দে কবজিতে। 'যদিদং হৃদয়ং'—আস্ত একটা বলদ বাঁধা পড়ে গেল মধ্যবিত্তের গোয়ালে। সে একাধারে



বাজার সরকার, ঝাড়ুদার, ভিস্তিওয়ালা, চৌকিদার, তলপিদার। হোয়াটনট। টু ইন ওয়ান, থ্রি ইন ওয়ান, কত কি বেরিয়েছে! এমন 'মেনি ইন ওয়ান' চানাচুর মার্কা জিনিস জাপানও বের করতে পারবে না। মাঝে মধ্যে রেগে গিয়েও লাভ নেই। ঝাল চানাচুর ওনারা আবার পছন্দ করেন। 'ভেরি রেলিশিং!' সরষে বাটা আর আস্ত কাঁচা লঙ্কা সমেত চুনো মাছের মতো। হু হা-তেও আনন্দ।

রাত দুটোর সময় ঘুম ভেঙে গেল। 'এই শুনছ, শুনছ?'

'বলো কি হল? ভূত এসেছে? জানলার বাইরে থেকে ইশারা করেছে, কি অসভ্য মা গো!'

'ধ্যাৎ তোমার মতো ভূত থাকতে আবার ভূত আসবে কি?'

'তাহলে?'

'চা এনেছ, চা?'

'রাত আড়াইটের সময় চায়ের কথা মনে পড়ল?'

'তোমার আর কি? সংসার তো আমাকেই করতে হয়। এনেছ চা?'

'না, ভুলে মেরে দিয়েছি।'

'কাল সকালে গরম জল খাবে। আমার কি? সব ব্যাপারে ভেবে ভেবে আমার হাড় মাস কালি কালি হয়ে গেল।'

কথা কটি খালাস করে মুহূর্তে গভীর নিদ্রায়।

মহাজগতে মধ্যরাতের পৃথিবী পাক খাচ্ছে। উপগ্রহ অনুরাধার যন্ত্র কাজ করছে না! স্পেস স্টেশানে বিজ্ঞানীদের চোখে ঘুম নেই। টেলিস্কোপে জোড়া জোড়া চোখ হ্যালি আসছে ন্যাজ ফুলিয়ে। গবেষণাগারে মানুষ লড়ছে ক্যানসারের সঙ্গে। 'মিসাইল' পাহারা দিচ্ছে সতর্ক প্রহরী। লে, লাদাখ সীমান্তে বরফে জেগে আছে জওয়ান। আর বারো বাই বারো ঘরে নাইলেক্সের মশারির মধ্যে রাতজাগা প্যাঁচার মত কত্তা—যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেছে: চা আনা হয়নি। লে হালুয়া।

নাড়ু কিনে খাই

ঘোর কেটে যাবার পর সব মানুষই ভাবতে বসে।

সংসার করে কি লাভ হল ! জমা খরচের হিসেব আর কি ! তেল তো অনেক পুড়ল, রাধা কি নাচল ?

ইংরেজিতে বলে, দি গেম ইজ নট ওয়ার্থ দি ক্যাণ্ডল । বাতির পর বাতি গলে গেল। খেলার মজা তো তেমন জমল না।

একটা বোকা বোকা ব্যাপার। সেই দিনের কথা বলছি :

প্যাঁ প্যাঁ করে সানাই বাজছে। হুড়ুম দুড়ুম অতিথি অভ্যাগতের যাওয়া আসা। সিঁড়ি বেয়ে ছাতের দিকে ধামাধামা লুচি ছুটছে, রাধাবল্লভী ওভারটেক করছে। পোলাও-এর বালতি, গেট, সেট, গো হয়ে ফাযাবিং-এর অপেক্ষায় থমকে আছে।

চেয়ারে রাজকুমারী ঝিলিক মারছেন। মুখটা না গোবদা, না হাসি হাসি। জড়োয়ার গয়না, ফুলের মালায় জড়াজড়ি। সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম ঘর্মাক্ত রাজকুমার ঘোঁত ঘোঁত করে হেথা হোথা ছুটে বেড়াচ্ছেন। দেঁতো হাসি। 'আসুন আসুন।' হাত জোড় করে, 'ঠিক হচ্ছে তো ?' (আমার শ্রাদ্ধ। পরে মালুম হয়। বউ যখন হালুম করে)

প্রবীণরা পিঠে হাত রেখে বলছেন, 'এই যে বাবাজীবন। সব ঠিক আছে তো !'

'হেঁ হেঁ জ্যাঠামশাই।'

পান চিবোতে চিবোতে সম্পর্কের কাকাবাবু বলছেন, 'ফাসক্লাশ বউ হয়েছে। ঠিক মতো মেনটেন কোরো।'

বউয়ের নাম হয়তো গীতা।

মাননীয় শিক্ষকমশাই দৃপ্ত ভঙ্গীতে পকেট সাইজের একটি গীতা উপহার দিলেন। প্রথম পাতায় স্বরচিত গীতা,

'চেয়েছিলে গীতা
পেয়ে গেলে গীতা

রোজ সকালে
খান দুই পাতা
পাঠ করিস পাঁঠা ॥'

সানাইয়ের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে মহাকালের ঝাপটায় মিলিয়ে গেল। সংসারের চাতালে তখন অন্য সানাইয়ের কালোয়াতী। হয় ছেলে, না হয় মেয়ে। নার্সিংহোম চুষে নিয়েছে কয়েক হাজার। দিবারাত্র প্যাঁ প্যাঁ। মায়ের আঁ আঁ। ঈশ্বরের প্যাঁচে পড়ে তাঁর সৃষ্টিরক্ষার কসরত চলেছে।

আজ মাসিপিসি, কাল জ্বর, পরের দিন পেটফাঁপা, তার পরের দিন সীনভায়েরিয়া। আটটা পাঁচের লোকাল ফেল। নটা ধরা গেল না। দশটা বাইশে বাবু বিকচ্ছ। বউবাজার দিয়ে ছুটছেন যেন অলিম্পিক ম্যারাথন বীর!

'প্রশান্তবাবু আজও লেট। টু আরলি ফর টুমরো।'

'কি করব স্যার? ছেলেটার…।'

'সবাই যদি ছেলে আর মেয়ে দেখান! এক ইউনিয়ান করলে একসকিউজ করা যেত। সেদিকেও তো ন্যাক নেই। কেবল ছেলে আর মেয়ে। নিজেদের



হেলথ ইম্প্রুভ করুন, তবেই তো হেলদি ইয়ে হবে। যান, কাল থেকে বি ইন টাইম।'

নাঃ হোলো না। পাড়ার ডাক্তারে হবে না। চাইলড্ স্পেশালিস্ট চাই। আরে মশাই দেহও তো বাড়ি। হাড়ের খাঁচা। বাড়ির জন্যে কি করতে হয়! কলের জন্যে প্লাম্বার, ইলেকট্রিকের জন্যে ইলেকট্রিসিয়ান, কাঠের কাজের জন্যে ছুতোর, গাঁথনির জন্যে রাজমিস্ত্রী। উল্টোপাল্টা করলে চলে! ইলেকট্রিসিয়ান কল মেরামত করবে?'

নাকের জন্যে নাকডাক্তার। কানের জন্যে কানডাক্তার। পেটের জন্যে 'পেটালিস্ট'। মেয়েদের জন্যে 'মেটালিস্ট'। ঠিক দরগায় হত্যে দাও।

ঝড়, জল, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত। উত্তরপুরুষের চারা গজাচ্ছে। সঞ্চয় শূন্য। কর্জ। একের পর অগুনতি শূন্য।

ইদিকে চলছে চলবে।

বউয়ের চারটে মুখ। বাপের বাড়ির দিকে যে মুখ, সে মুখে মধুবর্ষণ।



নিজের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের দিকে যে মুখ, সে মুখে স্বামী আর তস্য চতুর্দশ পুরুষের গুণগান।

স্বামীর দিকে যে মুখ, সে মুখে এই হাসি ফোটে কি ফোটে না, মিলিয়ে যায়। যেন ছুঁচে সুতো পরান। ঢুকি ঢুকি ঢোকে না। ফুটোর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাঃ। ট্রাই এগেন।

চতুর্থ মুখ ছেলেমেয়েদের দিকে। উপদেশ আর সাবধানবাণীর লাভাস্রোত। বাপের ধাতে না ধরে! এ বংশের ধারায় মরিসনি।

'সারাজীবন কি করলে?'

'স্ত্রীর মনে ঢোকার চেষ্টা করতে করতে এই হাল আমার। সামনে ফলাও টাক। হাত বুলোও, হাত। পেটটা ঢাউস। প্রেসার, সুগার। চিবোবো কি? দাঁত নড়বড়ে। গিলছি। খাদ্য, গালাগাল দুটোই গিলিতব্য। চশমা ছাড়া, খালি চোখে সবই ছ্যাতরানো। আউটলাইন নেই। সিঁড়ির দশটা ধাপ ভাঙলে, বুকে কামারশালা।'

'কি পেলে?'

'ক্যাঁচকলা। ছেলেই বলো, আর মেয়েই বলো দুম্বা। ওল্‌ডফুলকে কে গ্রাহ্য করবে। পেয়ারা বোঝো পেয়ারা? মহব্বত বোঝ, কুত্তে কমীনে?'

'না রে ভাই বুঝিনে।'

'খামোশ। কথামৃত পড়ো। ছানিটা কাটাও।'

'কিসের অপেক্ষায় বসে আছ?'

'ওই যে পেয়ারীটিকে আমারই বোকাপাঁঠা বউ করে লাউঞ্জে তুলবে, তারপর ছেলের মা বেদী থেকে নেমে এসে বলবে, চলো গুরু। কেটে পড়ি। তখন আমরা দুই হনুমান পাশাপাশি বসব। জীবনের প্রথম মিল। প্রকৃত পেয়ার। কাঁধে কাঁধে হাত। দুলে দুলে গাইব : আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই। একটি দুটি পয়সা পেলে নাড়ু কিনে খাই॥ শেষ রাতের সেই বাসরই তো প্রকৃত বাসর। সানাই নেই। মালা নেই। চাঁদ মালার মতো দুটো মন।'

উল্টে গেল হাল

মেয়েরা বলছেন, আমরা ছেলেদের চেয়ে কম যাই কিসে!

লেখাপড়ায় আমরা সমান সমান। আমরাও চাকরিবাকরি করছি। ঠেসেঠুসে ট্রামে বাসে ট্রেনে উঠছি। ছেলেদের সঙ্গে লড়ে জাযগা দখল করছি। চাঁট ছুঁড়ে নেমে যাচ্ছি। প্রতিযোগিতায় লড়ে যাচ্ছি হাড্ডাহাড্ডি। ছেলেরা যা-যা করে আমরা সে-সব তো করছিই বরং আরও বেশি করছি। আমরা এমন কিছু করতে পারি, যা ছেলেরা জীবনেও পারবে না। এক নম্বর, সন্তানধারণ, দু নম্বর সন্তানপালন। এই দুটি ব্যাপারে আমাদের মনোপলি। কোলের শিশুটিকে ওই গুঁপোর কোলে ফেলে দিয়ে পরপারে চলে যাই, দেখি তোমার কেরামতি! কত ধানে কত চাল তখনই মালুম হবে!

'আমি চললুম। ফিরতে রাত হবে।'—বেরিয়ে গেলেন বাবু। এইবার নেঁণ্ডি গেণ্ডি নিয়ে সংসার সামলাও। এ প্যাঁ করে, তো ও করে পোঁ। একে সামলে ওকে সামলে হরেক কাজের বিলিব্যবস্থা।

চাকুরে মেয়ের সমস্যা তো আরও সাংঘাতিক। সকালের চা দিয়ে সংসারের 'গানফায়ার'। রাতে হেঁসেলে জল ঢেলে সিজফায়ার। এরই মাঝে অবিরাম ঘটনা।

চা মেরে, বুক খোলা জামা পরে, ঢুলুঢুলু চোখে ছেলে চলল বাজারে। তবু একটু বাইরের মুখদর্শন! এর ওর সঙ্গে বাক্যালাপ। রঙ্গরসিকতা। সকালের বাজারটা ফেলে দিতে পারলেই বিরাট একটা কাজ হয়ে গেল। পেছন উল্টে কাগজ দেখার ফুরসত মিলে গেল। আর এক কাপ চায়ের হুকুম করার হক মিলে গেল।

মধ্যবিত্ত কোনও সংসারে সকালবেলা, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে কোনও বধূ খবরের কাগজ পড়ছেন, পাশে ফুরফুরে চায়ের কাপ—এ দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়বে না। পড়লেই বুঝতে হবে অশান্তির সংসার। বউ বেঁকেছে। সিপয় মিউটিনি চলেছে। হয় স্বামীর সঙ্গে গরম লড়াই অন্তে ঠাণ্ডাই চলেছে। আর না হয় শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে 'শো অফ আর্মস' চলেছে! সুখের সংসারে, শান্তির সংসারে



সকালে মেয়েরা দশভূজা। মেজাজ থেকে থেকে সপ্তমে চড়ছে, আবার নেমেও আসছে নিমেষে। শেষরাতের নিদ্রিত পাহারাদারের মতো একপাশে বাজার ভর্তি ব্যাগ দেয়ালে ঠেসানো। সজনে ডাঁটা উঁচিয়ে আছে ঝাণ্ডার খোঁটার মতো।

ব্যাগের কান ধরে এক ঝটকা মেরে দশভূজা বলবেন—'বাজারে এছাড়া আর কিছু ছিল না। রোজ সেই এক ডাঁটা, এক মোচা, গুটি ছয় পটল। বললেই বলবে, পোস্ত চালাও।'

কান ধরে টান মারার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগ কুপোকাত। গোটাকতক আলু আর দুটো লেবু গড়াতে গড়াতে চলে গেল ক্যাবিনেটের তলায়। ধর ধর। পোষা মিনি ছুটলো গোলের মুখ থেকে পেনাল্টি এরিয়ায় ফিরিয়ে আনতে।

'এই যে একটু পোস্ত বেটে দাও তো?' কোনও ছেলেকে বললে, চ্যালেঞ্জ হিসেবে হয় তো বসে পড়বে শিলে। তারপর?



পোস্ত আর সরষে, মানুষের ভাগ্য আর মন্ত্রীদের আশ্বাস বাক্যের চেয়েও স্লিপারি। মেয়েরাই পারে অমন জিনিসকে বশে এনে পিষে ফেলতে।

দেখি একটা রুটি কি লুচি গোল করে বেল তো! কেমন তোমার মুরদ!

সকাল বেলা চারা মাছ এনে চাতালে নামিয়ে স্যাণ্ডউইচ ব্লেড দিয়ে মসৃণ করে দাড়ি কামাতে বসলে। এসো না, বঁটি পেতে দিচ্ছি। কুচকুচ করে মৌরলামাছের অপারেশানটা সেরে ফেল দেখি। আমাকে একটু হেলপ করো। তোমাকে তো আমি হেলপ করি। র‍্যাশনকার্ড রিনিউ করতে হবে, লাইন। যেহেতু তোমার সময় নেই। বিকেলে বাজারে ঢুঁ মারা। যাকে বলা হয় মেরামতি বাজার। তোমার বাজার তো তোমারই মতো। ধাপ্পা মারার মতো, ধাপ্পা বাজার। ছিরি ছাঁদ নেই। দায় সারা। মেরামত তো আমাকেই করতে হয়। যত কুচকটালে

কাজ মেয়েদের ! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, খুচুর খুচুর রেঁধে যাও ।

মহিলাদের সব অভিযোগ সত্য । ছেলেদের দাপটে, অত্যাচারে, আলসেমিতে সংসারে কারারুদ্ধ । ঝগড়া ছাড়া কোনও আলাদা উত্তেজনা নেই । ইওরোপ, আমেরিকায় মেয়েরা সব ভেঙে তেড়ে বেরিয়ে আসছে । মহিলারা জিমনাসিয়ামে গিয়ে ডাম্বেল বারবেল ভাঁজছেন । আমেরিকানরা যাকে বলেন-পাম্পিং । টাইম আর নিউজ উইকে সেই সব মহিলা ব্যায়াম বীরাঙ্গনাদের ছবি ছাপা হয়েছে । ট্রাইসেপ, বাইসেপ, ডেল্টয়েড । ল্যাটিসিমাসের স্ফীতি দেখলে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে । বলতে ইচ্ছে করবে—এ কি সর্বনাশ করলি মা ! বিঅণ্ড রিপেয়ার । যা সব ঠেলেঠুলে উঠেছে, তাকে আবার চেপেচুপে কোমল কমনীয় করা যাবে কি ?

মহিলারা ছেলেদের সব কাজ কেড়ে নিয়ে দেখতে পারেন । আপত্তির কিছু নেই । তবে কয়েকটা ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন, দমকলে যদি মহিলা থাকেন, তাহলে কি হতে পারে ! জরুরী কল এসে গেছে । প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড । মহিলা অফিসার চুলের জট ছাড়াচ্ছেন । চিরুনি চলছে খসখস শব্দে । ওদিকে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে । খোঁপা হল । ছদিকে ছটা কাঁটা গোঁজা হল । হাতেব তালু দিয়ে তবলা বাঁধার মতো, ডাইনে, বাঁয়ে, পেছনে আলতো চাপড় মারা । ততক্ষণে চটকল, কাপড়কল পুড়ে ছাই ।

মহিলা যদি ট্র্যাফিক সার্জেন্ট হন তাহলে কি হবে !

আইনভঙ্গকারী পালাচ্ছে । মহিলা সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে তাড়া করে শেষমেষ ধরেই ফেলল । মহিলার পাম্প করা শরীর । অসীম ক্ষমতা । কপ করে অপরাধীর ঘাড় চেপে ধরে যদি বলে বসেন—সেই একান্তই মহিলাসুলভ বাণী—অসভ্য ! অথবা এমন কি ঘটবে ! রাতে পাড়ার বোমবাজিতে মেয়েরা নেমে পড়েছে । ছেলেদের বদলে মেয়েরা দমাদ্দম ঝাড়ছে ' আর মশারির ভেতরে কোলের শিশুটি ককিয়ে কাঁধছে —মা যাবো । কি যে হবে তখন ঈশ্বরই জানেন ।

ঠ্যালা সামলাও

যত বয়েস বাড়ে মেয়েদের তত গলা বাড়ে।

আর তো মশাই পারা যায় না। পুরুষের যত বয়েস বাড়তে থাকে শরীর থলথলে হয়। গাল দুটো ঝুলে পড়ে। চোখ দুটো ফ্যালফেলে। অনেকটা ছানা বড়ার মতো। মানে সংসারের রকম সকম দেখে কপালের দিকে ঠেলে উঠতে চায়। কথা কমে আসে। মন তখন খুঁজতে থাকে শান্তি, একটু নিরিবিলি পরিবেশ।

আর পাওয়া যায় ঠিক উল্টোটা। প্রথম জীবনে যিনি সুরেলা গলায় ভোরে ঘুম ভাঙ্গাতেন, 'এই যে শুনেছো ! বেলা হয়ে গেছে, উঠে পড়।' সেই সুরেলা তিনি এখন পেল্লায় গলার অধিকারিণী। কুস্তিগীরের মতো ঘাড়ে রদ্দা মেরে, বোমা ফাটানো গলায় বলেন—'অ্যায় যে উঠে পড়। বেলা বারোটা বাজল। আব কত ঘুমোবে ! নেশাটেশা করো না কি !'

মেয়েদের বয়েস বাড়লে তাদের সব কিছু বেড়ে যায়। কমে শুধু ধৈর্য। সকাল ছ'টাকে মনে হয় বেলা বারোটা। সন্ধে সাতটায় অফিস থেকে ফিরলে, পাড়া ফাটানো গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে— 'কোথা থেকে ফিরলে এই শেষ রাতে ফূর্তি করে !'

যে বয়েসের কথা বলছি, সেই বয়েসের মেয়েদের তিলকে তাল মনে হয়। কেউ হয়তো কৌটো খুলে এক চামচে চিনি চুরি করে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সংসার কেঁপে উঠল—এক চামচে হয়ে গেল এক কিলো। 'ঘুরতে ফিরতে এইভাবে এক এক কিলো চিনি সাবড়ে দিলে আমার পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব। এই নাও।'

চিনির কৌটো চলে এল কত্তার পড়ার টেবিলে। যৌবনে ছেলে সামলেছেন এখন চিনি সামলান। কিছু কান পাতলা কত্তাও আছেন। অন্যের ব্যাপারে স্ত্রীর কথা ভীষণ বিশ্বাস করেন। নটরাজের মত নেচে উঠলেন, 'তাই বলি মুদীখানার বিল কেন এত হচ্ছে। তিন শো, চার শো, পাঁচশো। হয়ে যাক, হয়ে যাক। গৌরী সেনের টাকায় হয়ে যাক।'

স্ত্রীর ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক কর্তার ভরতনাট্যম। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী একেবারে থ। এক চামচে চিনি খেতে গিয়ে কি গেরোরে বাবা।

অন্য সব ব্যাপার বুড়ো-বুড়িতে সারা দিন ঠুস ঠাস, ঠোকাঠুকি। আর এই সব ব্যাপারে দু'জন একেবারে অটুট ইউনাইটেড ফ্রন্ট।

ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধী শেষে মরিয়া হয়ে বলেই ফেললে—'আর মা যখন সকালের চায়ে সাত চামচে চিনি ঢালে, তখন! তখন সংসার ফেল করে না?'

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ঝাঁঝালো উত্তর—'বেশ করে। বেশ করে। তোর খাই। আমি খাই এই লোকটার। যে আমাকে সংসারে এনেছে।'

দৃপ্ত ভঙ্গিতে জীবনসঙ্গীর পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কর্তার মন হিল হিল করে উঠল। কি অসাধারণ মুহূর্ত। ক্যামেরা থাকলে টুক করে একটা ছবি তুলে নাও। চন্দ্রের পাশে রোহিণী।

যে কোনও সংসারেই দুটো কি তিনটে জেনারেশান পাশাপাশি থাকে। পাশাপাশি কিন্তু মাঝে দুস্তর ব্যবধান। বিশ্বাসের মিল নেই। আদর্শের ফারাক। ভিন্ন রুচি, অভ্যাস ভিন্ন, ভিন্ন ভাষা। একই ছাদের তলায় আস্ত এক চিড়িয়াখানা।

বুড়ো বুড়ি ধর্ম মানে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী। দেহ শুদ্ধি, আহার শুদ্ধি, জীবনের সব ব্যাপারে একটা পরিমিতির ব্যাপারে বিশ্বাসী। হ্যা হ্যা করে জীবনটাকে সাবানের



ফ্যানার মতো ফৌত করে দেব, কখনও চিন্তাতেই আসেনি। যা করব, যেটুকু করব, ভালো ভাবে করব। ওমর খৈয়াম হয়ে ঢাল সুরা, আ যাও সাকী করে ধেড়িয়ে যাব না। আত্মসচেতন সব ব্যাপারে সিরিয়াস।

জজ, ম্যাজিস্টার, রাজ্যপাল, ব্যারিস্টার হতে না পারি, যে জীবনে আছি সেটা ফেলনা নয়। এই আভিজাত্যবোধটা একালে নেই। এ যুগের দুটি বুলি—[১] হবেখন [২] করলেও হয় না করলেও হয়।

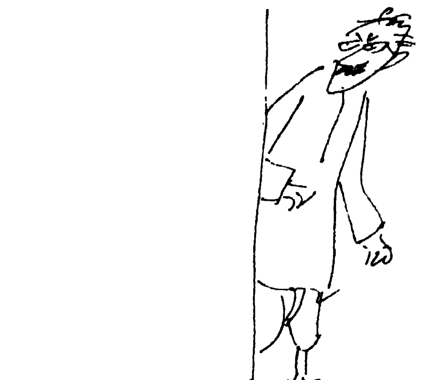
ইলেকট্রিক বিল ? ওরে লাস্ট ডেট' পেরিয়ে যায়। হবেখন।

হবেখন করতে করতে জমাই পড়ল না। শেষে কাঁচি হাতে কম্পানী তেড়ে আসতে টনক নড়ল। নড়ল কার ? যুবকের নয়। বুড়োই ছুটল ছাতা বগলে।

এ ঘরে জপের মালা, ওঘরে আড্ডা, তার পাশের ঘরে নিদ্রা, তার পাশের ঘরে ফিসফাস। থ্রিডাইমেনসানাল হিন্দি ছবির বাবা। হরেক দিকে বেরিয়ে গেছে সংসারের হরেক ডাইমেনসান। যার যা খুশি করে যাও। দেশেরও নেতা নেই, সংসারেরও অভিভাবক নেই। যিনি আছেন তিনি একালের দৃষ্টিতে, বিচারে, অচল। ওল্‌ড ফুল।

ছেলে বলছে—আরে ম্যান, তুমি ঈশ্বর বিশ্বাস করো ? হাউ ফানি ? হু ইজ ইওর ঈশ্বর ! আমিই তো সব। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর।

হ্যাঁরে ব্যাটা ! মানুষই ঈশ্বর। তবে সে মানুষ এ মানুষ নয়। পাজামা পরে,



রাঙাপানা গেঞ্জি গায়ে চাপিয়ে, যে মানুষটি সামনে দাঁড়িয়ে, চোয়াল নেড়ে নেড়ে চিউয়িং গাম চিবোচ্ছে, সেই মানুষটি অন্তত ঈশ্বর নয়। যে সব মানবীয় গুণ থাকলে, সাধনা থাকলে মানুষ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সাধনাটাই উবে গেছে বাবা।

ঈশ্বর মূর্তি নয়। কল্পনা নয়। ফোঁটা কাটা নয়। জপের মালা নয়। বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ আদর্শের নাম ঈশ্বর। নিষ্ঠার নাম ঈশ্বর। কর্তব্যপরায়ণতার নাম ঈশ্বর। অনুভূতির নাম ঈশ্বর।

সকাল আটটায় উঠলেও হয়, পাঁচটায় উঠলেও হয়। কোনও দিন দশটায় বিছানায়, কোনওদিন সারারাত আড্ডা। ছাগলে যেমন সব খায়, পড়াশোনার বাছবিচার নয়। ক্রাইম, সিনেমা, পর্নো, রূপচর্চা। মনের উঠনে নৃত্য করছে হরিদাসের বুল বুল ভাজা। জ্ঞানের জগাখিচুড়ি। আসল জ্ঞান আকাশ সীমায়। ধরার সাধ্যও নেই। চেষ্টাও নেই।

একজন মানুষ পাশে এল, মন ভরল না। এমন তার আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চালচলন, যতক্ষণ না সরে যায় ততক্ষণই বিরক্তিকর। দেহ আছে, মন নেই। বুকনি আছে, ধোলাই হয়ে যাওয়া মগজে ঈশ্বরের অহঙ্কার কিন্তু সহবত নেই। পয়সা আছে কালচার নেই। ভদ্র আচরণ, ভদ্র কথা, ভদ্র চালচলন, প্রাগৈতিহাসিক জিনিস। এখন মানুষ হওয়া মানে দামড়া হওয়া। গন্ধে গোলাপ চেনা যায়, আবার গন্ধে গাঁদালও চেনা যায়। একালে হাসি মুখে, শ্রদ্ধাসহ, সবিনীত অভ্যর্থনা করলে শুনতে হয়—মেনি মুখোটার আদিখ্যেতা দ্যাখ। ন্যাকামি করছে।

বয়েস বাড়ছে। মেয়েদের গলা বাড়ছে। ছেলেদের চুল বাড়ছে। মেয়েদের কমছে। বুড়োদের দায়িত্ব, কর্তব্য বাড়ছে। যুবকদের কমছে। এক সময় বাপের রোজগারে দামড়া ছেলে দিবানিদ্রা দিত। আর রকে বসে ফুলো ফুলো গালের ব্রণ খুঁটত। আর একালে ? লায়লার হাত ধরে সোজা শোবার ঘরে। নাও এবার দু জেনারেশানকে সামলাও।

ডিম সেদ্ধ না ভাজা

সংসারে ঘুরতে ফিরতেই বিরাট একটি প্রশ্নে বারে বারেই হোঁচট খেতে হয়—'তুমি আমার জন্যে কি করলে ? কি করেছ তুমি আমার জন্যে ?'

স্ত্রীর প্রশ্ন স্বামীকে । স্বামীর পাল্টা প্রশ্ন স্ত্রীকে । এ ওকে চেপে ধরে, তো, ও একে । কুস্তির আড়াই প্যাঁচের মতো । দারা সিংয়ের 'ইন্ডিয়ান লক' । পেড়ে ফেললে খুলে ওঠে কার বাপের সাধ্য !

সত্যিই মানুষ অনেক আশায়, অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঘর বাঁধে, শেষ পর্যন্ত কি হয় ! বিশ্রী এক সমাপ্তি । প্রথম কয়েক বছর বেশ একটা ঘোরে, নেশায় কেটে যায় । তারপরই শুরু হয় চড়াই । হাঁপ ধরে যায় । জুতো যত পুরনো হয় ততই আরামদায়ক হয়ে উঠতে থাকে । সংসার যত পুবনো হয়, ততই ফোস্কাদায়ক । ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়ে দেয় । অনেকটা দাঁতের মতো ।

নতুন দাঁতে, টক খাও, ঝাল খাও । আখ চিবোও । হাড ভাঙ । দাঁতের যত বয়েস বাড়ে । কলাই উঠে যায় । গর্ত হয় । নড়বড়ে যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার । প্রাণ বের করে ছেড়ে দেয় । তখন একটা একটা করে উপড়ে ফেলতে পারলেই শান্তি ।

দাঁত ফেলা যায় । সংসার থেকে কে কাকে ফেলে দেবে ! যতক্ষণ না ঈশ্বর নিজে হাতে ফুল তোলার মতো একটি একটি করে তুলে নিচ্ছেন । সে তোলার আবার কোনও নিয়ম নেই । কখনও কুঁড়ি ছিঁড়ছেন । কখনও আধফোটা ফুল ।

মানুষের স্বপ্নের বাগানে দুটি মত্ত হাতি, এক, নিয়তি, দুই মানুষ নিজে । নিয়তির অত্যাচার সহ্য করা যায় । মানুষের অত্যাচার অসহ্য । পাগল পাগল করে দেয় । কোনও পরিকল্পনা দানা বাঁধাব অবকাশ পায় না ।

অনেকের পারিবারিক অ্যালবামে নানা জনেব নানা বয়েসের ছবি থাকে । বেশ সুন্দর করে সাঁটা ।

বিয়ের রাত । জীবনেব বিশেষ এক পরিচ্ছেদ । ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ । কোঁচা সামলে হিরো নামছে ফুল দিয়ে সাজানো মোটর থেকে । পাশে বর কর্তার হাতে টোপর ।

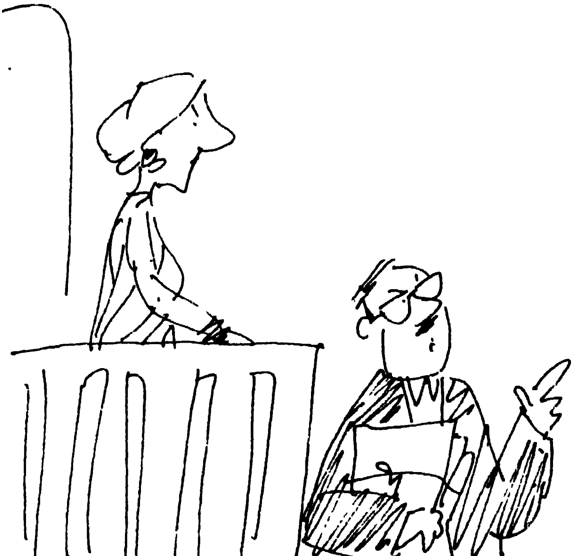
রেশমী তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছে হিরো বাসরে। মুখে একটা ভয় ভয় বোকা বোকা ভাব।

হিরো পিঁড়েতে। মুখোমুখি বেনারসী মোড়া কন্যা। হাতে হাত তার ওপর ফুল। চারপাশে জোড়া জোড়া চোখ। সব চোখেই ওই দিনটির মায়া জড়ান খুশি খুশি ভাব। প্রতিদিনের চুলচেরা দৃষ্টি নয়। কেমন যেন স্বপ্নময়।

ছেলে মেয়ের মুখে একটি সন্দেশ গুঁজে দিচ্ছে। চারপাশে মেয়েদের গুলতানি।

সেই রাতটির সব গুলতানি অ্যালবামে সাঁটা। ঘটনার পর ঘটনা। সুন্দর পোশাক, সুন্দর মুখের মিছিল।

বছর ঘুরেছে। অদৃশ্য চাকার মতো। প্রাত্যহিকতায় হারিয়ে গেছে রঙিন সুরভিত সেইরাত। তারপর কে বলতে পারে কি হয়েছে। তিক্ততায়, তিক্ততায় সম্পর্ক ভেঙে গেছে। সেই বেনারসী মোড়া, চন্দনচর্চিতা মেয়েটি ফিরে গেছে বাপের বাড়ি। এখন এজলাসে দুই পক্ষের উকিলে বাদানুবাদ। বিচ্ছেদ আর খোরপোষের মামলার দুই প্রান্তে সেই দুটি চরিত্র ঝুলে আছে, কোনও এক



ফাল্গুন সন্ধ্যায় যারা শপথ নিয়েছিল, এক সঙ্গে পথ চলার—টিল ডেথ ডু আস অ্যাপার্ট। যে বন্ধন মৃত্যু ছাড়া আর কেউ খুলবে না, সেই বন্ধন খুলে দেবে আইন।

শিশুর ছবিও পাওয়া যাবে। মায়ের কোলে। অন্নপ্রাশনের আসনে। একপাশে পিতামহ, অপর পাশে পিতামহী। শিশুর কখনও রাজবেশ। কখনও দিগম্বর বেশ। কখনও নাড়ুগোপাল। হাতধরে হাঁটিহাঁটি। কোল থেকে কোলে হতে হতে আদরের শিশুটির কৈশোর-যাত্রা।

তারপর। পরের ইতিহাস আর অ্যালবামে ধরা নেই। ভাগ্যের মহাফেজখানায় বিলম্বিত। পিতামাতার সব আশা আকাঙ্ক্ষা জেনারেশান গ্যাপের গহ্বরে তলিয়ে বসে আছে। যৌবনের সব দুষমনী ওই চোখেই দেখতে হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে হয়—সেকাল আর একাল।

সেকালেরও তো একটা একাল ছিল! সেকালের সন্তান কি সেকালের পিতামাতাকে একালের মতো জেরবার করে মারত। প্রতি সংসারেই এখন গুমোট অবস্থা। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই তো হয়েই গেছে বহুদিন। নিজের ভাইয়ের



চেয়ে ঘৃণিত শত্রু মানুষের আর কে আছে ! দু একটা সুখী যৌথ পরিবার এধারে ওধারে পড়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক ডায়নাসরের মতো । বাকি সব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এক কামরা, দু'কামরার ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে । এই ভাঙন পূর্বপুরুষের আমলেই শুরু হয়ে এখন প্রায় সম্পূর্ণ । বাঙালীর সুখের পরিবার জীবন ফিনিশ । বাপেদের প্রিন্ট বাড়ছে । আগে পরলোকগতের একটা ছবি একটা দেয়ালেই আড় হয়ে ঝুলত । এখন অসংখ্য কপি হয়ে একটা নাগপুরে, একটা কানপুরে, একটা বেকবাগানে, একটা তালতলায় । সতীদেহ ছিন্নভিন্ন । এক এক পীঠে এক এক পরিবেশে পিতাঠাকুরের অধিষ্ঠান । মহালয়ার দিন হয়তো বা এক চামচ সতিলগঙ্গোদক প্রাপ্তি ।

ছানি কাটানোর পর চোখে পুরু লেনসের চশমা । পায়ে তালিমারা চপ্‌পল, জীবন-সংগ্রামের বীর সৈনিক পেনসানার বাঙালী থেকে থেকে নীল আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন ।

বাসে উঠে জানালার ধারে বসে একজন ঘুমিয়ে পড়েছেন । মাঝে মাঝেই চটকা ভেঙে গেলে জিজ্ঞেস করছেন—দাদা, কালীঘাট কি এলো !

আকাশপানে তাকিয়ে বৃদ্ধের নিরুচ্চার প্রশ্ন—বথ কি এলো ।

ছেলের নাম রেখেছিলেন—নিলয় । অ্যালবামে অন্নপ্রাশনের ছবি সাঁটা আছে । নিলয় এখন বোতল মিত্তির হয়ে বিছানায় । বেলা আটটা বাজলো । প্রেম করা বউ আয়নার সামনে বসে ঠোঁটে এনামেল করছে । একটু পরেই পার্কস্ট্রিটের রিসেপসানে গিয়ে বসতে হবে । ছেলের মা, ময়লা শাড়ি পরে দরজার বাইরে ঝিয়ের মতো দাঁড়িয়ে—বউমা, ডিম সেদ্ধ খাবে না ভাজা !

এই জেনারেসানের মা, পরের জেনারেসানে বউকে বলবেন—বউমা, আপনি ডিম সেদ্ধ খাবেন না ভাজা । এই জেনারেসানের বাপ পরের জেনারেসানের বউমাকে বলবেন,—দিদিমণি, এই যে আপনার শাড়ি ইস্ত্রি করিয়ে এনেছি ।

ইংরেজী প্রবাদ অ্যাজ ইউ সো. সো উইল ইউ রিপ ।

যেমন বীজ বুনবে তেমনি ফসল তুলবে ॥

তিলে তিলে

কি দুর্ভাগ্য মানুষের ! বিশেষত তাঁদের যাঁদের দশটা পাঁচটা চাকরি করতে হয়। পঁচিশ বছর, তিরিশ বছর। এক চলন, দশটা পাঁচটা। দিনের সবচেয়ে ভাল সময়টাকে ফেলে রেখে এস বিবর্ণ, ঘুপচি এক অফিসে, ফাইলের গাদায়।

ভোরের কচি দিন দশটা নাগাদ ডেঁসে ওঠে। বারোটায় পাকা। পাঁচটা নাগাদ শুকোতে থাকে। হলদে হয়ে কুঁকড়ে আসে। অফিস থেকে মানুষ যখন ছাড়া পায় দিন তখন মরে গেছে। শরীর ধুঁকছে। মাথা ঘোলাটে। ক্লান্ত এক সর্বনাম ফিরে আসে বিমর্ষ গৃহকোণে। গরুতে আর মানুষে তফাত রইল কই। এই তিল তিল মৃত্যু গরুকে পীড়া দেয় না। মানুষকে দেয়।

যে সময় আমরা অফিসে, সেই সময় আকাশ কত নীল। পাখি উড়ছে। পায়রা লাট খাচ্ছে। চিল বসে আছে ছাদের মাথায়। নরম-গরম বাতাস। পাতা কাঁপা গাছ। ধীরে ধীরে দিন ঢুকবে খাঁখাঁ দুপুরে। প্রকৃতি এলিয়ে পড়বে ক্লান্তিতে। পুকুরের জল থেকে হাঁসেরা সব উঠে আসবে গাছের শীতল ছায়ায়।

আমরা তখন বড় কত্তার ঘরে। সূক্ষ্ম অয়েলিং ক্লিনিং-এ ব্যস্ত। টোপ ফেলছি কেরিয়ারের কালবউস গাঁথার আশায়। সনাতন হাজরা যে কত বড় শয়তান পরতে পরতে সেই ব্যাখ্যা করে চলেছি। ভেতরে কি যে হচ্ছে ! ঘোড়া ছুটছে। বাড়ি চাই, ফ্ল্যাট চাই, স্ট্যাটাস চাই। এই চাই, ওই চাই ! মনের উঠনে ধুমসো এক পালোয়ান ল্যাঙট পরে হাঁসফাঁস ডন বৈঠক মেরে চলেছে। ফুলতে হবে, ফুলতে। দেহের নয়, বেঁচে থাকার গালগুলি ফোলাতে হবে।

বাইরেটা তখন কি সুন্দর ! শহর ছাড়িয়ে বিশ তিরিশ মাইল যেতে পারলেই, হিলহিলে সবুজ মাঠ ছুটছে আকাশ ধরতে। ইজের পরা স্বাধীন শিশু ছ্যাঁচা বেড়ার ধারে নেচে নেচে ফড়িং ধরছে। বাদামী রঙের গোদা একটা কুকুর চালের ছায়ায় আধ হাত জিভ ঝুলিয়ে, বোজা চোখে হ্যা হ্যা করছে। পেয়ারার ডালে কাঁটা বুলবুল শিস দিচ্ছে। পুকুর ঘাটে স্নান সেরে উঠছে বৃদ্ধা।

অত দূরে নাই বা গেলাম ; উত্তর কলকাতার সাবেক পাড়ায় ঢুকি না ! বনেদী বাড়ির চওড়া লাল রকে বাসনউলী বোঝা নামিয়ে, পা ছড়িয়ে বসেছে ! আঁচলের

বাতাস খাচ্ছে। একটু আগেই সে চেঁচাচ্ছিল চিলের গলায়—বাসন রাখবেন, বাসন! রাস্তার আর একটু গভীরে গেলে সাবেক কোনও বাড়ি সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণের মন্দির, অথবা গোপালজিউর মন্দির। মোজাইক ঢালা হলুদ মেঝে। ভেতরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার। শীতল। পেতলের সিংহাসনে বংশীধারী, পাশে লাজুক রাধা। ফুলের গন্ধ ধূপের গন্ধ থ মেরে আছে। সেবাইত ন'হাত ধুতি পরে পুজোয় বসেছেন। টিংটিং ঘণ্টা বাজছে। অথবা পুজো হয়ে গেছে। ভোগরাগ শেষ। মধ্যবয়সী এক মহিলা লাল পাড় শাড়ি পরে একপাশে বসে বসে পিদিমের সলতে পাকাচ্ছে।

টিং টিং রিকশ গলি থেকে চলেছে বড় রাস্তার খোঁজে। বসে আছেন মিত্তির বাড়ির বড় বউ। মুখে জর্দাপান। চলেছেন দরজিপাড়ায় বোনের বাড়ি। হঠাৎ ওপর দিকে আকাশের আশায় চোখ ঘোরালে আশাতীত লাভ। কাঠের রেলিংঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুন্দরী। পিঠে এলানো ভিজে চুল। মায়াবী দুপুরের জীবন্ত মায়া। পালঙ্কে গড়িয়ে পড়ার আগে উদাসী নজর মেলেছেন। ওরে দিন যায়, এই ভাব।

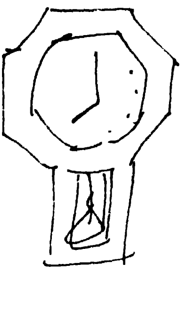
রাস্তা যেখানে বেঁকেছে সেই মুখে পোড়ো একটি বাড়ি। ঝুলে পড়েছে বয়েস আর দুর্ভাগ্যের ভারে। বড় বড় খিলান। পাখি লাগানো বারান্দা। ঢালাই গ্রিলের

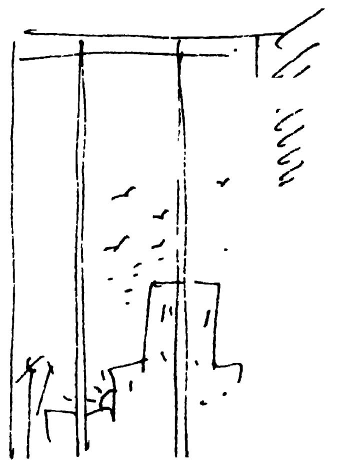


স্মৃতিচিহ্ন। দোতলার ধ্বংসস্তূপে সাদা একটি বেড়াল। রোজই হয়তো আসে গৃহস্থের খোঁজে। প্রাচীনরা ইতিহাস জানেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, আরে মশাই, কার বাড়ি জানেন, দুর্গাচরণ বাবুর! দোল, দুর্গোৎসব, রাস সবই হত। এ বাংলা থেকে ও বাংলায় স্টিমার চালাতেন। কাপড়ের কল ছিল। বিদেশে বাণিজ্য ছিল। শেয়ারে টাকা খাটাতে গিয়ে ফৌত। ডিসপিউটেড প্রপার্টি পড়ে আছে লাট খেয়ে। বড় ছেলে সে যুগের হিরোইনকে বিয়ে করে বুইক গাড়ি চালাত। পরে মধুপুরের বাগান বাড়িতে তার লাশ পাওয়া যায়।

গলি প্যাঁচ মেরে আরও জটিল হবার আগেই, ছোট্ট স্যাকরার দোকান। বৃদ্ধ কোল কুঁজো হয়ে সোনার তবকে হাতুড়ির তেহাই মেরে চলেছেন। সামনে লকলকিয়ে জ্বলছে মোমের প্রদীপ। এর পরেই ছোট্ট বস্তি। একপাশে শুকনো কলের সামনে রঙবেরঙের জলপাত্রের লাইন। দুটি যুবতী মেয়ে আলুলায়িত ভঙ্গিতে দরজার দু পাশে দাঁড়িয়ে। পেছনে বিশাল এক বাড়ির দামড়া ঔদ্ধত্য। ভাগ ভাগ বারান্দায় রঙবেরঙের শাড়ি যেন গরবিনীর নিশ্চিন্ত অহঙ্কার।

নেচে নেচে একটি কিশোর চলেছে। নীল প্যান্ট, সাদা শার্ট। পিঠে বইয়ের ব্যাগ। ঠোঁটে শস্তা আইসক্রিম। অর্থনীতির বাইরে মুক্ত স্বাধীন জগতের ক্ষুদ্র





পুরুষ। চোখে ভাসছে বিকেলের খেলার মাঠ, ফুটবল। এখুনি দমাস করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকবে। বইয়ের ব্যাগ ফেলে চিৎকার করে উঠবে—মা খেতে দাও। তার আগে টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখে নেবে তার শৈশব সম্পত্তি সব ঠিক আছে কি না! প্লাস্টিকের কৌটোয় খুচরো পয়সা। একটা সুগন্ধী ইরেজার। এক প্যাকেট নানা রঙের ফেল্ট পেন। কাগজ থেকে কাটা খেলোয়াড়দের ছবি। একটা ছোট্ট ডায়েরি। হঠাৎ হ্যাট বলে ঘরের কোণে ঘুমন্ত বেড়ালটাকে চমকে দেবে। তারপর ছুটে চলে যাবে বারান্দার কোণে। সেখানে বড় দইয়ের ভাঁড়ে কি একটা গাছ পুঁতেছে। ঝ্যাঁটা কাটি দিয়ে খানিক খোঁচাখুঁচি করবে। তারপর আবার চিৎকার করবে—মা খেতে দাও। অকারণে খানিক নেচে নেবে।

কিশোরের পিতা হয়তো হাইকোর্টের স্টেনো। ঠিক সেই মুহূর্তে জজ সায়েবের রায়ের শ্রুতিলিখনে গলদঘর্ম। কে এক ভবানী মণ্ডল মাঝরাতে বউ খুন করেছিল। তার প্রাণদণ্ড।

দিন যখন পৃথিবীর স্লেট থেকে প্রায় মুছে গেছে, তখন কোর্ট-কাছারি, অফিস থেকে নানা বয়েসের নারী-পুরুষ গল গল করে নেমে আসবে শহরের পথে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকবে কেউ বাড়ির দিকে। কেউ দ্বিতীয় কর্মস্থলের দিকে। কাপের পর কাপ চা আর এক মুঠো ঝালমুড়ি খেয়ে কারুর অম্বল হয়েছে। কারুর আধকপালে। কেউ আবার ডেকার্স লেনের বেঞ্চিতে বসে পড়েছে। দুটো চিনি টোস্ট, এক কাপ চা এলো বলে। রাত্তির দশটা পর্যন্ত লড়তে হবে এখনও। কেউ ছুটছে তীর বেগে চৌরঙ্গী পাড়ার সিনেমার দিকে। সেখানে মাধুরী দাঁড়িয়ে আছে উদ্বিগ্ন মুখে।

প্রতিদিন এই ভাবেই মরে যেতে থাকে। জীবনের ঝরাপাতার হিসেব জমতে থাকে সার্ভিস বুকে। একদিন সেই চিঠিটি হাতে ধরিয়ে দেবে, তোমার খেলা শেষ। পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে সরে পড়। বিবর্ণ ফেয়ারওয়েল। চেয়ার কিন্তু খালি থাকবে না। নতুন ক্রীতদাস আসবে চকচকে চেহারা নিয়ে তিলে তিলে মরতে।

মাপা হাসি চাপা কান্না

সব কেমন যেন শুকনো হয়ে যাচ্ছে। ভাব, ভালবাসা, হাসি, কান্না। জীবন যেন শুকনো পাঁউরুটি। টিভির পর্দায় গানের অনুষ্ঠান। যিনি গাইছেন তাঁর না হয় দমের কাজ। গলনালি ঠেলে উঠছে। উঠতেই পারে। সুর সমেত বাণী ওগরাচ্ছেন। বেশ কষ্টের ব্যাপার। চোখ উল্টে যেতে পারে। মুখ বিকৃত হতে পারে ; কিন্তু যাঁরা সঙ্গত করছেন, তাঁদের অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়। গোবদা মুখ যেন মাস্টারমশাই ধমকে হাতের লেখা করতে বসিয়েছেন। আজকাল আবার খুরখুরে তবলা হয়েছে। তবলচি যেন নাতির মাথায় চাঁটি মারছেন। বল ব্যাটা, অ এ অজগর আসছে তেড়ে, আ এ আমটি খাবো পেড়ে।

সেকালে গানের সঙ্গে বাজনা হত। একালে বাজনার সঙ্গে গান হয়। গাইয়ে একজন। বাজিয়ে ষোলজন। নোটেশানের যুগ। গিটার একচরণ বাজিয়ে ছেড়ে দিলে, বেহালা গজখানেক কান্না নামিয়ে এলিয়ে পড়ল। সেতারে তিন টুস্‌কি। বাঁশীতে তিন ফুঁ। ষোলজনের ঝাড়ফুঁক। আজকাল আবার ঘুরে ফিরে গান গাইবার রীতি। হাতে মাইক্রোফোন। বিশাল ন্যাজের মত মোটা তার গাইয়ের পেছন পেছন লটরপটর করছে। তিনি শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে এক আধ চরণ কৃপা করছেন। আজকাল বাণীও মারাত্মক :

রেখো না আমার হাতে হাত
খামচে দোবো।
চোখে চোখ রেখো না
চোখ দেখাবো ॥
তোমাতে আমাতে জুতোতে জামাতে
কাছাতে কোঁচাতে
জড়িয়ে যাবো [ইকো : যাবো, যাবো, যাবো]
হাঃ।

সবকটা যন্তর মাঝরাতের চতুষ্পদ প্রহরীর মত আর্তনাদ ছাড়বে। না, প্রাণের

কোনও প্রকাশ নেই। শুকনো শব্দ।

'তুমি কোথায় ?' গেয়ে গাইয়ে সরে পড়লেন। যন্ত্রীরা পাঁচ মিনিট খ্যাঁচোর ম্যাঁচোর করলেন। গাইয়ে তার মধ্যে পান কিনলেন, সিগারেট ধরালেন। ধীরে সুস্থে আসরে এলেন। গিটারের গিটকিরি তখনও চলছে। আরও দুবার পান চিবিয়ে গায়ক ছাড়লেন, 'আমি হেথায়।' তারপর খুব দ্রুত, 'এসো না, এসো না, এসো না, কাছে এসো, এসো কাছে, দূরে থেক না।' ব্যাস আবার পাঁচ মিনিটের ছুটি। যন্ত্রের লাঠালাঠি চলুক। দু মাত্রার তাল কাটার ভয় নেই। প্যারেডের ছন্দ, ডান বাঁ, ডান বাঁ, গান এখন গণিত। ভাবের ব্যাপার নেই। সোয়েটার বোনা। উল্টো সোজা। সোজা উল্টো। মীড়, গমক, মূর্ছনা, বিস্তার, বিলম্ব, প্রলম্ব, সেকালের বস্তু।

মাটান রোল, ফিশফ্রাই
ইডলি ধোসা
চিকেন ড্রাই।

'কি চাই ! বাবু বাড়ি নেই।' দরজা খুলেই দু রাউণ্ড। দরজা বন্ধ। প্রস্থান।



সোনারপুর থেকে তেতেপুড়ে সোনা গিয়েছিল সোদপুরে বন্ধু বিমলের সঙ্গে দেখা করতে। পত্রপাঠ বিদায়। আচ্ছা, দূর থেকে এসেছেন, খানিক বসুন। এক গেলাস জল খান। বাঙালীব সেই সব আতিথেয়তা আর নেই।

'আরে বসুন, বসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।' সাহস করে কেউ হয় তো বা বললেন। বলেই, অন্দরমহলের দিকে এমন মুখে তাকাবেন, যেন কেউ শিশুটিকে বলেছেন, 'ওই লে জুজু আসছে।'

বাইরের ঘরে বসে বসেই শোনা যাবে, 'হ্যাঁ গা, এক কাপ চা হবে?'

'চা আ। এই সময় চা আ আ।'

ভেতর থেকে একটা বেড়াল ছুটে বাইরে চলে এল। ভয়ে ন্যাজ গুটিয়ে গেছে। তিনটে চড়াই উড়ে গেল ভেন্টিলেটার থেকে। অতিথি গৃহস্বামীর লজ্জা ঢাকতে পায়ের জুতো হাতে করে চোরের মত গুটি গুটি রাস্তায় বেরিয়ে এসে, মার ছুট।

দুজনে দেখা দীর্ঘদিন পরে। কথা হচ্ছে।

'অমরনাথ ঘুরে এলুম।'



'হে হে, খুব ভালো।'
'মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিলুম।'
'হে হে খুব ভালো।'
'ছেলেটা বিলেত গেল।'
'হে হে খুব ভালো।'
'মা হঠাৎ মারা গেলেন।'
'হে হে খুব ভালো।'

সবই ভালো। আজকাল কেউ কারুর কথা মন দিয়ে শোনে না। ভদ্রতার খাতিরে হে হে করে যায়। যান্ত্রিক হাসি। যান্ত্রিক বিস্ময়।

মেয়েরা যদিও বা প্রাণখুলে হাসেন, ছেলেদের হাসি যেন শুকনো ছাতু। আবার মেয়েদের বিস্ময় ও সহানুভূতি প্রকাশের ঘনঘটায় প্রাণ আছে কিনা বোঝা দায়।

'শ্যামা ডিভোর্স করেছে।'
'ও মা, তাই না কি, বলিস কি?'
'রমাদির ছেলে এবারেও পাশ করতে পারে নি।'
'ও মা, তাই না কি, বলিস কি?'
'শ্যামলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'
'ওমা তাই না কি, বলিস কি?'

মাঝ রাতে স্বামী বললে, 'গোপা, বুকে অসহ্য ব্যথা। আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি।'

'ওমা, তাই না কি, বলো কি?'

ভোরবেলা 'মেকানিক্যাল টি'। 'ওঠো চা।'

কে উঠবে! ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এল না।' পাশের বাড়ির প্রতিবেশী শুনে বলবেন, 'ওমা তাই না কি! মারা গেছে। দাঁড়াও, ডালে জল ঢেলে এসে শুনছি।'

অদৃশ্য হাত

হরবখত এমন এমন দৃশ্য চোখে পড়ে নিজের সব অহঙ্কার গাড়ির উইণ্ড স্ক্রিনের মতো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে পায়েব কাছে। এই খাচ্ছি দাচ্ছি মাস মাইনের বাবু হেলেদুলে অফিস যাচ্ছি, ছেলে বউ বগলদাবা করে কখনও সিনেমায় ছুটছি, কখনো থিয়েটারে, কখনো বউভাতে। এই সি ডি এসে টাকা রাখছি, পি পি এফে ঢালছি, ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ মেলাচ্ছি আর মানুষের দুঃখে ভাবহীন চোখে রসকষহীন আহা, আহা। পরমুহূর্তেই ঝোলা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছি বাজারে—ভেড়ির ট্যাংরা, আহা ভেড়ির ট্যংরা, প্রত্যেকটাব পেটে এক জোড়া ডিম। কত করে কিলো! চল্লিশ? কুছ পরোযা নেহি।

আমার না হয় কুছ পরোয়া নেহি, যেদিন দাঁত ছিরকুটে পড়ব সেদিন দেখা যাবে; কিন্তু এদিকে যাঁদের অচল অবস্থা তাঁদের দিকে কে তাকাচ্ছে: আমার তাকাবার সময় নেই, তেমন শিক্ষাও বাপের জন্মে পাইনি। খাবোদাবো ফূর্তিফার্তা করব। একটার জায়গায় এক ডজন প্যান্ট বানাবো। লন্ড্রিতে কাচতে দোব। হিসেব থাকবে না, গোটাকতক হারিয়েই যাবে। লিভ ট্র্যাভেল অ্যালাউন্‌স নিয়ে বেড়াতে যাব। ঠাঁই নেব কম্পানির হলিডে হোমে। কাগজ পড়ে উত্তেজিত হব—দেশ গেল, দেশ গেল। দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধবাব। 'প্রানা খবর কাগজ' এলে বউ বেচে দেবে সব দুশ্চিন্তা কিলো দরে। সেই টাকায় কিনে আনবে তিনটে তিন রঙের জর্জেট ব্লাউজ। দাম সাতান্ন টাকা। একবারের বেশি দুবার চা করতে হলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে—যম এত লোককে নেয় আমাকে কেন নেয় না।

আমার পকেটে ঘুরবে ভাজা খোলা ছাড়ানো চীনেবাদাম। পেট খালি হলেই জ্বালা করবে। ডাক্তার বলেছেন—সাবধান পেট একেবারে খালি রাখবেন না। আলসার হয়ে যাবে। স্রেফ ঠুসে যান। মুখে ফেলুন, কুচুর মুচুর চিবোন। গ্যাসট্রিক-জুস পেটের দেয়াল যেন খেয়ে না ফেলে। আক্রমণ করার খাদ্য যুগিয়ে যান।

আলোচনার বিষয়বস্তুটা কি? এত দাম দিয়ে চা কিনছি তবু নাকে কেন

ফ্লেভার লাগছে না ! কেন লাগছে না ? ছ'জনের ছরকম মত। একজন বলছেন—আরে মশাই সব চোর। আর একজন একশো আঠাশ টাকা কেজির কমে চা কিনলে নাকে সুবাস লাগবে না। দোকানদারের অভিমত—ঠিক মতো তৈরি হচ্ছে না। ঠিক পাঁচ মিনিট ভেজাবেন। ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট। দুধ একটু কম দেবেন।

সমস্যাটা কি ? রবিবার মাংসর দোকানে বিশাল লাইন। আর পারা যায় না মশাই ! নির্জনে কোথায় পাঁঠা বলি হয় বলতে পারেন !

সমস্যাটা কি ? না, ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছে না পাড়ার দোকানে। এদেশে আর বাস করা যায় না মশাই ! ছোটলোকের দেশ হয়েছে।

আন্দোলনের বিষয় কি ? আর কতকাল টোপর পরে পিঁড়েতে বসে বিয়ের প্রথা চলবে ! ধরো আর ঘরে তোল। বছর চারেক পরে চুলোচুলি করে চালচুলো ভেঙে ফেল।

এক মহিলা নিজের স্বামী সম্পর্কে বলছেন—লোকটাকে আমি অ্যাতো ঘেন্না করি ! গায়ে পা লাগলে কুঁকড়ে যাই। অথচ বছর না ঘুরতেই তিনি মা।

মধ্যবিত্তের দৈনিকে ডাক্তারের দপ্তরে জনৈকার প্রশ্ন—স্বামীর ভীষণ নাক ডাকে। অসহ্য। আগে তো জানা ছিল না। কোনও উপায় আছে ডাক্তারবাবু ! আর তো পারি না।



প্রবীণা পড়ে বললেন, আদিখ্যেতা। আমার কত্তার বাঘের মত নাক ডাকত, আবার ফুটবল খেলত। রোজই রাতে স্বপ্ন দেখত, বল নিয়ে গোলের কাছে পৌঁছে গেছে। মার লাথি। আমি খাটের তলায়। রেফারির বাঁশী বাজত। পেনাল্টি হত! বল আবার ধুলোটুলো ঝেড়ে ফিরে আসত খেলার মাঠে খাটে। তা মা জননী, নাক ডাকা যদি অসহ্যই লাগে কত্তার মুখে বালিশ ঠেসে ধর। নিঃশ্বাস বন্ধ নাক ডাকাও বন্ধ। ঝাড়া হাত পা হয়ে গেলি মা। নেচে বেড়া এলোকেশী হয়ে।

মধ্যবিত্তের সাপ্তাহিকে রূপচর্চার পাতায় থাক থাক প্রশ্ন। ষোড়শীর কি সমস্যা, ঘাম তেলে মা দুর্গার মুখ যেমন চকচক করে এত চেষ্টাতেও আমার মুখ কেন অমন হচ্ছে না! দাওয়াইও তেমনি—মুখটাকে প্রথমে গরমজলে হালকা করে সেদ্ধ করে নিন। তারপর নরম হাতে খোসা ছাড়িয়ে, কখনও গাজরের পুলটিস, কখনও শশার পুলটিস, কখনও বাদামবাটা, মধু, মাখম কাঁচা দুধ। এই হল রকমারী প্রলেপ। এরপর খাদ্য। সকালে আধ সের কমলা অথবা মুসাম্বির রস। প্রচুর তাজা ফল। দুধ, ডিম, ছানা, ঘি, মাখম, মাছ, মাংস। বসবাস—রৌদ্রালোকিত, পরিষ্কার বাতাস-সঞ্চালিত, মনোরম গৃহে। মনকে প্রফুল্ল রাখুন। কোনও রকম দুশ্চিন্তা চলবে না। দেখবেন অচিরেই মা দুর্গা।



তিনতলার দক্ষিণ খোলা ঘরে রূপচর্চা আর ওদিকে।

শ্যামলীর বাবা বছর তিনেক আগে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কম্পেনসেসানের হাজার পাঁচেক শেষ হয়ে গেছে কবে। বিধবা মা। ছোট ছোট দুটি ভাই, পাড়ার স্কুলে পড়ে। বড় ভাই অপ্রকৃতিস্থ। শ্যামলী সংসারের হাল ধরেছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ায়। সামান্য সামান্য মাইনে। কেউ দেয়। কেউ ঘোরায়। কেউ ছাড়িয়ে দেয় এক মাস পরে। শ্যামলী সপ্তাহে একবার র‍্যাশানের দোকানে লাইন দেয়। রোজ বাজার করে। যৎসামান্য। আলু, পটল, ঢ্যাঁড়সের বাইরে আর কোনও খাদ্য থাকতে পারে, প্রায় ভুলেই গেছে। কারুর না কারুর অসুখ লেগেই থাকে। শ্যামলী নিত্য সন্ধ্যায় হোমিওপ্যাথের চেম্বারে হত্যে দেয়। শ্যামলীর দিকে কেউ প্রেমপত্র ছোঁড়ে না। রকের ছেলেরা সিটি মারে না। বরং শ্রদ্ধাই করে। পারলে সাহায্য করে নানাভাবে।

অঙ্গ প্রদর্শনকারী রুমাকে যারা টিটকিরি মারে, ঘোরতর তামসিক অসীম ঘোষের গাড়ির পথে দাঁড়িয়ে যারা পথ আটকায় তারাই আবার যমুনার ছেলের চিকিৎসার জন্যে চাঁদা তোলে। কাঁধে করে নিয়ে যায় হাসপাতালে।

শিক্ষা কি কিছু নেবার আছে ? বইয়ের পাতা থেকে সোস্যালিজম তুলে নিতে হবে জীবনে। কে নেবে। দু চারজন পাগল পথে নেমে আসে। ঘর কইনু বাহির, বাহির কইনু ঘর—এই আদর্শে চলতে গিয়ে পরিবারকে পথে বসায়। তাদের গাড়ি হয় না, বাড়ি হয় না। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স শূন্য। পরিবারের কেউ অসুখে পড়লে ভরসা প্রাকৃতিক চিকিৎসা।

ভোরবেলা কারুর চোখের সামনে ধোঁয়া ছাড়ছে—ফিনফিনে কাপে দার্জিলিং চা। কারুর চোখের সামনে এলোমেলো বিশৃঙ্খল সংসার। কাল যা হোক হয়েছে, আজ কি হবে ! কারুর ভোর হচ্ছে নরম বিছানায়, কেউ উঠে বসছে ফুটপাথে।

বিশাল একটা লোমশ হাত আমাদের চোখের আড়ালে অপেক্ষা করে আছে হয়ত। একদিন হঠাৎ নেমে আসবে, এক ঝাপড়ে নামিয়ে দেবে যত ভণ্ডামি আর ঠাটবাট।

ফ্রিস্টাইল

আজকাল স্টাইলের যুগ। কত রকমের কেরামতি যে বেরিয়েছে! স্ত্রীরা স্বামীর নাম ধরে ডাকেন, তা ডাকুন আপত্তি নেই। তবে বয়েসের তফাৎ তো একটা থাকেই। প্রথামত স্বামীরা স্ত্রীর চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড় তে হয়েই থাকেন। আচ্ছা ধরা যাক বিয়ের আগে ভাব ভালবাসা ছিল। তা সেই সময়ে মেয়েটি ছেলেটিকে দাদা বলেই ডাকত। পল্টু দা, বিল্টু দা, যা হয় একটা নামের সঙ্গে দাদা লাগাত। বিয়ের পর দাদা অবশ্যই আর বলা যায় না। তাহলেও দোতলার বারান্দা থেকে রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকা স্বামীকে স্ত্রী যদি চিৎকার করে বলে—'চিদু আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরো প্লিজ।' কেমন লাগে শুনতে। অথবা প্রতিবেশীর বাড়িতে স্ত্রী খুঁজতে গেছে, 'শম্পাদি চিদু আছে' চিদু।'

অনেকে আবার এইভাবে বলেন—ধ্রুবরা তখন গোয়ালিয়রে ছিলেন। আমি কলকাতায়। অসুস্থ হয়ে চিঠি লিখলুম। ধ্রুব এলেন। বললুম, ধ্রুব তুমি আমার পাশে থাকলে তিন দিনে সেরে যাব। ধ্রুব আমার কপালে হাত রাখলেন।'

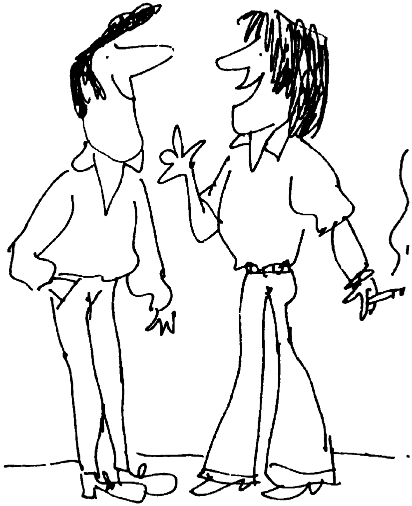
সেকালের নিয়ম ছিল, নামের সঙ্গে বাবুটাবু যা হয় একটা কিছু জুড়ে আপনি বলা। একালের স্টাইল আলাদা। বন্ধু বান্ধব যারা তুই তোকারির মধ্যে আসে না, তাদেরও বাবু বলা হয় না। 'সুনীল কাল বলছিলেন, কাঞ্চন এখন আমেরিকায় আছেন।' ভাল বাবা। যে যুগের যা নিয়ম।

প্যান্টের চোঙা পা ফুলতে ফুলতে এমন হল বাচ্চা ছেলে ঢুকে লুকিয়ে থাকতে পারে। প্যান্ট করাতে গেলে টেলার জিগেস করতেন—পায়ের ঘের কত নেবেন—এক টিন, না দু টিন!

তার মানে?

ঘেরের মধ্যে একটা বড় দুধের টিন ঢোকাবার মতো ফাঁদ চান না দুটো টিন।

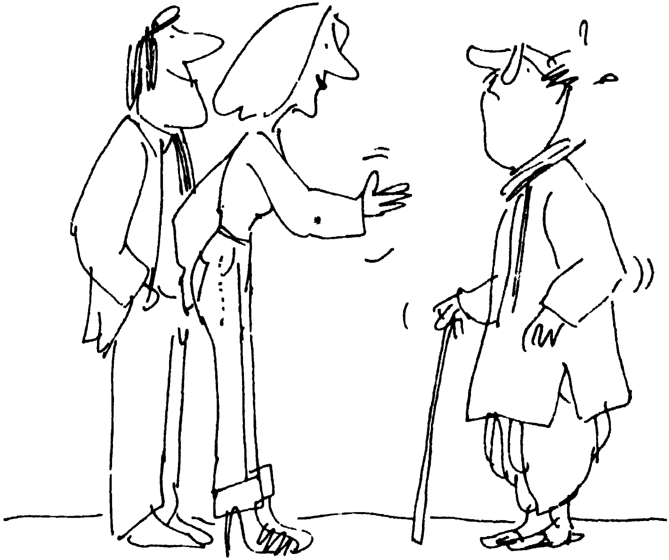
সেই ফাঁদালোর যুগ শেষ। আবার ফিরে এসেছে চোঙদার। মাঝখান থেকে টেলারদেরই পোয়া বারো। মেকিং চার্জ কোথাও পঞ্চাশ কোথাও পঞ্চান্ন। লাও এখন ঠ্যালা সামলাও। জামার কলারেও কেরামতি। চওড়া কলার। ডগ



কলার। এখন চলছে খাটো টুলটুলে কলারের যুগ। ইঁদুরের কানের মতো। প্যাণ্টে বোতামের ঘনঘটা আর নেই। ফাস্টনার। হ্যাঁচকা টানে খোল। হ্যাঁচকা টানায় বন্ধ করো। মাঝে মাঝে বেমক্কা জায়গায় কেটেও যেতে পারে। তখন আব্রু রক্ষার জন্যে সেলো টেপ লাগাও। যন্ত্রণার শেষ নেই। এক রকমের প্যান্ট বেরিয়েছে, ঝুলে বড়। পায়ের দিকে ফোল্ড লাগাতে হয়। এতকাল জামার আস্তিন গোটাতে হত, এখন প্যান্টের পায়া গোটাও। এই ধরনের প্যান্টে আবার নাট বল্টু লাগান থাকে। চামড়ার তাপ্পি। খেল যা জমেছে!

মা জননীরা কচাকচ চুল কেটে ফেলছেন। বিদ্রোহী মায়েরা পুরুষ শাসিত সমাজের ওপর খাপ্পা হয়ে কেশ কর্তন করে ফেলছেন। বিদূষীরা বব করতেন। আধুনিকাদের বয়কাট। কি সুন্দর দেখায়। মনে হয় বলি, চাঁদা মামা দেয় হামা। গায়ে রাঙা জামা ওই॥

ছেলেদের চুল নিয়ে অশান্তি এখনও চলেছে। বোম্বের বাগান থেকে হিরোরা এক এক কাটে বেরিয়ে আসছেন আর আমাদের ছেলেরা পাগল হয়ে যাচ্ছে। কখনও কপালে ঝুমকো। কখনও কানের পাশে ঝাঁপু। কখনও ঘাড়ের কাছে থুপ্পি। পাকাপাকি কোনও একটা সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় বেচারাদের কি অশান্তি! কে ছেলে, কে মেয়ে বোঝা দায়। 'সরি ম্যাডাম' বলে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম



সংশোধন সরি ম্যাড।' আবার ভ্রম সংশোধন—ম্যাডামের পুংলিঙ্গ তো ম্যাড নয়, 'সরি ল্যাড।'

মা বলবো না বাবা বলবো বোঝাই দায়। টাইট জিনস্ পরা পুত্রবধূ শ্বশুরমশাইকে প্রণাম করবে কি, নিচু হলেই তো ফেঁড়ে যাবে, তাই শেকহ্যাণ্ডেই দায় সারা—হ্যালো ফাদার।

এসো মা, অক্ষয় হোক মা তোমার সিঁথির, বলেই খেয়াল হল, কোথায় সিঁথি, কোথায় সিঁদুর! সবই তো গয়া গঙ্গা হয়ে গেছে। বিবাহিতা কি অবিবাহিতা বোঝে কার পিতার সাধ্যি! স্বামীর মৃত্যু তো হতেই পারে। একালের একটাই ভাল—সিঁদুর মুছতে হবে না, শাঁখাও ভাঙ্গতে হবে না। 'ধ্রুব মারা গেলেন।' কি আর করা যাবে। ছেলেদের দোজপক্ষ হত, এখন মেয়েদের তেজপক্ষও হয়। এমনও হয়, মনের মত হ্যাজব্যাণ্ড খুঁজতে গিয়ে সংসারই আর করা হল না। ওড়াউড়িই সার। এ ডালে, ও ডালে, শেষে মগডালে। সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

রাস্তায় বাবা, বাবা বলে ডাকতে লজ্জা করে। তাই ছেলে ডাকছে—প্রসন্নবাবু চলে আসুন ট্যাকসি ধরেছি। প্রবীণ প্রতিবেশী অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, 'কী রে নাড়ু, বাপকে নাম ধরে ডাকছিস'

নাড়ু অবাক হয়ে বললে, 'কেন, বাবা বলে কি মানুষ নয় !'

'যাক বাপকে যদি মানুষ ভেবে থাক তাহলে নাম ধরেই ডাকো।'

বৃদ্ধ বাপেদের আর দশ-বিশ বছর পরে যে কি অবস্থা হবে ! ছেলের মায়েরা তো এক হাতে কিনে আর এক হাতে বেচবেন। আর সেই ইনসপিরেশানে ছেলেরা গলায় গামছা দিযে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলবে, 'হ্যালো কমরেড টাকা ছাড়ো। আজ রোববার একটু ভালো খানাপিনা হবে।'

প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেত—করতে গিয়ে কাহিল অবস্থা। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে বুক কাঁপে। কথায় কথায় ধমক খেতে হয়, 'চুপ করো, তুমি কিছু বোঝ না।' সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মা পোঁ ধরবে—'সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই।' সব গৃহিণীই সুযোগ পেলে ভালো ডিপ্লোম্যাট হতে পারেন। দেশে বিদেশে বসিয়ে দাও অ্যামবাসাডার' করে। যেই বুঝলেন কত্তা এবার ঝলঝলে হয়ে এসেছে, তালি মারা কোট, অমনি তাঁরা উঠতি তারকা ছেলের পোঁ ধরেন—'তোর বাবার যেমন বুদ্ধি ! ওই বুদ্ধিতে চললে হালে আর পানি পেতে হবে না।' কত্তা শুনে মুচকি হাসেন আর মনে মনে ভাবতে থাকেন এ-কালের ডায়ালগে 'কি জিনিস তুমি ! চল্লিশ বছর ঘর করে বুঝেছি। আমার হাল আর আমারই পানি আর আমাকেই বলছ হালে পানি পাবে না ! এমন একটি মানোয়ারী জাহাজে চেপে প্রায় শেষ বন্দর অবধি চলে এলে, এখন রঙচঙে পানসি দেখে ধড়ফড়।'

আবার ছেলের কাছে ধাক্কা খেলেই স্ত্রী দল পালটান—কত্তার কাছে ছুটে এসে বলবেন—'তোমার আদরেই সব বাঁদর হয়েছে। আমার শাসনে থাকলে এমন হতো ?

কত্তা বলবেন—'পদু', বোস, বোস। এই বেতের চেয়ারে বোস। ওই নাও, চোখের সামনে এক চিলতে আকাশ। নাও কোরাসে এবার গান ধরো—উই আর অন দি সেম বোট ব্রাদার। এক নৌকার যাত্রী মোরা। যা হবার তাই হবে। এদিকেই যাও আর ওদিকেও যাও। উঠবে শেষে চিতেয়।

শ্রুতিনাটক

আজকাল শ্রুতিনাটক পাবলিক খুব খাচ্ছে।

খাবেই তো।

এ বাড়ির কথা কাটাকাটি ও বাড়িতে বসে শুনতে বেড়ে লাগে। মেজর সঙ্গে সেজর লেগেছে। বাপে ছেলেতে চলেছে। স্বামী স্ত্রীর টোকাটুকি। প্রতিবেশীর কান খাড়া। কেউ সেই সময় কথা বলতে এলেই ধমক, 'চুপ ! শুনতে দাও। বাজার ফাজার পরে হবে।'

মেজ বলছে, তুমি ভেবেছ তোমার কত্তা একটু বেশি রোজগার করে বলে সাত সকালে আগেই বাথরুম দখল করে বসে থাকবে ? তিন কোয়ার্টার্স হয়ে গেল। প্রথমে হচ্ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত। তারপর হচ্ছিল খেয়াল এখন চলেছে গজল, চুপকে চুপকে। আর সে বেচারা চা খেয়ে দম বন্ধ করে বসে আছে।

সেজ : একটু কি গো কত টাকা রোজগার তুমি জানো ! এ-হাত ও-হাত, ও-হাত, এ-হাত !

মেজ : আহা যেন কথাকলি ! আদিখ্যেতা। কত্তাকে বাথরুম থেকে বেরোতে বলো। বাড়িতে আরও পাঁচটা লোক আছে। তাদেরও কাজকর্মে বেরোতে হবে। বাপের বাথরুম।

এরপর ধারাবাহিক, কার বাপ, তোর বাপ তোর বাপ কার বাপ। শেষে বড় ভাই খবরের কাগজ ফেলে তেড়ে এলেন। লোকে বলে, বড় রাগে না, রাগে না। রাগলে রক্ষে নেই। সেই একবার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বউ মশারি ফেলতে পাঁচ মিনিট দেরি করেছিল বলে রেগে কুরুক্ষেত্র। 'কেন তুমি মশারি না ফেলে পাশের ঘরে মায়ের সঙ্গে হেহে করছিলে ?' ইনসাল্ট। আমি থাকবো না। নো, নেভার। চল্লুম।'

রাত বারোটায় জামাই বলে বাগনান থেকে কলকাতার বাদুড়বাগানে যাবে। বড় শালার বেশি বুদ্ধি। শোবার ঘরে শেকল তুলে দিলে। বড়র রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না। একেবারে ষাঁড়ের গোঁ। সাত বাই চার মাপের গুল বসানো গোটা দরজা এক ঝটকায় ভূমিসাৎ।

সেই বড় রণাঙ্গনে নেমে এসেই বিশাল এক চিৎকার ছাড়লেন। টার্জান দি এপ-ম্যানের মতো। সারা পাড়া পুলকিত। খেপা খেপেছে।

বাড়িতে বাড়িতে অষ্টপ্রহরই শ্রুতিনাটক চলেছে। মঞ্চ নেই। শ্রোতাদেরও আদর করে কার্ড পাঠিয়ে ডাকা হয় না। বিনা পয়সায়, বিনা আমন্ত্রণে যে পার শুনে যাও। তবে একটাই মুশকিল, কখন কোন বাড়িতে শ্রুতিনাটক শুরু হয়ে যাবে আগে ভাগে জানার উপায় নেই। আচমকা শুরু। অনেকটা সর্দির মতো। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ গোটা চারেক হাঁচি। ব্যস সর্দির আক্রমণ।

ঢং করে ঘণ্টা বাজল।

না ঘণ্টা নয়। এই শহরেই এক মজার বাড়ি আছে। সে বাড়িতে যে কোন মুহূর্তে যে কোনও ঘটনা ঘটতে পারে। ওই যে ঘণ্টার মতো শব্দ, ওটা হল যাত্রা বা মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হবার ঘোষণা। অবসরভোগী কর্তা জলের গেলাস ছুঁড়লেন, এইবার আরম্ভ হবে একটানা গর্জন। যেন ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিন স্টেশানে দাঁড়িয়ে স্টিম ছাড়ছে। একটু আগে টিভি বেতারের শেষ অনষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। লতার কান্না, কিশোরের প্রেমধারা থেমে গেছে। পাড়ার শেষ দোকান, ময়রামশাই ঝাঁপে লাঠি মেরেছেন। এমন সময় আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার—বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও। নিকালো, আভি নিকালো।

বামা কণ্ঠ : তুমি নিকালো। এ আমার শ্বশুরের সম্পত্তি। ঝাড়া একটা বছর



আমি তাঁর অসুখের সেবা করেছি।

মাথা আমার কিনে নিয়েছো ?

হ্যাঁ নিয়েছি। তোমার কেন, তোমার চোদ্দ পুরুষের মাথা আমি কিনে নিয়েছি।

মুখ সামালকে।

কেন তোমার ভয়ে ?

গেট আউট।

কার ঘাড়ে কটা মাথা, আমাকে গেট আউট করে। বেইমান কাঁহাকা।

মাস্তু, মানতুউ। ইসকো বিল্লিকা মাফিক বাহার ফেকদো।

ছেলে : কি হচ্ছে তোমাদের রাত বারোটার সময়। সারাদিনের পর একটু ঘুমোতে দেবে।

মা : [মুখ ভ্যাংচে] মাস্তু, মাস্তু। নিজের মুরোদে কুললো না ? এ বাড়ি আমার।

কত্তা : তোমার বাড়ি ? হোয়ার ইজ দি ডিড। দলিল কাঁহা ?

মা : দলিল আমার মুখে।

ছেলে : আঃ মা তুমি থামবে ?



মা : কেন আমি থামবো ? আমি কি ছারপোকা যে নিত্যি বুড়ো আঙুলের নখে টিপবে ?

ছেলে : তবে হুলো-হুলির মত ঝগড়া করে মরো।

কত্তা : মান্তু মুখ সামালকে।

ছেলে : খামোশ।

কত্তা : দাঁত খুলে নোব ওয়ান বাই ওয়ান।

ছেলে : সব করবে। বসে বসে খাচ্ছো আর সারাদিন ভ্যানতাড়া করছ ?

মা : মান্তু। মুখ সামলে। নিজের বাপের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় শিখলি না এখনো ?

ছেলে : আরে যাও।

মা : এবার ধরে একদিন জুতোবো।

ছেলের বউ : চেষ্টা করে দেখুন না। হিম্মত কতখানি ?

মা : আরে যাঃ, মান্তুকে তুমি পেটে ধরেছ, না আমি ধরেছি।

বউ : এর মধ্যে পেট আসছে কেন ?

মা : তোমার মুখে ঝ্যাঁটা।

বউ : আপনার মুখে জুতো।

মা : মান্তু সামলা।

ছেলে : নিজের সম্মান নিজের কাছে।

মা ধরা গলায় : ওরে তুই এত বড় কথা বলতে পারলি ? তোকে যে আমি দশমাস দশদিন পেটে ধরেছিলুম শয়তান। বল বউ আগে, না মা আগে। বল। আজ স্পষ্ট করে বল।

ছেলে : বউ আগে।

মা : তাহলে, তাহলে, শুনলে বুড়োদামড়া, মাগ আগে মা পরে। বুঝলে মাণিক ? ছেলেকে দেখে শেখ। বউমা তোমার সেই গানটা এইবার ধরো—দুজনে দেখা হলো মধুযামিনীরে—এসো কত্তা শুয়ে পড়ো। ভেবে দেখ শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর !

হাওয়া

ঈশ্বরের হাতে কলকাঠি। তিনি নাড়াচ্ছেন। পৃথিবী নড়ছে। আর বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে সুতো। তাঁরা নাচাচ্ছেন আমরা নাচছি।

ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়েছিলেন। মহাভারতের পাতায় রঙীন ছবি দেখে শিশুর চোখে জল আসত। আহা পিতামহের না জানি কত কষ্ট! তখন কি আর জানতুম। এখন জেনেছি। চীন থেকে ভারতীয়রা আকুপাংচার শিখে এলেন। আর অমনি আমরা জেনে ফেললুম, কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে ভীষ্মের আকুপাংচার পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলছিল।

চীনে বাড়ি থেকে জুতো কেনার রেওয়াজ একসময় খুব প্রবল হয়েছিল। তখন মোল্ডেড সোল বেরোয়নি। পিভিসিরও চল ছিল না। সব চামড়া। দামী জুতোয় কিড, সাধারণ জুতোয় কাফ। কম দামী জুতো পায়ে পরে দু'চারবার ঘোরাঘুরির পরই তলাটা হয়ে যেত ছোটনাগপুরের বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলের মতো। কুঁচো চামড়া পাশাপাশি সাজিয়ে সুকতলা সাঁটা। কাঁটা পেরেকের যথেচ্ছ ব্যবহার। সেই কুঁচো চামড়া উল্টেপাল্টে ঢেউ খেলে যেত। খোঁচা মেরে উঠত কাঁটা পেরেক। পেটাপিটি করেও বাগে আনা যেত না। পাদুকা মনে হত পদেপদে জুতো মারছে।

তখন বুঝিনি। এখন সমঝে গেছি, ও সব জুতো ছিল আকুপাংচার জুতো।

সেই জিনিসই এইবার এসে গেল। সাড়ম্বরে। সবিজ্ঞাপনে। পরিধানে অনেক ফলপ্রাপ্তি। দাম দেখে যাঁরা ভয়ে পেছিয়ে যাবেন, তাঁদের জন্যে সহজ হোম মেড ব্যবস্থাও আছে। কবিরাজী পদ্ধতি অথবা টোটকার মতো।

ঈশ্বর সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। চোখ-কান খোলা রাখলেই হল।

কাঁঠাল যে আকুপাংচার আমরা কি জানতুম। চোখের সামনে ঝুলে আছে। ফলনও যেমন আয়তনও তেমনি। চীন থেকে বিজ্ঞানটি আসার আগে পর্যন্ত, কেউ ভেবে এসেছেন সুখাদ্য, কেউ ভেবেছেন অখাদ্য। খাদ্যাখাদ্যের বাইরে এর যে একটি বিজ্ঞান আছে সেই বিশেষ জ্ঞানটি চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দেয়নি আমাদের।



এইবার আর আমাদের পায় কে ! আকুপাংচার গাছে ঝুলছে।

খোসাটি নিখুঁত করে ছাড়িয়ে পায়ের মাপে কেটে মাত্র দশ টাকা দামের একটা হাওয়াই চপ্পলে আধুনিক আঠা দিয়ে [যাতে মানুষের মাথা ছাড়া সবই জোড়া যায়] জুড়ে, সস্ত্রীক সপরিবারে, শহরের বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে প্রাতে এক চক্কর ভ্রমণ সেরে নিন।

অতঃপর মহিলারা নেমে পড়ুন রূপচর্চায়।

পুরুষরা কম্বল বিছিয়ে বসে যান যোগাসনে।

কাগজে, টিভিতে, বিজ্ঞাপনে সর্বত্র রূপচর্চা। এমন রূপসচেতনতা কোন জাতের আছে ! রূপচর্চায় আজকাল কি না লাগছে ! ঘি, তেল, নুন, লঙ্কা, গাজর, টোম্যাটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ, লেবু, দুধ, দই, শসা, ময়দা, মধু। পুরো হেঁসেলটাই গায়ে চাপিয়ে বসে থাক।

এক ফর্মুলায় বলা হচ্ছে, দই, দই-ই রূপের উৎস।

প্রথমে, আধসেরটাক দই মাথায় চাপাও। থেবড়ে, থেবড়ে। এইবার এক সের গাজর রস করে দই মিশিয়ে সর্বাঙ্গে লেপে দাও। প্রচুর ঘিয়ের ময়ান দেওয়া ময়দার তাল মধু মাখিয়ে মুখে ঠেসে ধরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়, তারপর একটা পেনসিল দিয়ে নাকের জায়গায় দুটো গর্ত করে, পড়ে থাক যতক্ষণ পারো। এরপর এক বালতি ছানার জলে স্নান সেরে এক বোতল গোলাপ জল



মেখে নাও। ফল। হেসে উঠবে, হেসে। কে ? রূপ। জ্যোতি বেরবে। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে লোক গাড়ি চাপা পড়ে যাবে। পুলিসের কাজ বেড়ে যাবে।

আমরা কম রসিক ! যাকে যে ভাবে নাচানো যায়।

ছাঁচি পেঁয়াজের রস মাথায় মাখলে চুল ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। তিন দিন মাখার পর বাসে ট্রামে উঠতে দেয় না। উঠলেও নামিয়ে দেয়। বলে, রথের মেলায় যান মশাই, পেঁয়াজি এখানে চলবে না। পেঁয়াজি-স্ত্রীর ভয়ে কত্তা রাস্তাতেই রাত কাটান।

আবার রসুনে কত্তার ভয়ে গৃহিণী বাপের বাড়ি থেকে ফিরতে চান না।

আমাদের এই দুঃখের জীবনে মাঝে মাঝে একটা বাতাস বয়ে যায়। হঠাৎ এল রসুন। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই এক কোষা রসুন খেয়ে নাও। ভীষণ উপকার। হার্টের অসুখ হবে না, বাত পঙ্গু করতে পারবে না, পেটের গোলমাল সেরে যাবে, আর যৌবন হবে চিরস্থায়ী। চির যুবক হয়ে, ফুলে, ফুলে, ঢুলে, ঢুলে, হুঁ হুঁ।

এই বাতাস এত জোরে বয়েছিল যে, 'নদে ভেসে যায়'। রসুনের মুক্তো বেরলো। এক কোয়া রসুনের জন্যে দোকানে দোকানে বায়না। বাতাস ডাক্তারবাবুদের গায়েও লেগেছিল। রুগীর বুক পরীক্ষার জন্যে সামনে ঝুঁকেছেন, গরম নিঃশ্বাসে রসুনের সুবাস ! কোথাও রুগী বাপ বলছেন, কোথাও ডাক্তার।

যেখানে রতনে রতনে, সেখানে কি উচ্ছ্বাস—অ্যাঁ, ধরেছেন ? হ্যাঁ ধরেছি । আর কি ! অমর হয়ে গেলুম আমরা ।

গোটা রসুনের কোয়া জল দিয়ে কোঁত । সে কি সহজে নামতে চায় ।

হাওয়ার একটা সুবিধে । বেশি দিন থাকে না । কেটে যায় । রসুনের মোগলাই বাতাস প্রায় কেটে এসেছে ।

বিশাল লাইন । কি ব্যাপার ! কি হচ্ছে ভাই ওখানে ? বিখ্যাত যোগ শিক্ষকের আখড়ায় লাইন পড়েছে । বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, কিশোর, কিশোরী । ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাড়া । যোগে আর হোমিওপ্যাথিতে সময় লাগে । যোগ তো আর ডাম্বেল বারবেল নয় । থেরাপি । শরীরটাকে একেবারে হাতের মুঠোয় এনে দেয় ।

এই বিখ্যাত যোগের আখড়ায় দেখেছিলাম—এক কর্নেলকে বদ্ধপদ্মাসন করান । বেশ জবরদস্ত আসন । পদ্মাসনে বসুন । দু'জন শিক্ষক ঠ্যাং দুমড়ে মুচড়ে কোনও রকমে পদ্মাসনে স্থিত করালেন । হাঁটু উঠে যাচ্ছে বলে মাঝে মাঝে চেপে ধরা হচ্ছে । এইবার শুরু হল পদ্মাসনকে বদ্ধ করার কেরামতি । ডান হাত পিঠের পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ধরতে হবে, আর বাঁ হাত ঘুরিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ।

ধরুন, ধরুন করে তো ধরিয়ে দেওয়া হল । পা মুড়ে, আঙুল ধরে, বুক চিতিয়ে, ঠোঁট চেপে, চোখ ঠিকরে বদ্ধপদ্মাসনে আসীন কর্নেল । লম্বা চেহারা । শিক্ষক সময় গুনছেন, এক, দুই, তিন, তিরিশে পৌঁছে শিক্ষক বললেন, 'ছেড়ে দিন' ।

কর্নেল হাত ছাড়ামাত্রই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত দুটো পা সামনে ছিটকে গেল । সেই পদাঘাতে শিক্ষক ছিটকে গিয়ে পড়লেন দূর কোণে । সেখানে টুলের ওপর ছিল জলের কুঁজো । যোগাসনের পর শবাসন বিধেয় । শিক্ষক মেঝেতে শবাসনে সংজ্ঞাহীন । কুঁজোর জলে ঘর ভাসছে । আর কর্নেল বলছেন—আই অ্যাম সরি । সো সরি । অফুলি সরি ।

আপনাতে আপনি থেকো মন

বর্শার খোঁচার চেয়ে বাক্যের খোঁচা বেশি মারাত্মক। অস্ত্রের আঘাত ওষুধে সারে। কথার খোঁচা সারে না। সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। আর এই খোঁচা মারা অভ্যাস হয়ে গেলে সব কথাই বাঁকা করে বলতে ইচ্ছে করে।

ছেলেমেয়েকে, 'ওরে পড়তে বোস' বললেই ল্যাঠা চুকে যায়। তা না বলে একটু বাঁকা করে বলা হোল, 'একটু লেখাপড়া করলে কি এমন ক্ষতি হয়!'

স্ত্রীকে, 'এক গেলাস জল দাও' না বলে, বলা হল, 'এক গেলাস জল পাওয়া যাবে?'

সব সংসারেই সারাদিন কথার তালগোল চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক উপদেশ সংসারী মানুষের জন্যে রেখে গেছেন। কোনওটিতেই আমরা কর্ণপাত করিনি একটি ছাড়া, সেটি হল, 'ফোঁস করবি। ফোঁস ছাড়িসনি!' আমরা সারাদিন শুধু ফ্যাঁস ফোঁসই করে চলেছি। সংসার যেন সাপের গর্ত। এর ফ্যাঁস, ওর ফোঁস। পান থেকে চুন খসলেই লেগে গেল ধুম ধাড়াক্কা।

আজকাল হাত দেখানো আর ছক দেখানোর একটা হিড়িক পড়ে গেছে। আর প্রায় মোটামুটি সকলেই জ্যোতিষী। ব্যাপারটা এমন কিছু ঘোরালো বা সাংঘাতিক নয়। হাত কি ছক পাতা মাত্রই বলতে হবে, কিসের এত দুশ্চিন্তা! অত চিন্তা করেন কেন? চিন্তার কি আছে! আরে মশাই ঈশ্বরে সব সমর্পণ করে দিন। তবে হ্যাঁ তিনটে মাস একটু সাবধান। অবশ্য শত্রুরা আপনার টিকিও ছুঁতে পারবে না। যতই পেছনে লাগুক, শেষ পর্যন্ত হটে যেতে হবেই।

এর পরেই বলতে হবে, সঞ্চয় তেমন হবে না, যত্র আয় তত্র ব্যয়। খরচের হাত। চেষ্টা করলেও সঞ্চয় করতে পারবেন না। এক একটা দমকা খরচ আসবে, সব বেরিয়ে যাবে। যাকে যাকে ধার দেবেন সে আর উপুড় হস্ত করবে না। টাকা দেবার ক্ষমতা আপনার আছে, টাকা আদায় করার ক্ষমতা আপনার নেই।

তারপর সাবধানে ফিসফিস করে বলতে হবে চলাফেরার সময় একটু সতর্ক হবেন। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে। আর ভিড় থেকে দূরে। গোলমালের মধ্যে একদম

যাবেন না। যা হচ্ছে হোক, আপনার কি ? কৌতূহল দমন করতে শিখুন।

হ্যাঁ, পেট। পেটের দিকটায় একটু গোলমাল আপনার লেগেই থাকবে। ঘি, তেল, ঝাল, মশলা, হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাওয়া এড়িয়ে চলুন। যেখানে সেখানে জল খাবেন না বরং চা খাবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। অম্বল, মাথাধরা, মাথাধরা, অম্বল একেবারে জেরবার করে দেবে। ছেলে মেয়ে নিয়ে অশান্তি হতে পারে। সব বড় হচ্ছে তো বেশি খিট্ খিট্ করবেন না। উদাসীন হবার চেষ্টা করুন।

এই জায়গায় একটু গীতার বাণী পাঞ্চ করা যায়—উদাসীনবদাচরেত।

সব শেষে বলতে হবে, কথায় কথায় অত রেগে যান কেন ? রাগই আপনার পরম শত্রু। রেগে গিয়ে দুমদাম তুড়ুম ঠোকেন, বাড়ির আবহাওয়াও বিষিয়ে যায়, শত্রুর সংখ্যাও বেড়ে যায়। নিজেকে সংযত রাখুন।

দেখা যাবে নব্বই শতাংশ মিলে যাচ্ছে। আমরা তো রেগে রেগেই শেষ হয়ে গেলুম। মনের এত উত্তাপ। বাইরে বালতি বালতি জল ঢাললে কি হবে ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমরা দাঁত কিড়মিড় করছি।

যিনি কলতলায় বাসন মাজছেন, তাঁর থালা, গেলাস, কাপ, ডিশ, ধরা আর রাখার শব্দে মালুম হয়, সদা সর্বদাই ফোরফর্টি ভোল্ট হয়ে আছেন। ভালো কাপডিশের সেট অধিকাংশ বাড়িতেই কাঁচের আলমারিতে তোলা থাকে. শো পিস হিসেবে। তেমন বিশেষ কেউ এলে খাতির করে নামান হয়। খাতিরের অতিথি চলে যাবার পর কর্তা বুনো ওলের মতো মুখ করে নিজেই কাপ ডিশ ধুতে



বসে যান।

শান্ত বাড়ি, পাখির ভেসে আসা ডাক, তন্ময় লেখাপড়া এসব আপাতত দূর স্বপ্ন। বাইরে শহর ফাটছে, ভেতরে সংসার ফুটছে, এই তো একালের চিত্র। সকলেরই মুখে এক লেখা জীবনে অরুচি ধরে গেল।

রাস্তায় গাড়ি ছুটছে, ধ্যাড়াং ধ্যাড়াং। এই উঠছে, এই নামছে। সমতল বলে কিছু নেই। ছোট গর্ত, বড় গর্ত, জল, ক্যাদা। এক একটা এক এক আকৃতির, যেন অ্যামিবা. প্রোটোজোয়ার গাঁথা মালা। সর্বত্রই গেলো গেলো আর্তনাদ। কেউ পড়ছে, কেউ উঠছে। কেউ টেঁসে যাচ্ছে। কেউ কর্মস্থলে যেতে গিয়ে সোজা হাসপাতালে। সেখানে বেড নেই। বাথরুমের পাশে পড়ে খাবি খাচ্ছে। সেখানেও লাঠালাঠি, খুনখারাপি। ওয়ার্ডের চারপাশে বেয়নেট চলছে। ডাক্তার ছুটছেন পেছনে ডাণ্ডা তুলে তাড়া করেছে ক্লাস ফোর ইউনিয়ান। এই পরিবেশেই সার্জারি হচ্ছে। রক্ত দিয়ে মনে হচ্ছে ব্লাড গ্রুপ মেলেনি। হেপাটাইটিস নিরোধ সেমিনার হচ্ছে একদিকে আর এক দিকে নর্দমার জলে জনপদ ভাসছে। ফুলের গন্ধে মানুষ নাকে রুমাল চাপা দিচ্ছে, পচাগন্ধেই নাক অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সবই পচা। মাছ পচা, মাংস রসা, আলু ধসা, পটল ভ্যাপসা, জীবন দরকচা। কোথাও শান্তি নেই। দেবালয়ও দানবালয়। চারপাশে কয়েক শো ফুল, বেলপাতা আর চিনির ড্যালার দোকান। চা, তেলেভাজা, চুল্লুর ঠেক। হাত ধরে, আঁচল ধরে টানাটানি, 'এখানে এখানে'। ভিখিরিদের খিস্তি। লপেটা লক্কারা টুনিলাইটের মত চোখ নিয়ে শিকারের সন্ধানে লাট খাচ্ছে। নিভৃত কোণে ধ্যানস্থ হবে



ভেবেছিলে ! সেখানে নববৃন্দাবন লীলা। নাটমন্দিরে নাম হচ্ছে যেন ডাকাত পড়েছে। ভক্তি দিয়ে ধরতে সাধনা চাই, তার চেয়ে চিল্লে ঈশ্বরের কান ফাটিয়ে দি। দর্শন আর পুজো, যেন আধুনিক মোটর কারখানা ! লাইন। হাতে হাতে চ্যাঙারি ! ধূপ ধোঁয়া ছাড়ছে। মন্দিরে মোতায়েন কয়েকজন পূজারী। যেন রোবট। চ্যাঙারি হাতে হাতে ভাসতে ভাসতে ডানপাশ দিয়ে ঢুকে গেল, আয়তনে ক্ষীণ হয়ে বাঁপাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে ফিরে এলো। এক ধাক্কা, লাইন থেকে আউট। বেরো ব্যাটা। —মায়ের দিকে অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার কি আছে। আমরা আছি না পেছনে। নাটমন্দিরের ধুম ধাড়াক্কা, কোনও কোনও ভক্তের ষাঁড়ের গলায় মা মা চিৎকার। ঝুলন্ত ঘণ্টায় পিলে চমকানো চাঁটি। এরই মাঝে সেবায়েতের ভাগলপুরী গাই ন্যাজ তুলে এক নাদা নামিয়েই ফোয়ারা ছেড়েছে। ওপাশে পকেটমার পেটাই হচ্ছে।

এই টেনশানে লাইনে দাঁড়ানো শান্তশিষ্ট ভদ্রমহিলা ফেণ্ট হয়ে যাবার মতো হলেন। ধীরে ধীরে স্লোমোশানে পড়ে যাচ্ছেন হাঁটু ভেঙে। সবাই দেখছে, কেউই ধরার চেষ্টা করছে না। ধরাধরির ব্যাপারটা এখন ওপরতলায় চলে গেছে। আমরা চাকরির জন্যে ধরতে পারি, ফ্ল্যাটের জন্যে ধরতে পারি, ভাল স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তির জন্যে ধরতে পারি, রেলের রিজার্ভেশানের জন্যে ধরতে পারি, খেলার টিকিটের জন্যে ধরতে পারি, ধরতে পারি প্রোমোশানের জন্যে, মেয়ের বিয়ের জন্যে। অসুস্থ হয়ে কেউ পড়ে যাচ্ছে, তাকে ধরবে বাঙালী ! রামঃ। বরং ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন দশাসই এক মহিলা। পড়ন্ত মহিলাকে এক দাবড়ানি দিলেন, 'কেন এসেছেন আপনি ? আপনার হিস্টিরিয়া আছে।'

মহিলা পদতলে ফ্ল্যাট। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'আমার হিস্টিরিয়া নেই।'

দশাসই মহিলার দাবড়ানি, 'চোপ্, মিথ্যে কথা। আমি নার্স। আমি বলছি হিস্টিরিয়া। আবার কতা ?'

তাহলে শেষ ভবিষ্যৎবাণী, অ্যাস্ট্রলজির শেষ কথা, 'আপনাতে আপনি থেক মন যেও নাকো কারো ঘরে।' শুধু হিসেব করে যাও, কবে খালাস পাবে !

টাকে চাঁটি ফুঁ

আউপাতালে মানুষদের নিয়ে বেশ মজা। এই দুঃখের সংসারে এক একজন এক একটি আনন্দের খনি। বেশ বসে আছেন। গল্প গুজব চলছে। হঠাৎ ভুরু কুঁচকে, এক মুখ উদ্বেগ নিয়ে বললেন, 'গলার কাছটা কেমন যেন জ্বালাজ্বালা করছে। কি হোলো বলো তো, অম্বল!'

সবাই অমনি জেরা শুরু করলেন, কি রকম জ্বালা ? মুখের ভেতরটা শুকনো শুকনো লাগছে কি না! গলার কাছে একটা পুঁটলি মতো হয়ে আছে ?

সবই প্রায় মিলে গেল। অতএব অম্বল। সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান শুরু হল, অম্বল কেন হল!

ওই যে চা। চা নয় তো মিছরির পানা। চুমুক দিয়েই বুঝেছি, ব্যাটা ভোগাবে।

আমরা তো সবাই চা খেলুম! কারুর কিছু হল না। তোমার কেন হল ? আগে থেকেই তোমার হয়েছিল।

তাহলে ওই মাছের ডিমের বড়া। বললুম, খাব না। খাও খাও করে গোটা চারেক গিলিয়ে দিলে।

অ্যাঁ, মাছের ডিমের বড়া! পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কার কুঁচি ছিল ?

অতি করুণ উত্তর, হ্যাঁ ভাই ছিল।

ওই বড়াই হল কালপ্রিট। একে বর্ষাকাল, তার ওপর মাছের ডিম, তাইতে আবার পেঁয়াজ সঙ্গে লঙ্কা। এই সব মানুষ আবার সমস্ত সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। পকেটেই ডিসপেনসারি। স্ট্রিপ বেরলো। একটি অম্বলমারা বড়ি সামনের দাঁত দিয়ে কুট কুট করে খেয়ে ফেললেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে এক ঢোক জল।

আলোচনা হচ্ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি। বিমান দস্যু, অন্তর্ঘাত। সব ভেস্তে গেল। *অম্বল হয়ে গেল বিষয়বস্তু। অম্বল কেন হয়। সায়েবদের কেন* অম্বল হয় না।

তোমাদের বাড়িতে কি সরষের তেল ?

হ্যাঁ ভাই সরষের তেল।

মরবে। ঝাড়ে বংশে মরবে। সরষের তেল ছাড়। সরষের তেল আজকাল হয় না। সুইচ ওভার টু বাদাম তেল।

বাদাম তেলে মাছ তেমন জমে না।

সবই অভ্যাসের ব্যাপার রে ভাই। সারা ভারতবর্ষে বাঙালী ছাড়া সরষের তেল কেউ খায় না।

বেস্ট হল, তেল না খাওয়া। সারা জীবন সেদ্ধ সেদ্ধ খেয়ে যাও, শরীর একেবারে ফিট।

সেদ্ধ! অসম্ভব। তার চেয়ে উপোস ভালো। সব সওয়াতে হয়। অত বাছবিচারে শরীর আরও গোলমাল করে।

সায়েবরা কি করে অম্লান বদনে সেদ্ধ খায়!

বেশী সায়েব সায়েব কোরো না। আমরা বাঙালী।

নাঃ অ্যান্টাসিডে কিছু হল না। আবার তাঁর খুঁতখুঁতুনি।

তাহলে তোমার সর্দি হবে। ঠাণ্ডা লেগে গেছে। ঠাণ্ডা জলে চান করো না কি?

বারো মাস। এবেলা ওবেলা।

ব্যাস, দেখতে হবে না। ঠাণ্ডা জলে কেউ চান করে! অলওয়েজ ইউস টেপিড ওয়ার্ম ওয়াটার। এরপর তোমার বাত হবে। হাঁপানি হবে।

যাঃ ঠাণ্ডাজলের মতো জিনিস আছে! মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনের ওই শীতে ভোরবেলা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন।

আরে ভাই গান্ধী ইজ গান্ধী। রামে আর রামছাগলে তুলনা। ভালো যদি চাও ঠাণ্ডাজলে চান ছাড়। সঙ্গে দু চার চামচ নুন মিশিয়ে দিও। জীবনে বাত হবে না।

ঠাণ্ডা জলে চান করতে পার তবে চানের আগে সারা শরীরে ভাল করে সরষের তেল মাখবে।

না না, ওসব গেঁয়ো পরামর্শ। এখনকার তেল, সারা গায়ে ইরাপসান হয়ে যাবে।

কোনও কালে বাঙালীর মতের মিল হয় না। বেঁধে গেল তর্ক। ঠাণ্ডাজল ভার্সাস গরমজল। মিটমাট হয়ে গেল। রফা হল, চৈত্র বৈশাখে ঠাণ্ডা জল, বর্ষা, শরৎ, শীত গরম-ঠাণ্ডা জল।

তাহলে এই গলাজ্বালার জন্যে কি করা যায়?

নুনজলের কুলি। গার্গল। গরম গরম বার তিনেক।

নুন জলের চেয়ে ভালো গরম চায়ের লিকার।

নুন জল আর চায়ের জলে বেশ কিছুক্ষণ জল-ঘোলার পর সিদ্ধান্ত মিলিয়ে মিশিয়ে কুলি। এর হাফ ওর হাফ।

এই গার্গল বা কুলি শুনতে যত সহজ, করা তত সহজ নয়। যে কোনও সংসারেই সপ্তপদী রান্না ঠিকই হয়ে যাবে, হবে না নুনজল। চায়ের জলের সঙ্গে হবার কথা ছিল ভুল হয়ে গেছে। এখন ভাত চেপেছে। ভাতের পর ডাল চেপেছে নামানো যাবে না। তারপর ? তুমি তো বাজার চলে গেলে। অফিসে যাবার জন্যে তাড়াহুড়ো বেরোতে গিয়ে শোনা গেল, তোমার নুনজল।

নুনজল ?

কখন করে রেখেছি। ঠাণ্ডা হয়ে গেল তো!



বলবে তো !

বলব কি ? তুমি দাড়ি কামাচ্ছ। তোমার পাশে রেখে এলুম।

এখন আর সময় নেই। এখন আর সময় নেই। ব্যাগে ভরে দাও।

এই ব্যাগ এক মজার জিনিস। কি না থাকে এতে! পল্টুর বুক লিস্ট। সুতপার কোষ্ঠী। বিল্টুর পায়ের মাপ। রমলার মেয়ের ফ্রকের মাপ। নিত্যানন্দবাবুর ছেলের বিয়ের চিঠি। ইলেকট্রিকের বিল। মায়ের চরণের ফুল। আজ পর্যন্ত ডাক্তারবাবুরা যত প্রেসক্রিপসান করেছেন, তার তাবড়া। মুদিখানার ফর্দ। দাঁড়াভাঙ্গা চিরুনি। খরগোসের মুখ আঁকা টিফিনের কৌটো। তাতে দু পিস পাঁউরুটি, একটা পায়রার ডিমের মতো মুরগির ডিম সেদ্ধ। পাঁউরুটিতে মাখমের সঙ্গদোষ। কারণ একশো মাখমে মাস চালাবার হুমকি। ফলে বুদ্ধিমতী গৃহিণী সেঁকা দু পিস রুটি মাখমের চৌকোর পাশে রেখে, মনে মনে গীতার শ্লোক আওড়ান, সঙ্গাৎ সঙ্গদোষ। যার সঙ্গে থাকবে তার স্বভাব পাবে।

চাক্‌রে মানুষের দুটি স্ত্রী। স্ত্রীলিঙ্গ স্ত্রী গৃহে। তিনি সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি ধারণ করে গৃহে বসে আছেন। আর হাতে এই ক্লীব লিঙ্গ ব্যাগ। স্ত্রী যতই প্রাচীনা হোন ফেলার উপায় নেই। ব্যাগও তাই। ন্যাদন্যাদে, থ্যাসথ্যাসে হলেও তার ওপর একটা নির্ভরতা জন্মে যায়। সেই গানের লাইনের মতো, যার কেহ নাই, তুমি আছ তার। স্ত্রীদের মধ্যে যেমন আধুনিকা আছেন। ব্যাগের জাতেও আধুনিক ঢুকে পড়েছে। ব্রিফকেস। আধুনিকারা যেমন প্রাচীনাদের মতো অতটা উদার, সব কিছু ধারণক্ষম হতে পারেন না। ব্রিফকেসও তাই। থ্যাসথেসে ফোলিও কি সাইডব্যাগের মতো উদার নয়। তবে খোঁচা মারায় একসপার্ট।

অতঃপর আর একপ্রস্থ চুলোচুলির পর মাঝরাতে নুনজল জুটলো। বাথরুমে গিয়ে একঢোঁক মুখে নিতেই জিভ পুড়ল। সইয়ে নিয়ে মুখ তুলে হাঁ করে ঘড়ঘড়। অবধারিত বিষম। নাকের জলে, চোখের জলে। তারপর প্রায় দম আটকে—ওরে বাবা রে! প্রাণ যায় রে। এবং স্ত্রী এসে মাথার ব্রহ্মতালুতে চটাপট চাঁটি সঙ্গে প্রাণতোষিনী মধুর ফুঁ।

ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন

কিছু কিছু গদাইলস্কর আছেন যাঁদের জীবনটা ভারি মজার। সারাটা জীবন যাঁদের হুকুম করে আর জ্ঞান দিয়ে কেটে যায়। যতক্ষণ বাড়ি থাকবেন, জল দাও, চা দাও, জলখাবার দাও, গেঞ্জি খুঁজে দাও, পাজামা বের করে দাও, পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগিয়ে দাও, আণ্ডারওয়্যারে দড়ি পড়িয়ে দাও, মাথাধরার ট্যাবলেট এগিয়ে দাও, এমন কি মাছের কাঁটা বেছে দাও।

পূর্ব জন্মে এঁরা সব প্রিন্‌স অফ ওয়েলস ছিলেন। কোনও কাজ নিজে করে নেবার ক্ষমতা নেই। জীবনে একবার কুঁজো থেকে জল গড়াতে গিয়েছিলেন। কুঁজো আর গেলাস দুটোই ভেঙেছিল। তিনি বলেছিলেন সব ব্যাটা অপদার্থ। কুঁজোটা টুলের ওপর কি ভাবে বসাতে হয় এই বেসিক ট্রেনিংটাই হয়নি। ব্রিটেনে ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের এই সব ট্রেনিং দেওয়া হয়। বাঙালী মেয়েরা যে কবে মানুষ হবে!

তা ঠিক! বাঙালী মেয়েরা মানুষ হলে অনেক পুরুষেরই হাতে হ্যারিকেন হয়ে যাবে। তখন কে অত হিজ ম্যাজেস্টির জন্যে ফাইফরমাশ খাটবে! সারা দিন কেবল, লে আও আর লে আও।

রাঁধতে রাঁধতে ছুটে এসে জুতো বুরুশ। এক ফাঁকে ছুটে এসে রুমাল পাট। তিনি যা যা পরে সংসার উদ্ধারে বেরোবেন, সব হাতের কাছে গোছগাছ করে রাখা। সারাটা সকাল চরকিপাক। তখন যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মা তোমার বাপের নাম?

বেরিয়ে যাবার পরেও নিষ্কৃতি নেই। বাবু সব ডাঁই করে রেখে গেছেন। বসে বসে কাচ। কেচে শুকোতে দাও। তোলো। পাট করো। যেহেতু তিনি রোজগার করেন, সেই হেতু সাত খুন মাপ। তিনি ভিজে ডবডবে তোয়ালে খাটে বিছানার ওপর রেখে যেতে পারেন। তিনি দাড়ি কামিয়ে ব্লেড সমেত সেফটি রেজার এক মগ জলে ডুবিয়ে রেখে যেতে পারেন। সকালে কাগজ পড়তে পড়তে পাঞ্জাব সমস্যা নিয়ে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন সিগারেটের ছাই অ্যাশট্রেতে ঝাড়ছেন ভেবে সোফার নতুন কভারে মনের আনন্দে ছড়াছড়ি

করেছেন। টুকরোর কোনওটা সোফায়, কোনওটা তলায়। কিণ্ডারগার্টেনের শিশুটিকে নিয়েও এত সমস্যা হয় না। বাথরুমের তাকে তেলের শিশি। মাথায় সামান্য ছুঁইয়েছেন, ছিপিটা লাগিয়েছেন কিন্তু প্যাঁচ মারেননি ; কারণ তখন রাগ-সংগীত সাধনায় বড়ই মশগুল ছিলেন। ফলে পরে যিনি এলেন, তিনি নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় ছিপি ধরে তুলতে গেলেন। শিশি টেকঅফ স্টেজে এসে, গোঁত খেয়ে বিগড়ে যাওয়া উপগ্রহের মতো বাথরুমের মেঝেতে পড়ে গ্রহ হয়ে রইল। পরে যিনি এলেন, তিনি পড়লেন আর উঠলেন না। আঠারো টাকা বারো আনার সুগন্ধী তেল আর মেরুদাঁড়া মেরামতির খরচ ধরা যাক হাজারখানেক। সামান্য ভুল অসামান্য প্রতিফল।

তিনি টুথপেস্ট নিয়েছেন। ছিপি ! ছিপি ছিটকে গেছে। কোথায় ? সে ওই পুলিসের খুনী ধরা কুকুর ছাড়া আর কেউ খুঁজে পাবে না। টুথব্রাশ চলে এসেছে চিরুনি রাখার জায়গায়। চিরুনি চলে গেছে টিভির ওপর। পাউডারের কৌটো আছে বিছানায় মাথার বালিশের ওপর। ঢাকনা খাটের তলায়। পোষা কুকুর নতুন কোনও প্রাণীর হাড় ভেবে চিবিয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে ফেলেছে। আর পাফটা রেডিওর ওপর বসে বিবিধ-ভারতী শুনছে।

যে মানুষটি এই সবের নায়ক, তিনি হাত মোছার তোয়ালে ঠিক জায়গায় নেই দেখে সাংস্কৃতিক-বিপ্লব শুরু করলেন। এমন সব ভাষা মুখ থেকে ঠিকরোতে লাগল, এমন সব অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলেন, যেন 'আসছে বছর আবার হবে' গ্রুপের দলপতি ! যেন বারোয়ারীর মণ্ডপে ধুনুচি-নৃত্য-শিল্পী। পুরস্কারপ্রাপ্ত বীর।

তিনি বললেন, 'সেল্‌ফ হেলপ ইজ বেস্ট হেল্‌প' অথচ তাঁর সেল্‌ফই কাজ করে না। সারা জীবনই ব্যাটারি ডাউন। না ঠেললে স্টার্ট নেয় না। সকাল থেকে ঠেলতে ঠেলতে বাজার। আবার ঠেলাঠেলি করতে করতে স্নানে। বাবু অফিস যাবেন, দায় তো সংসারের। খেদ্দাও বলে টনক নড়লে তখন তো ঝটিকা বয়ে যাবে। পনের মিনিটে যাবতীয় সব কাজ সেরে, দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দশটাতেই অফিসে ঢোকার কায়দায় ধড়ফড়। যা একমাত্র আইনস্টাইনের থিয়োরি অফ রিলেটিভিটির প্রয়োগেই সম্ভব। ১ আগস্ট ১৯৮৫-তে বেরিয়ে ১ আগস্ট ১৯৮৩-তে গন্তব্যে গিয়ে বসে থাকা।

অনেকে আবার অফিসে বেরোবার প্রাক্ মুহূর্তে মনোবল হারিয়ে ফেলেন। কিছু শিশু আছে স্কুলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বেরোবার মুহূর্তে বেঁকে বসে। না যাবো না। তারপর সারাটা পথ মা অথবা বাবা, হাত ধরে টানতে টানতে, হ্যাঁচড়াতে, হ্যাঁচড়াতে বলির পাঁঠার মতো 'ব্যা ব্যা' ছেলেকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে



চলেন। খুব সাধারণ দৃশ্য।

কিছু পুরুষেরও সেই অবস্থা। ধরাচূড়া পরে, ভিটামিন ক্যাপসুল গিলে, জুতোটুতো পরে বেশ বেরোলেন। দু' কদম গিয়ে ফিরে এলেন। বাড়ির গ্যালারিতে যাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাটা, বিড়লা বিড়লা করছিলেন তাঁরা অবাক।

যিনি প্রশ্ন করার সাহস রাখেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

'পেটটা যেন কেমন কেমন করছে।'

'কি, বাথরুমে যাবে?'

'না, একটু দেখি।'

এবার চার পাঁচ কদম গেলেন। আবার ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে।'

'কি হল?'

'না ভাবছি।'

আকাশ দেখলেন, গাছের পাতা নড়া দেখলেন, ঘড়ি দেখলেন। সবাই উদগ্রীব। আতঙ্কিতও। না বেরলে জ্বালিয়ে মারবে। জামাকাপড় ছাড়লেই, পেট কেমন ঠিক হয়ে যাবে। পনের মিনিটের মধ্যেই হুকুম হবে, চা বানাও। নটার সময় নাকে মুখে কোনও রকমে চারটি গুঁজেছে। দেড়টার সময় খাবার জন্যে লাফাবে। তার চেয়েও বড় কথা দুপুরে মেয়েদের একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়, সেই জগৎটা ভেঙে যাবে।

সুতরাং ঠেলেঠুলে অফিস পাঠাতেই হবে। অফিসের মত এমন ডাম্পিং গ্রাউণ্ড আর দ্বিতীয় নেই। যেন বড়দের ক্রেশ। একবার পাঠাতে পারলে ঘণ্টা আটেকের জন্যে, আহা শান্তি!

শেষে তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখি কাগজটা।'

'হুঁ, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ। বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা।'

ব্যাস হয়ে গেল। তিনি মথুরায় ফিরে এলেন। শুরু হল লীলাখেলা। 'বুঝলে আজ আর যাব না। কাল শনি। একেবারে সোমবারে।' শুরু হয়ে গেল দিবা-সঙ্কীর্তন।

'জল দাও।'

'পাজামা দাও।'

'ভিজে, কেচে দিয়েছি।'

'তাহলে চা দাও।'

তারপর বাড়ি থাকলে যা হয়। বায়নার তো শেষ নেই! সব বায়না তো মেটানো যায় না। ছেলে হলে ঠেঙিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যেত। ফলে ঠোকাঠুকি।

অতএব ঠেলাঠেলি-ফিসফিস প্রশ্ন—কি রে ভাই, আজও না বেরোবার ধান্দা। মরেছে।

চলছে চলবে

স্ত্রী বলছেন খেটে খেটে মরে গেলুম। স্বামী বলছেন খেটে খেটে মরে গেলুম। মা বলছেন খেটে খেটে মরে গেলুম। বাবা বলছেন খেটে খেটে মরে গেলুম। অফিসে অফিসে কর্মীরা বলছেন খেটে খেটে মরে গেলুম। হঠাৎ এত খাটুনি এলো কোথা থেকে। কই আগেকার মানুষের তো জীবন সম্পর্কে এত অভিযোগ ছিল না। সমাজে প্রাচীন প্রাচীনা এখনও যাঁরা নবীন নবীনাদের ধাক্কা সহ্য করে বেঁচে আছেন, তাঁরা তো খাটতে ভয় পান না। তাঁরা মনে হয় ভালবেসে সংসার করতেন। এখন আমরা করি দায়ে পড়ে।

একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের ভালবাসা হল। প্রেমে পড়েছি বলতে বেশ ভালই লাগে। হিরো হিরোইনের ব্যাপার। প্রেম পাকিলেই বিবাহ হয়। যেমন কলা পাকিলে থোড়। আজকাল আবার বিয়ের পর হনিমুন হচ্ছে। হনিমুন মানে নববধূর মগজ ধোলাই। পরিবারের আওতার বাইরে, পাহাড়ে কি সমুদ্রে, নির্জন, নিভৃতে তুমি আর আমি। বাবা নয় মা নয় দিদি নয় দাদা নয়, তুমি আমার, আমি তোমার। পরিবারের অন্য সবাই বুঝে গেলেন, ছেলে বিয়ে করেছে, বউ তার একার, এজমালি নয়। বধূ, তবে পুত্রবধূ বলে তেমন জোর খাটানো চলবে না। জোড়ে জোড় লেগে সংসারের একজন হয় ভালই, নয় তো উড়ু উড়ু। নির্দিষ্ট ঘরটিতে, ওগো, হ্যাঁগো, শুনছো। মাঝে মধ্যে বেরিয়ে আসবে। এই একটু রান্নাঘরে বেড়িয়ে গেল, এই একটু বসার ঘরে। আমি এসেছি, মা এইবার আপনার ছুটি, ঝ্যাঁটা আমার হাতে দিন, ঝুলঝাড়ু ছেড়ে দিন, রান্না, বলুন কি হবে, আগ বাড়িয়ে বলার মতো বধূর সংখ্যা কমছে। বেশি গতর খরচ করলে স্বয়ং পুত্রই শোবার ঘরে ফিস্ ফিস্ করে বলবে, অত ভূতের বেগার খেটে মরছ কেন ?

সংসার তো পাঁচ তারা হোটেলে বসবাস নয় ! যে বাড়িতে থাকা, সেই বাড়ি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রাত্যহিক কর্তব্য। এ তো আর হোটেল নয় যে ভোর না হতেই একের পর এক কাজের মানুষ আসবেন ! কেউ বিছানার চাদর পাল্টাচ্ছেন, মশারি তুলছেন, ঝাড়ু দিচ্ছেন। বাঁচতে হলে খেতে হবে। খেতে হলে বাজার চাই। বাজার হলে, ব্যবস্থা চাই। কেটে কুটে ধুয়ে মুছে রান্না করতেই

হবে। রান্নার পর পরিবেশন চাই। এ তো হোটেল নয়, যে বেল টিপলেই খাবার নিয়ে তেড়ে আসবে!

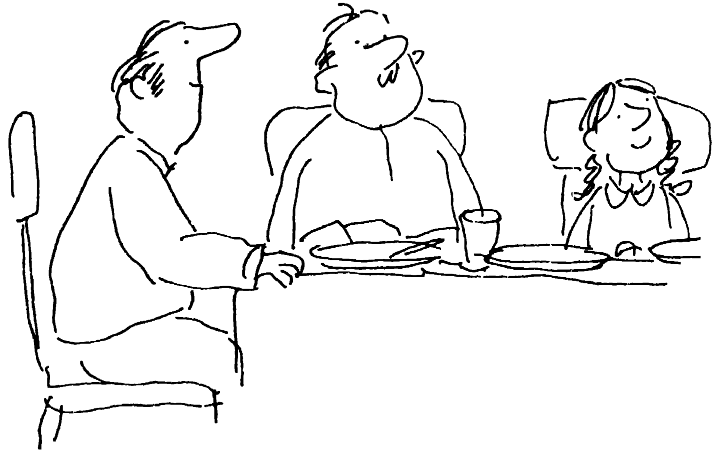
কালের নিয়মে মা যাবেন, বাবা যাবেন। শ্রীমান শ্রীমতি এবার মুখোমুখি। মা জল দাও, মা খেতে দাও, মা চা দাও, মা জলখাবার দাও। আর হবে না। এইবার, হ্যাঁগা চা হবে? হ্যাঁগো খেতে দেবে না কি? আর আদেশ নয়, অনুরোধ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা। একটু নুন হলে ভাল হত। মা নুন দিয়ে যাও নয়। বর্ষা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, একটু জোর গলায় নিজেকেই নিজের বলা, আজ খিচুড়ি হলে যা জমত না! সঙ্গে গরমা গরম তেলেভাজা। যদি তিনি শোনেন, শুনে যদি ইচ্ছা করেন।

আদা আছে? আদা?

মা জীবিত থাকলে এর বেশি আর বলার দরকার হত না! তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতেন, বলতেন, কেন? আদা চা খাবি?

এ যুগের উত্তর, আদা? হ্যাঁ, একটুকরো পড়ে আছে ঝুড়িতে।

খুব নির্লজ্জ, ঠোঁট কাটা হলে বলবেন, এক কাপ আদা চা হবে?



সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, না। বারে বারে চা আমি খেতে দোব না।

বোকা, রোম্যান্টিক মহা খুশি, উঃ দেখেছ, বউ আমাকে কি রকম ভালবাসে ! রিয়েল লাভ।

আমার লিভারের জন্যে কত ভাবে দেখেছ !

না, অত সিগারেট তোমাকে আমি খেতে দোবোও না ! রোজ এক প্যাকেট।

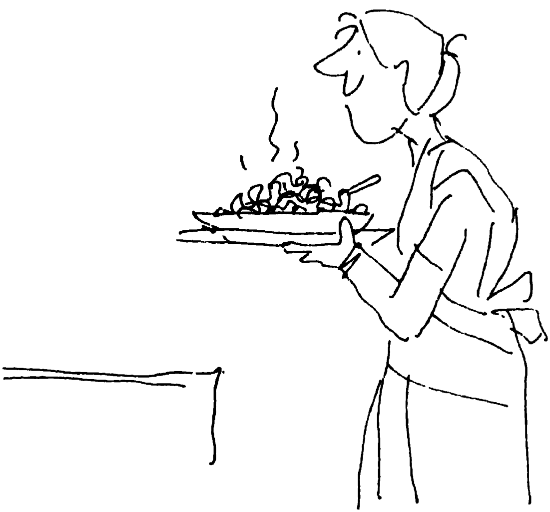
হৃদয় মথিত করে একটি শ্বাস বেরিয়ে এল, কি ভালবাসা ! পয়সা থাকলে আর একটা তাজমহলের ফাউণ্ডেশান ফেঁদে যেতুম।

এর পেছনে যে কত বড় চাল আছে ! কর্তা সব ফুঁকে উড়িয়ে দিয়ে গেলে শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর। আজকাল অধিকাংশ বাড়িতেই একবেলা রান্না। মেড ইজির যুগ। মেড ইজি পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় টপকানো। মেড ইজি করে সংসারের ঠ্যালা সামলানো।

সকালের রুটি, ঠাণ্ডা মেশিন থেকে বের করা তরকারি।

রাতে বেশ গরম গরম ভাত হলে মন্দ হত না।

দেয়াল শুনলে। স্ত্রীও শুনলেন। দেয়ালে টাঙানো আড় কাত পূর্বপুরুষের



ছবিও শুনলেন। ঘরওয়ালী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, চল্লিশে পড়েছ, আমি মরে গেলেও দু'বেলা ভাত তোমাকে দোব না। এক মুঠো ভাত বসাতে আমার আর কি হাঙ্গামা ! গ্যাস আছে জ্বালবো আর বসাব। একবেলা ভাত, আর একবেলা সুখতলার মতো রুটি শরীর ফিট।

শরীর টরীর নয়, দু'বেলা তরিবাদি রান্না আর ধাতে সয় না। মেড ইজি নুড্‌লস বেরিয়েছে। পাঁচ মিনিটেই লয়াবয়া ব্যবস্থা। দাদু খায়, নাতি খায়।

নিজেরাই নিজেদের বাঁশ দিয়ে বসে আছি। ফ্রিজ থেকে ওমাসের তরকারি বেরোচ্ছে। বিকেলে সকালের চা বেরোচ্ছে ফ্লাস্ক থেকে। বিকেলে সব পার্কের ধারে গিয়ে ফুচকা মেরে আসছে। দুপুরে অফিসপাড়ায় হাতখানেক একটা মশলা ধোসা পেটে ঢোকাতে পারলে রাতে আর সুখতলা চিবোতে হবে না।

খুচখাচের যুগ। খুচখাচ খাও। খুচখাচ বেড়াও। খুচখাচ ঝগড়া। খুচখাচ রান্না। সব খুচখাচ আর টুকটাক। আলতো জীবন। একটু ফাউল। একটা দুটো পেনাল্টি। ফলাফল, গোল লেস ড্র। জীবনের পাওনা ভয়।

এই বুঝি গৃহিণী গর্জন করলেন ! এই বুঝি ছেলে ফড়কে গেল। এই বুঝি বিছানা নিতে হল। এই বুঝি কাজের লোক পালাল ! এই বুঝি খাটুনি বেড়ে গেল।

এক ভদ্রলোক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে এক রোববার চা খেয়েছিলেন। খালি কাপটা রেখেছিলেন যে 'সোফায় বসেছিলেন, তার পেছনের জানলার সিলে। পরের রোববার গিয়ে দেখলেন, কাপটা সেইখানেই পড়ে আছে। খেটে খেটে সবাই সারা। আর পারা যায় না। কত দিকেই বা চোখ দেওয়া যায় !

আসলে ওই হনিমুনই মেরেছে। শেষ কালেই সুর ধরা পড়ে। তখন দেখা যায় হনিও নেই। মুনও নেই। জীবনে জীবনে বিষম সন্ধি। ফলে, সংসারে কারুর মুখে আনন্দ নেই। কেবল অভিযোগ। মরে গেলুম। মেরে ফেললে ! চলছে চলবে।

মশারি বিচিত্রা

সারা দিনের পর চুলো এইবার নিবল। সংসারের রোলিং শাটার নেমে এল হড়হড় শব্দে। ঘরে ঘরে নীল মশারির মায়া ঝিলমিল করছে। কোনওটা প্রকৃতই বৃষ্টি ধোয়া নীল আকাশ। কোনওটা মেঘলা মেঘলা। কোনওটা কড়া নজরে পরিপাটি, টান টান। কোনওটা উদাসীনতায় ময়লা ময়লা, ঢিলে ঢালা, এলোমেলো। কোনওটার ভেতরে একজোড়া। কোনওটার ভেতরে সিঙ্গল। কোনওটার ভেতরে পুরো একটা ফ্যামিলি। স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে সপরিবারে একটা ইউনিট। দুধারে স্বামী স্ত্রী পাঁচিলের মতো, মাঝে নিরাপদ একটি কি দুটি শিশু। মানব সন্তানের যতদিন না জ্ঞান হচ্ছে, ততদিন এই ভাবেই বড় হতে থাকে। তারপর ভিটকেমি বাড়লেই গুটি কেটে একে একে বেরিয়ে পড়ে। আর মশারির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। শেষে স্বামী স্ত্রীও আলাদা হয়ে দুই পৃথক তাঁবুতে। মশারিময় জীবন। এইভাবেই আমরা সব নীল জালে জড়িয়ে যাই, যার অপর নাম সংসার।

এই মশারির মধ্যে কেউ পড়েই নাক ডাকাতে থাকে। একটানা আট ঘণ্টা কল চলার পর সকালে স্তব্ধ। রাতে নাকের খেলা। দিনে মুখের খেলা আর চোখের খেলা। আজকাল আবার মেয়েদেরও নাক ডাকে। ছুঁচলো সুরে। যেন পিটার প্যান চাঁদিনী রাতে যমুনার ধারে বসে পিকলু বাঁশি বাজাচ্ছে। ডাকাত কালীর নাকের মত নয়। ছেলেদের নাক ডিস্‌কো নাক। খেলে খেলে ডাকে। কোনওটা স্যাক্‌সোফোন। কোনওটা ক্ল্যারিওনেট, কোনটা ভেঁপু। রয়াল কম্বিনেশান হল, কর্তা আর গিন্নির দু'জনেরই ডাকছে, যেন একালের যুগলবন্দী। মিঞা বিসমিল্লা আর টি কে রাজন। হোল নাইট ফাংশানের মতো।

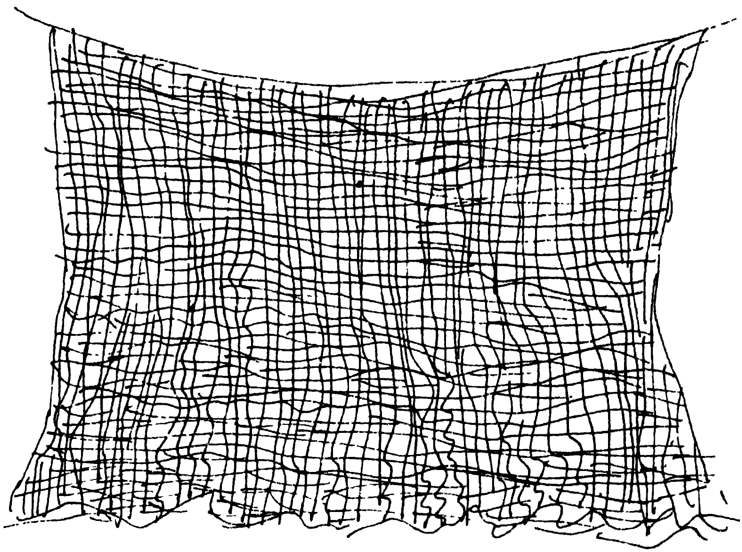
কোনও মশারিতে বিনিদ্র প্রাণী। ঘুম আর আসেই না। চিৎ হচ্ছে, পাশ ফিরছে, উপুড় হচ্ছে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গানের মতো। সেই গানটি এখন আর শোনা যায় না—রাত জাগা এই আঁখিপাতায় ঘুম যেন আর আসে না। কারুর ভেতরে কুরে কুরে ঘুরছে অ্যামবিশানের তুরপুন। উঠতে হবে। আরও ওপরে। আরও ওপরে। নাইলেক্‌সের বদলে ঝিলমিলে গোল নেটের মশারি।



একতলা থেকে দোতলা, পাঁচতলা, দশতলা। অবশেষে মশারি মুক্ত জীবন। কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যাপার্টমেন্টের দশতলায় টুং টাং ফ্ল্যাট। জানলা খুললেই, চুঁইয়ে পড়ছে নীল আকাশ সবুজের কোলে। মধ্যবিত্তের মশা সমস্যা আর নেই। মশা আর হুল ফোটাতে পারে না।

কারুর ঘুম আসছে না আত্মিক সঙ্কটে। এই জগৎ, এই জীবন। কোন্ পথ? কার আদর্শ! মার্ক্স, লেনিন, বিবেকানন্দ! ক্যাপিট্যালিজম, সোস্যালিজম, দুর্নীতি, অপসংস্কৃতি, রাসেল, রাস্কিন, কামু, কাফ্কা, ব্রেশট, গদার, ফেলিনি। মাঝ রাতে মশারির ভেতর আন্তর্জাতিক তাণ্ডব। চোখের পাতা এক করে কার পিতার সাধ্য। লাস্ট ফোর্টিন ইয়ারস চুলে তেল নেই। কচ্ছপ মার্কা ধূপের মতো ইন্‌টেলেকচুয়াল ব্র্যাণ্ড মাথা। সদা সর্বদা আগুন হয়ে আছে। একবার করে বসছে, একবার করে শুচ্ছে। জীবনধর্মী গল্পের প্লট ভাঁজছে।

কোনও মশারিতে এ-পাশ ও-পাশ করছে বিরহী। বেগম আখতার ঢুকে পড়েছেন মাথার বনেটে—পিয়া ভোলো অভিমান, মধু রাতি বয়ে যায়। মাঝে মাঝে অখিলবন্ধু আখতারকে সরিয়ে দিচ্ছেন, মিলন নিশীথে গেলে ফিরে, প্রদীপ জ্বলিছে ধীরে। সত্তরটা ইন্টারভিউ দেওয়া হয়ে গেছে। সতেরটা প্যানেলে নাম



ঝুলছে। আগে চাকরি। তারপর পার্মানেন্ট। তারপর একটা ফ্ল্যাট। তারপর রাখী। ততদিন তুমি পদ্মপুকুরের দোতলার ঘরে আমারই মতো একা বিছানায় শুয়ে, আমারই মতো গেয়ে যাও, ভালোবেসে ভালো কাঁদালে/ চাকরি নেই বাকরি নেই/ ভালো জ্বালালে/ ডেলি অ্যালাওয়েন্স দেড় টাকা/ বাজার থেকে এক টাকা/ এই তো মোট আড়াই টাকা/ বলো কি করে চলে/ ভালোবেসে গুরু ভাল ফাঁসালে ॥

কোনও বিছানা থেকে বউ উঠে চলে গেছে। বারান্দায় চট পেতে শুয়ে আছে। নটার সময় ঠুসঠাস শুরু হয়েছিল। এর কুটুস ওর কুটুস। কামড়াচ্ছে। গর্তের মধ্যে সিঁদোচ্ছে। এগারোটায় 'ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী' শেষ করে মশারিতে প্রবেশ। ফোঁস ফাঁস, ফ্যাঁস ফোঁস। শেষে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেছে। মশারি ফশারি ছিঁড়ে। একপাশ ঝুলছে লতরপতর করে। একের পর এক সিগারেট চলেছে। দিনকাল ভীষণ খারাপ। সজাগ থাকতে হবে। দু চোখ বুজলেই ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠবে। এক বোতল ঢালবে। মারবে কাঠি। তারপর যাও, গিয়ে ঘানি ঘোরাও। নাঃ, এমন যুগ পড়ল, দাম্পত্যকলহের চার্মটাই নষ্ট হয়ে গেল। পিতার পিতা রোজ তাঁর বউকে ঘণ্টা দুই কিলিয়ে মাত্র খানচল্লিশ গাওয়া

ঘিয়ে ভাজা ফুলকো লুচি আর চিংড়ির মালাই কারি খেতেন। শোবার সময় একপুরিয়া ইসবগুলের ভুসি।

কোনও মশারির ভেতরে রগচটা প্রাণী। সকালে কার সঙ্গে অফিসে ধুন্দুমার হয়েছে। সেই ঝগড়া এখনও চলেছে! পঞ্চানন দিন কারুর সমান যায় না। ডোণ্ট ফরগেট। এ ডে উইল কাম, যখন আই উইল একসট্র্যাক্ট অল ইওর টিথ, ওয়ান বাই ওয়ান, টুথ বাই টুথ, অ্যাণ্ড মেক ইউ এ ফোগলা। ভাবছিস চেয়ারে তোর মুরুব্বি বসে থাকবে সারা জীবন!

কোনও মশারির ভেতর শাশুড়ী ফুঁসছেন, তাই তো বলবি মা, খাইয়ে দাইয়ে বড় করে পেটের ছেলেকে তুলে দিলুম মা তোমার হাতে আর সেই গর্ভধারিণীকে বললে, চোকের মাতা খেয়েছি। সকালবেলা হাতের কাছে তাড়াতাড়ির সময় লড়বড় লড়বড় না করে এক জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসুন। আমার নাকি কর্মের চেয়ে অপকর্ম বেশি। হায় মধুসূদন! আর কবে নেবে প্রভু!

কোনও মশারির ভেতব দাঁতের যন্ত্রণা। করুণ কণ্ঠ, 'হ্যাঁগা ঘুমোলে?'

'সারা দিনের পর মানুষ কি করে!'

'আমার যে দাঁত ব্যথা করছে গো।'

'তুলিয়ে এসো।'

'এই রাতে কে তুলবে!'

'তাহলে ভগবানের নাম করতে কবতে ঘুমিয়ে পড়।'

'বলে বাপের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে. ভগবানের নাম! তুমি না আমার সহধর্মিণী!'

'সে হল ধর্মের। পাপের নয়। পাপ করেছ, একা তার ফলভোগ কর।'

এক এক মশারি এক এক জগৎ। আধ্যাত্মিক মশারিও আছে। শয়নের আগে ধ্যানস্থ। একটা দিন তো গেল প্রভু। দুঃখে সুখে এইভাবেই যেন কেটে যায় জীবনের দিন। ছোট্ট একটি হাই। দুগ্ধশুভ্র বালিশে মাথা। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল।

আরে আমি আছি

'আরে আমি আছি। আপনি কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

যাঁরা কথায় কথায় এই আশ্বাস দেন, তাঁদের কার্যকলাপ দেখলে, মানুষের একটা গ্রুপ বেরিয়ে আসে ব্লাড গ্রুপের মতো। এঁরা হলেন 'হাম হ্যায়' গ্রুপের মানুষ। এঁদের কথাটাই আছে কাজ নেই। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। এ গ্রুপের সঙ্গে ঘর সংসার করতে করতে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যায়, তখন 'আরে কিছু ভাববেন না' শুনলে, ভাবনা কমে না। ঠোঁটে বাড়তি একটু মুচকি হাসি ফোটে।

'আররে, আমি আছি'র দলে নিজের ছেলে আছে, মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে, স্বামী আছে, পাড়ার দাদা আছে, ঠাকুরপো বাহিনী আছে।

ঠেকে শেখা বলে একটা কথা আছে। শুনে শেখা, আর ঠেকে শেখা। ঠেকে শিখলে, শিক্ষাটা বেশ ভাল হয়। সহজে ভুল হয় না। আমরা এখন এমন একটা কালে বাস করছি, যে কালের জীবনকে বলা যায় 'সোলো-লাইফ'।

অনেক আগে একটা গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর...'

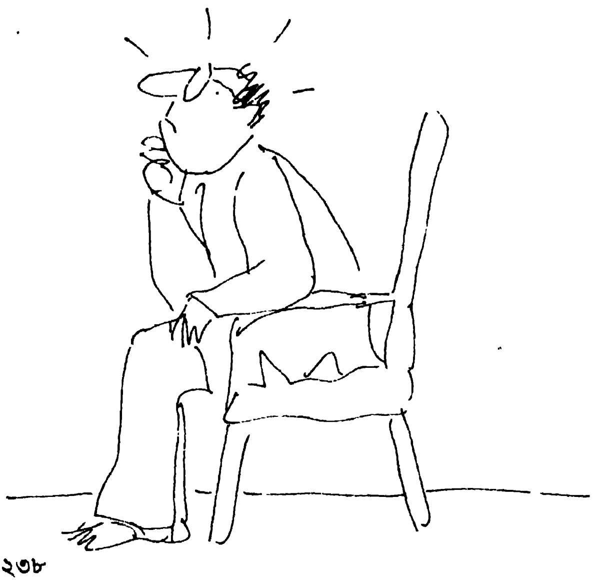
একালের গান হল, 'আমি আর আমি শুধু।' সব একার ঘাড়ে। অ্যাটলাসের মতো সংসার কাঁধে। কোনও সংসারেই আর কোরাস শোনা যায় না, 'জাগো নব ভারতের জনতা। এক জাতি, এক প্রাণ, একতা।' এখন কেঁদে কেঁদে একতারা—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।'

ইংরেজ আমাদের শিখিয়েছিল, 'ডিভিসান অফ লেবার।' অন্য কোথাও না হোক, সংসারে দুটো ডিভিসান ভীষণ স্পষ্ট। এক হল ছেলেদের ডিপার্টমেন্ট আর এক হল মেয়েদের ডিপার্টমেন্ট। মেয়েরা যদিও বা ছেলেদের কাজে এগিয়ে আসেন, ছেলেরা কদাচ নয়।

ছেলেদের টেকনিক হল, যত না কাজ, তার চেয়ে বেশি হুড়মদুড়ুম। ফুটবল খেলার কায়দা আর কি, 'অফেনস ইজ দি বেস্ট ডিফেনস।' আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। একবার বাজার ঘুরে এসে এমন হম্বিতম্বি যেন হিটলার ফ্রান্স জয় করে ফিরে এলেন। যেন সংসারের সকলের মাথা এক বাজারেই

কেনা হয়ে গেছে। একবারের বেশি দু'বার দোকান যেতে হলে, কর্তার কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেল। রাজ্যপাল হবার সম্ভাবনা ছিল, সংসারের প্যাঁচে পড়ে গোপাল হয়ে থাকতে হল। ছাত্র আইনস্টাইন হতে পারত, পঁচিশ পয়সার পোস্ত আনতে গিয়ে আইন অমান্যকারী হয়েই সারা জীবন মিছিল সরণিতেই ফেস্টুন হাতে ঘোরাফেরা করতে হল। সব সম্ভাবনা শেষ করে দিলে সংসার।

অথচ দফায় দফায় ছত্রিশবার চায়ের হুকুম মেয়েদের তামিল করতেই হবে। নটায় অফিস বেরোবেন বাবুরা, সাড়ে আটটায় বাজার এল। সতেরটা চারাপোনা বেরলো ঝুলি থেকে। সেই পোনা ড্রেস করে, মেরামত করে, সংসারের ফ্রন্টলাইনের ফাইটারদের পাতে ফেলতে হবে। এই সময় একটিমাত্র সংগীত—'একলা চলো রে।' কেউ সাহায্য করবে না। মেয়ে হয় তো বড় হয়েছে। তাকে যদি বলা যায়—আয় না মা, একটু সাহায্য কর না, সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে, কি বলছ, আমার যে আজ ক্লাস-এগজামিনেশান। অথচ দেখা যাবে, সেই মৈত্রেয়ী, পেছন উলটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাগজ পড়ে যাচ্ছে। এপাশে শিল, তার ওপর সরষে বাটা, ওপাশে আলু-পটল, ঢেঁড়স-বেগুন সত্যাগ্রহীর মতো গড়াগড়ি যাচ্ছে। দ্বিবিধ চুলা, ত্রিবিধ হাতিয়ার হাতে রণরঙ্গিনী সেকেণ্ড লাইনে ফাইট করে



যাচ্ছেন।

মাঝে মাঝে ফ্রন্টলাইনের দরদ উতলে ওঠে সেকেণ্ডলাইনের সৈনিকদের ওপর। কর্তা এসে গিন্নিকে বললেন—'আরে যাও না, বাথরুম খালি আছে, এই বেলা চানটা সেরে এসো না। সকালে চান করলে শরীর ঠাণ্ডা থাকে।'

'কি করে যাই বলো। এটায় ডাল, ওটায় ভাত।'

'আর্‌রে, আমি আছি।'

এই 'আমি' তো আর নিজের 'আমি' নয়। তবু এই ভাবে বললে বেশ একটা নির্ভরতা আসে। মন খুশিখুশি হয়। কিন্তু 'আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিলি হায়!'

ডাল ফুটছে। ভাত উতলে আসছে। আর 'আররে আমি আছি'। ডুবে গেছেন কাগজে। কি সোমেন এসে জমিয়ে দিয়েছে। ডাল পোড়া, আর ভাত ভাজা খেয়ে 'আররে আমি'-র ঠেলা সামলাও।

কর্তার ডিপার্টমেণ্টেও সুখ নেই। সে দপ্তরেও ওয়ানম্যান শো। কোঁ কোঁ করে জ্বর এসে গেছে। জামার বুক পকেটে ইলেকট্রিক-বিল। আজই লাস্ট ডেট। জমা দিতেই হবে। আর এক 'আররে' চটি ফটফটিয়ে এলেন। 'আররে



দাদা হাম হায়। দিন, বিলটা দিন।'

পরের মাসের বিল দেখে কর্তা আবার বিছানা নিলেন। দুটো বিল একসঙ্গে জুড়ে এক ছানাবড়া বিল এল। সেই, 'আররে আমি'-র পকেটে চির-সমাহিত হয়েছে 'ইলেকট্রিক বিল'।

'আরে আমি আছি'রা নাচিয়ে দিয়ে সরে পড়ে, বা ভুলে যায়, বা আর গা ঘামায় না। এটা এত পারস্পরিক! ছেলে বাপকে, বাপ ছেলেকে, ছেলে মাকে দিনের পর দিন এই এক তাপ্পি দিয়ে চলেছে। একেবারে রাজনৈতিক বক্তৃতার মতো সহজ বলা।

টিন নিয়ে চলে গেছে, কেরোসিন এল না।

ট্রেনের রিজার্ভেসান করে দোবো বলে টাকা নিয়ে চলে গেছে। ট্রেন হাজার বার প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল এল, রিজার্ভেসান এল না।

ভাল একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দোব বলেছিল হালকা নেতা। দেখা নেই।

ছেলের চাকরি করে দোব বলেছিল ভোটপ্রার্থী নেতা। কই কি হল!

যে ছেলেটি মেয়েটিকে বলেছিল, 'আররে ভাবছ কেন? আমি তো আছি।' সে কোথায়! মেয়েটি কেন আত্মহত্যা করল?

যে ছেলে তার মাকে বলেছিল, 'আরে ভাবছ কেন, আমি আছি।' সে ছেলে এখন কার জন্যে কোথায় আছে, আর তার মা কেন দাতব্য চিকিৎসালয়ে খাবি খাচ্ছে!

স্বামী স্ত্রীকে বলেছিল সেই প্রথম রাতে, 'আরে আমি আছি।' দু'জনেই দু'জনকে বলেছিল তবু জীবনের মাঝপথে, জীবনের পাশে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই কেন?

আসলে আমরা আর কেউ কারুর জন্যেই থাকছি না। নেই। শুধু পড়ে আছে, ফাঁকা, প্রতিশ্রুতি, 'আররে আমি আছি।'

মাঝরাতে বড় শহরে পথের পাশে হোর্ডিং আলোকিত হয়ে থাকে, কেউ কোথাও নেই রাত নিশুতি, জ্বলছে প্রতিশ্রুতি, 'কথা আছে কাজ নেই'। আধুনিক জীবনও প্রায় সেইরকম হয়ে এসেছে।

মশা মারতে গালে চড়

সম্প্রতি মশা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটা সেমিনার হয়ে গেল। বহু বিশেষজ্ঞ ও শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার পর আলোচনা। টিভি, রেডিও ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। চড়া চড়া আলো জ্বলল। গতিশীল ক্যামেরা খামচা খামচা করে সভার কার্যক্রম সেলুলয়েডে তুলে নিল। স্থির ক্যামেরা ফিচিক ফিচিক করে বক্তাদের অসংখ্য ছবি তুলে নিল। বীর রস, করুণ রস। সাংবাদিকরা খসখস করে অনেক কথা লিখলেন।

উত্তর কলকাতার একটি ঘরে, ঘর জোড়া একটি মশারির মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে, টিভির সংবাদ কার্যক্রমে সেই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের অংশ বিশেষ শুনলুম। বক্তারা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, ঠোঁট নড়ছে, মাথা দুলছে, হাত মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে ; কিন্তু ভাষাহীন প্যান্টোমাইম। বানী তব ধায় নীরবে। কারণ মশা কথায় মরবে না। সুতরাং শতকথা শোনানোর প্রয়োজন নেই। মশা মরবে চাপড়ে। দু হাতের দুই তালু হল মোক্ষম অস্ত্র, আর ক্রিকেট ফিল্‌ডারের শরীর। কাচ ধরার দক্ষতা। বলে স্পিন নয়, শরীরে স্পিনমারার ক্ষমতা, আর পাইলটের চোখ। সংবাদ পাঠিকা শুধু জানালেন—মেয়র বলেছেন, বন্ধুগণ, আপনারা মশাদের চিনুন। নো ইওর মসক্যুইটোজ। মশাদের চাল চলন হাবভাবের দিকে নজর রাখুন। অর্থাৎ স্টার্ট অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ মসক্যুইটোজ। পেয়ার, মোহব্বত। পরস্পর মশাদের বিষয় আলোচনা করুন। ডিসকাস মসক্যুইটোজ। আর বললেন, মশা অতি অপকারী প্রাণী। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া নামক একটি ব্যাধি হতে পারে।

কিছু পরেই বেতার সংবাদ পরিবেশনে মশা-সেমিনার-এর চিলতে শোনানো হল ঘরেঘরে মেয়েরা মশানিধনে ব্যতিব্যস্ত। জেনে রাখুন লাল আর নীল রঙ মশারা ভালবাসে। লাল আলো আর নীল আলো মশাদের প্রলুব্ধ করে।

মহিলারা ঘরে ঘরে মশানিধনে ব্যস্ত। সেমিনারের সুফল। পুরুষ জাতির নিষ্কৃতি। মেয়র যুগ যুগ জিও। ঘরে একটি স্বামী, আর মশা অসংখ্য। একটি স্বামী নিধনের পর হাতে শূন্য। লাখ লাখ মশা নিধনের পরও, লাখ লাখ থেকে

যাবে। স্বামীর বিকল্প নেই, ডুপ্লিকেট নেই, স্পেয়ার নেই। গাড়ির চারটে চাকা, একটা স্টেপনি। ট্রাকের ছটা চাকা। সংসারের মাত্র একটি। সুতরাং রমণীকুল মশানিধনে আত্মোৎসর্গ করলে জাতির জীবনে শান্তি আসবে অচিরে। এর ওপর কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কি সেবাপ্রতিষ্ঠান যদি একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন, রণরঙ্গিনী নয় মশা মার্তণ্ডী এইটটি ফাইভ, তাহলে আর দেখে কে। ঘরে ঘরে ঝটাপটির বদলে চটাচট। যাঁরা নাচতে জানেন না তাঁরাও নাচ শিখে যাবেন। নেচে নেচে মশা মারবেন। নতুন নৃত্যশৈলী জন্মাবে। কথাকলির মতো মশাকলি। অথবা ভরতনাট্যমের মতো মশকট্টম। সমস্ত মারামশার লাশ জমা পড়বে পাড়ার রেশানের দোকানে। ওজন হবে। কে কত কেজি মারলেন তার ওপর পুরস্কার, খেতাব। ডিউস্লিপের মতো রেশানের দোকান মসক্যুইটো স্লিপ দেবে। বছরের শেষে টোটাল ও ফলাফল।

মশার পছন্দ লাল রঙ। লালাবাবু আর কজন আছেন, থাকলেও তাঁরা অনেক উচ্চে থাকেন। মেয়েদেরও তেমন ভয় নেই। বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত বাঙালী মহিলাই অ্যানিমিক। ফ্যাকাসে। অবাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হেভি ডিউটি মহিলাদের জন্যে ভয় নেই। মশার বাপের ক্ষমতা নেই তেনাদের মেদের প্রোটেকটিভ শিল্ড ছেঁদা করে রক্ত পর্যন্ত পৌঁছয়।

নীল ভালবাসে। নীল রক্ত আর কোথায়! অভিজাতরা সব জনগণ হয়ে গেছেন।

'নো ইওর মসক্যুইটো'। তোমার মশা চিনে নাও বললে সবাই ভাববেন তাঁর



স্ত্রীকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। বিলিয়ানস অ্যাণ্ড বিলিয়ান্স অফ মসক্যুইটো জর্দার মত ফ্লেভার দিয়ে তৈরি দিলবাহার। টিনটিনের ক্যাপটেন হ্যাভকের কথায়, বিলিয়ানস অ্যাণ্ড বিলিয়ানস অফ ব্লু ব্লিস্টারিং বারনাক্লস। এই সেমিনারে কিন্তু মশা বলতে মশাকেই বোঝানো হয়েছে।

আমাদের এখন মশা চিনতে হবে। মশা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সত্যি কথাই, মশার কামড়ই আমরা চিনি। প্রাণীটিকে সেভাবে চিনি না। মশা তো আর স্ত্রীর মতো সুন্দরী রমণী নয় যে অপলকে চেয়ে থাকবো। দংশনটুকুই আছে। রূপ নেই। শুনেছি যে মশা ডন দেবার ভঙ্গিতে নিতম্ব উঁচিয়ে বসে, সেই মশাই ম্যালেরিয়ার বাহন। আর যে মশা বৈঠক দেবার ভঙ্গিতে দেহত্বকে থেবড়ে থাকে, তার কামড় আছে, বিষ নেই তেমন। আর যে মশা কানের কাছে কেবল পিন পিন করে, তোমার সংসারে এসে খেটে খেটে আমার হাড়-মাস কালিকালি হল, কি পেলুম জীবনে, কয়েদখানায় ভরে রেখেছ, রান্নাঘর, শোবারঘর শোবারঘর, রান্নাঘর, এই হয়েছে জীবনের সার কথা। কত লোক কত কি করে, তুমি সারা জীবন শুধু ল্যাজা নেড়ে গেলে, মরলেই হয়। যম তুমি নেবে কবে! সেই পিনপিনে মশা হল স্ত্রী মশা।

এ সবই হল কেতাবী চেনা। ইন্টিমেট চেনা হল, মশাকে ও মাই ডারলিং কিস মি বলে ঘনিষ্ঠতা করা। আরে এসো এসো। হাতে বোসো, নাকে বোসো, পাতে বোসো। খাও খাও রক্ত খাও। সবাই শুষছে ডিয়ারী, তুমিও চোষো পেয়ারী।



বসতে না বসতেই চটাস করে চাঁটি মারলে চলবে না। একটা মশা কতটা রক্ত খেতে পারে ওয়ান সিটিং-এ। ওইটুকু তো হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। এত উতলা হবার কি আছে। রোজ যানবাহনে আমাদের কতটা রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে, হিসেব আছে ? তবে ! মশাকে নিয়ে সেমিনার, সেই সেমিনারে মেয়র, টি.ভি, রেডিও মশার একটা প্রেস্টিজ নেই ! মশাকে স্ত্রী ভেবে, গায়ে বসলেই চড়চাপড় মারা অনুচিত কর্ম। জৈনধর্মাবলম্বীদের একটি সাধনপদ্ধতি আছে, যার নাম, মচ্ছর খিলাও। নগ্ন গাত্রে স্থির হয়ে বোসো, এইবার যত মশা আছে, সব এসে বসুক। খেয়ে যাক রক্ত। খেয়ে খেয়ে পেটমোটা করে উলটে উলটে পড়ুক। কি অদ্ভুত খাদ্য ! রক্ত। সব হজম হবার পর খাদ্যের সারাৎসার হল রক্ত। রক্ত হজম হবার পর কি হয় ! মশারাই জানে। কতক্ষণে হজম হয় ! মশাদের বড় বাইরে, ছোটবাইরে আছে কি ? মশাকে ঘিরে কত প্রশ্ন ! চটাপট মেরে ফেলি বলে কিছুই জানতে পারি না। অথচ এ সবই হল জানার বিষয়। বেশির ভাগ মশাই অপঘাতে মরে। কেন ? এব্যাপারে জ্যোতিষীরা গবেষণা করতে পারেন। কি গ্রহসংস্থানের ফলে এমন হয়। বক্রীমঙ্গল ! মারক বৃহস্পতি। মশাদের হরোস্কোপ ভাল ভাবে স্টাডি করা দরকার। মশারা কেন দুধের বাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে ! কী বেদনায় ! মশারা চাটনি আর ঝোলা গুড় খেতেও ভীষণ ভালবাসে। কেন ? যমে মানুষে টানাটানির মত, চাটনি আর গুড় নিয়ে, মশাতে আর মশাইতে টানাটানি। খাইয়ে কেবল হাত নাড়ছেন, ধ্যার বাপু ধুর বাপু বলছেন, বলছেন, নাঃ ব্যাটারা খেতে দেবে না। চাটনি হল শেষ আইটেম বাঙালীর পাতে। জাপানী কমিকাজের মত মশারা, 'খায়েঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সেই কারণেই অবাঙালীরা কি প্রথমেই মিষ্টি দিয়ে শুরু করেন ! মশা কেমন খেতে ? দুএকজন আচমকা টেস্ট করেছেন। একটু ঝাল ঝাল, নোনতা নোনতা। স্ন্যাক্‌সের মতো।

আর সেইটাই তো আমাদের রক্তের স্বাদ ! টাটকা মশা খেলে অ্যানিমিয়া যায় ! সত্যি মশা নিয়ে তেমন কোনও গবেষণাই হয়নি মশাই !

এই বেশ হয়েছে

সোয়েটারের প্যাটার্নের মতো মেয়েদের কাজ কর্মেরও নিজস্ব একটা প্যাটার্ন আছে। আর সে যে কি সুন্দর! কি মজার! গোটা কতক জিনিস মেয়েদের ভীষণ প্রিয়, তার মধ্যে একটি হল আঁশ বঁটি। বঁটির এমন 'মাল্টিপারপাস ইউস' পুরুষের মাথায় আসবে না।

আজকাল বহু ধরনের পাঁউরুটি বাজারে ছাড়া পেয়েছে। এক ধরনের রুটি অনেকটা বাচ্চা কুমীরের মতো দেখতে। এই সব পাঁউরুটি কাটার জন্যে সুদৃশ্য ছুরি আছে, যার একদিকটা করাতের মতো দাঁত কাটা। চকচকে হাতল।

যেহেতু ছুরির সঙ্গে দিশী ললনাদের তেমন বনিবনা নেই, সেই হেতু, কুমড়ো কাটা, মোচা কুঁচনো, বঁটিটাই বেরলো। লাল টুকটুকে, খাঁজ কাটা, পাঁউরুটি কুমীরবাচ্চা ফ্যাঁসফোস ফালাফালা হয়ে গেল। ধারে ধারে কষ লেগে গেল। ফ্রিজ থেকে ছোট একখণ্ড ইটের মতো মাখম বেরলো। থোড় কুঁচনোর মতো মাখম কুঁচি হল বঁটিতে। তাতেও লেগে গেল নানারকম কষ। এবার এগিয়ে এল খুন্তি। তৈরি হয়ে গেল আয়ুর্বেদিক ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার। মোচার কষ, খুন্তির লোহা কষ, কুমড়োর ভুতি, আলুর বোদা গন্ধ, সব মিলিয়ে অসাধারণ শিল্প কর্ম, ঢুকে গেল টিফিন বাক্সে। খুঁত খুঁত করলে চালবে না। ক্ষতিকারক কিছু নেই। আয়রণ আছে, ট্যানিন আছে, স্টার্চ আছে, ভেজিটেবল কলার আছে। বড় কোম্পানির মাল হলে লিখে দিত, 'পারমিসিবল কলার অ্যাণ্ড ফ্লেভার অ্যাডেড।' কেস চলবে না।

বলে না, পট্ট বস্ত্র সব সময় শুদ্ধ। সেই রকম বঁটি কখনো অশুদ্ধ হয় না। বঁটি দিয়ে সেকালে মানুষও কাটা হত। একালে আরও হ্যাণ্ডি ব্লেড বেরিয়েছে। পুরো গলা পেঁচিয়ে কাটার প্রয়োজন হয় না। একটু ওপ্‌ন করে দিলেই হয়। একালে বঁটির ব্যবহার, তরিতরকারি কোটায়, পাঁউরুটি আর মাখন কাটায়, সাবানের বার কাটায়, কাঠির ঝাঁটার মাথা কেটে মুড়ো ঝাঁটা বানানোয়, দড়ি কাটায়। মেয়েদের দাড়ি থাকলে রাঁধতে রাঁধতে বঁটি দিয়ে একবার চেঁছেও হয়তো নিতেন। সেকালে সিনেমায় বীরাঙ্গনা মহিলাদের দৃশ্যে দেখা যেত,



আলুলায়িতা নারী, ভীষণা, প্রখর দৃষ্টি, একপদ উর্ধ্বে উত্থিত, অ্যায়, একেবারে বঁটি উঁচিয়ে আছেন। এলেই দেখে নেবো, আর সামনে জুজু বুড়োর মতো, হয় কোনও লম্পট জমিদার, নয় কোনও বন্দুকধারী ডাকাতসর্দার। বঁটির শক্তি কতটা গল্পে, সাহিত্যে সিনেমায় পরীক্ষিত হলেও বাস্তবে হয়নি। একবারই হয়েছিল তারকেশ্বরে। মোহন্ত এলোকেশী কেচ্ছায়। সেখানে এলোকেশীর স্বামী বিপিন বঁটি দিয়ে এলোকেশীর মুণ্ড কেটে ফেলেছিল। তা না হলে, বঁটির সত্যই কি তেমন শক্তি আছে। বঁটি ভার্সাস স্টেনগান। এপাশে এক ব্যাটেলিয়ান বঁটিধারী মহিলা, ওপাশে এক ব্যাটেলিয়ান স্টেনগানধারী। হার জিত কোন্ দিকের ? বঁটির আসলে কোনও শক্তি নেই, শক্তি হল বঁটিধারীর। বঁটি প্রতীক মাত্র। নারী হল শক্তি। কথার হুলে তিনি মৃতকেও খাটে উঠিয়ে ছাড়েন। পঙ্গুকে প্যান্টালুন পরিয়ে ফাঁকা মাঠ দিয়ে দৌড় করিয়ে ছাড়েন। কুকুরকে 'বোস' বলে বাপের বাড়ি গেলেন। সে বেচারা ধমক খেয়ে বসেই রইল ভয়ে। সাত দিন



পরে শ্বশুর বাড়িতে এসে দেখলেন, কুকুর পুতুল হয়ে গেছে।

বঁটি দিয়ে টবের মাটি খুঁড়ে, গোলাপ গাছও পোঁতা যায়। বঁটির বাঁটের বহুবিধ ব্যবহার। আদা থেঁতো করে চায়ের জলে ছেড়ে দাও। গরম জামা কাচা হবে, রিঠা ফাটাও। ছোট এলাচ থেঁতো করে পায়েসে ফেলো। আরশোলা ঝামেলা করছে সামান্য থেঁতলে দাও। বেড়ালে বাঁদরামি করছে মাথায় ঠুকে দাও।

খুন্তির নানা ব্যবহার রমণীরা পেটেন্ট করে রাখতে পারেন। চ্যাটালো দিকটা রান্না কৌটোর ঢাকনা খোলা, কাটাকুটির কাজে সব্যসাচীর মতো খেলা করে। সেদ্ধ আলু দুফালা হবে। সেদ্ধ ডিম দু টুকরো করা যাবে। আর হাতল দিয়ে চায়ে দুধে চিনি গুলনো যাবে। সংসারকে সহজ করে নিতে হলে এক একটি জিনিসকে হরেক কাজে ব্যবহার করতে হবে। অনেকটা ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট'-এর মতো। মেয়েরা এই শাস্ত্রে অতিশয় পারদর্শী। শিলনোড়ার নোড়া যখন আছে, হাতুড়ির কি প্রয়োজন ! দেয়ালে পেরেক, মারো

নোড়া। জুতোয় পেরেক ? মারো নোড়া। শিলের ওপর নোড়া, সে যেন কৃষ্ণের হাতে সুদর্শনের মতই খোলতাই। সেকালে দাঁতের ওপরেও নোড়ার ব্যবহার ছিল। তা না হলে কথাটা এলো কোথা থেকে—নোড়া দিয়ে দাঁত ভাঙবো একটা একটা করে। সে যুগে ডেন্টিস্ট ছিল না। দাঁত তোলাবার প্রয়োজন হলে, স্বামীরা অল্পস্বল্প দুষ্টুমি করতেন ; আর স্ত্রীরা রাগলে রক্ষা নেই। তখন তাঁরা ডেন্টিস্ট, আকুপাংচারিস্ট, সুইপার, সার্জেন, বোলার, ব্যাটসম্যান। সেই বিখ্যাত সংগীতের মতো—একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি তো আগে।

মেয়েদের শাস্ত্রে, 'এই বেশ হয়েছে' বলে একটা সুন্দর কথা আছে। বিছানার চাদর পাততে পাততে বিরক্ত। দু'পাশ সমান হচ্ছে না। এপাশে, ওপাশে দু'বার হাতের চাপড় মেরে রণেভঙ্গ—'এই বেশ হয়েছে।' ঘর গুছোবার সময়, এখানে এটা, ওখানে সেটা, শেষে হালে পানি না পেয়ে এর ওপর তার ওপর, 'এই বেশ হয়েছে।' জামায় বোতাম বসানো। বলে না, 'অতিবড় ঘরনী ঘর না পায়', বোতামও তাই, সহজে ঘর পায় না, হয় একটু নিচে, না হয় একটু উঁচুতে। জামা পরে বোতাম লাগালেই, সামনের প্লেটে ঢেউ খেলে গেল।

'এ কি হল ?'

ঠোঁটে ছুঁচ। সুতোর ন্যাজ ঝুলছে। শিল্পী এগিয়ে এলেন। তলার দু'প্রান্ত ধরে মোক্ষম টান। ঘাড়ের কাছে 'পড়াক' আওয়াজ, সেলাই খুলে গেল কোথাও। এক পা পেছলেন। ছুঁচ চাপা ঠোঁটে বললেন, 'এই বেশ হয়েছে।'

ছোট ছেলে বা মেয়েকে সাজাতে বসেছেন মা। কত কি হল ! কত রকম হল। শেষে হয়তো কাজল। ইচ্ছে ছিল সরু করে টানবেন। গেল ধেবড়ে। আঙুল দিয়ে মোছার চেষ্টা হল। শেষে কপালের একপাশে 'নজর-টিপ' মেরে মুখ দেখতে দেখতে মা বললেন, 'এই বেশ হয়েছে।'

'এই বেশ হয়েছে' ভাবটি আছে বলেই মেয়েরা সর্বাবস্থায় মানিয়ে নিতে পারেন। তা না হলে এদেশে মেয়েদের আমরা যে সম্মানে রাখি !

জ্যাক অ্যাণ্ড জিল

গীতা বলেছেন কর্ম করবে ; কর্ম ফলের কথা চিন্তা করবে না। করিনি। কর্ম করেছি। সংসার পেয়েছি। ইংলিশ মিডিয়াম। ঘাড় পর্যন্ত চুল। বাঁকা চোখে তীক্ষ্ণ চাহনি। বেশি ট্যাঁ ফোঁ চলে না। ইংরিজির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়। তখন দু হাত তুলে গাইতে ইচ্ছে করে, 'ও মাদার মেরি। সেভ মি লর্ড।' এই বস্তুটি প্রেমের ফল। কুফল কি সুফল বিচার করিনি। কারণ, সে যে গীতার বাণী।

কর্ম করেছি। ফল দুটি সন্তান। একটির নাম ট্যাং, আর একটির নাম ভ্যাঁ। ছেলে আর মেয়ে। এই দুটি কি ফল, শেষ জীবনে জানা যাবে। এখন আধুনিক শিক্ষার কাবাইডে পাকানো হচ্ছে। সংসার বলতে, আমি জ্যাক, আমার স্ত্রী জিল। আর ওই দুটি ফল ট্যাঁ আর ভ্যাঁ। একটা তিন চাকার ফ্ল্যাট। বেডরুম, কিচেন, ডাইনিং স্পেস। মাঝারী মাপের বাথরুম। বাথরুম শূন্যে দু'খণ্ড করে, মাথার ওপর জিনিসপত্তর রাখার খুপরি, যার নাম লফ্‌ট। সেখানে ওঠা নামা করার অ্যালুমিনিয়াম মই। খুপরিতে মাল আছে মালসা আছে। ডেগুডেকচি আছে। আরশোলা আছে। লেংটি আছে। মাকড়সা আছে।

ডাইনিং স্পেসে একটা ফ্রিজ আছে। খাবার জুটুক না জুটুক ডাইনিং টেবিল আর চারটি চেয়ার আছে। একটা ওয়াশ-বেসিন আছে। অ্যালুমিনিয়ামের দেয়াল ঝোলায় ঝোলে গোলাপী তোয়ালে।

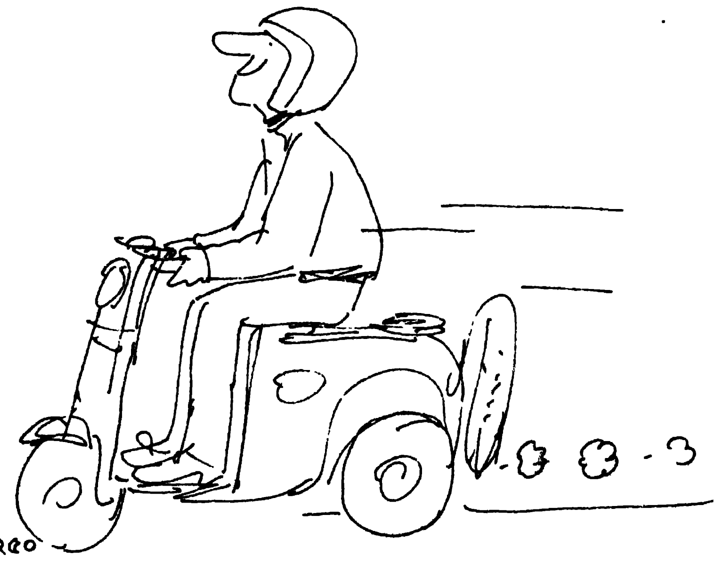
বাথরুমের তাকে শ্যাম্পু আছে। সাবান আছে। পেস্ট, ব্রাশ আছে। আছে দাড়ি কামাবার সাবান মলম, স্যাণ্ডউইচ ব্রেড লাগানো শেফটি রেজার। আছে হেয়ার লোশান। শোবার ঘরে টেপডেক কাম রেকর্ডপ্লেয়ার। ঢাউস দুটো স্পিকার। উফার আর টুইটার সমেত। মেমসায়েব গান গাইলে দাঁতের কিড়িমিড়ি, চিউইংগাম চিবনোর চ্যাকোর চ্যাকোর পর্যন্ত শোনা যায়।

ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট টিভি মুখ ঘুরিয়ে আছে। মুখ ফিরিয়ে আছে কালার টিভি। রাত্রে পর্দায় জীবন লাফায়। রেডিও আছে খাটের তলায়। কেউ শোনে না। গোটাপঞ্চাশ ইংরিজী আর গোটা দশেক বাংলা গানের রেকর্ড আছে। ইংরিজী গানের কি সব নাম। ডুরান ডুরান পুসিক্যাট, পুলিস, অ্যাবা, কারপেন্টার,

ম্যানমেশিন, ড্রাকুলা। বাংলা গান আর শোনা যায় না। আয় লো অলি কুসুমকলি। বাঙালী যখন পোস্ত পুঁইশাক, মোচা, কচু ঘেঁচু খেত, এখন ওসব সহ্য হত—'মালা গাঁথবো। ফুল তুলবো। তোমার গলায় দোলাবো। প্রিয়তমো ॥ অথবা 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী। দেবো খোঁপায় তারার ফুল। কণ্ঠে তোমার পরাবো মালিকা।'

একালের জ্যাক অ্যাণ্ড জিলের সংসারে ওসব গেঁইয়া-কালচার আর চলে না। কে আর এখন ফুল তুলে মালা গাঁথবে, বসে জানালার ধারে খোলা এলো চুলে ! আগে তবু বিয়ে আর ফুলশয্যার রাতে গলায় মালা দুলত। এখন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে, 'তুমি আমার আমি তোমার' ভাঙা ডট পেনের খচখচ সই। উইটনেসের সই। বাস সংসার পাতা হয়ে গেল। চীনে রেস্তোরাঁয় সুইট অ্যাণ্ড সাওয়ার। ন্যালবেলে চৌ। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস ইনসাইড ওয়ান ব্লু মসক্যুইটো নেট।

একটা স্কুটার বা হালকা মটোর সাইকেল। সামনে হেলমেটধারী জ্যাক পেছনে জিল, জ্যাকের ভুঁড়ি খামচে ধরে অফিসমুখো। দু'জনকেই চাকরি করতে হবে নয়তো ইকনমি আপসেট হয়ে যাবে। ফ্ল্যাটের ভাড়া সাতশো। এটা ওটা সেটা মিলে পাঁচ ছ হাজারের তামাশা। স্কুটারে চাপিয়ে স্ত্রীকে যে কোনও একটা



অফিসে ছেড়ে না দিয়ে এলে বেলুন ফুস্। জ্যাকের ধরাচুড়ার দাম, প্যান্ট জামা জুতো ঘড়ি বগলস মগলস নিয়ে হাজার খানেক। জিলেরও তাই। আর কি সেকাল আছে। ধুতি কুড়ি জামা দশ চপ্পল পাঁচ। একটা লিপস্টিকের দাম কুড়ি টাকা। এক বোতল শ্যাম্পু চক্ষু ছানাবড়া। ঠাটবাট রাখতেই তহবিলে হাফসোল। পেটে ভিটামিন ক্যাপসুল। জননীকে চিঠি, 'পূজনীয়া, এ মাসেও পঞ্চাশ ফেঁসে গেল। সামনের মাসে একেবারে থ্রি মানথস বকেয়া দেড়শো এম ও। আপাতত বেড়ার গাবভ্যারেণ্ডা চিরে পুষ্টিকর ঝোল খাও। ছানি আর একটু পাকুক তারপর চাকু। শতকোটি প্রণাম। তোমার স্নেহের জ্যাক। পুঃ জিল আমার দিলে ঝিলমিল।

সকালে হুড়োহুড়ি, রাতে 'টুউ টায়ার্ড।' জিল বললে, 'জ্যাক ডারলিং আজ এম ডি ঠাসা সাত পাতা ডিকটেসান দিয়েছে। আই অ্যাম ডগটায়ার্ড। ফ্রিজ খুলে দেখ কি আছে। আজ নো কুকিং।'

রান্না খাবারের মর্গ হল ফ্রিজ। গত রবিবারের মুর্গি, মমি হয়ে হিম পোয়াচ্ছে। ডেয়ারির দুধ, পলিথিনের পাতলা খোলে নিরেট মাথার বালিস। ওষুধের মতো কোনও কোনওটার ডেট একস্পায়ার করে গেছে। খেলে শরীরের কি অবস্থা হবে



কেউ জানে না।

গীতার বাণী—কর্মে তোমার অধিকার পার্থ কর্মফলে নয়।

জ্যাকের মনে পড়বে, আমেরিকান ম্যাগাজিনে পড়েছিল, ফ্রীজ থেকে বের করে ফ্রোজন এক কোয়া কমলালেবু মিশিগানের কে এক সায়েব টিভি দেখতে দেখতে গিলে ফেলেছিল অন্যমনস্ক।

তিন বছর পরে সার্জেন ছুরি চালিয়ে, পেট কেটে, সেই কোয়া অবিকৃত উদ্ধার করলেন। পাকস্থলীর কোণে তিনি গীতার আত্মপুরুষের মতো, নৈনং দহতি পাবক, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রামি হয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিল।

জ্যাকের মনে পড়বে, কর্মের গুণে সে আজ কোন জীবন থেকে কোন জীবনে এসে পড়েছে। 'কি ফল লভিনু হায়!' ধিনতা ধিনা পাকা নোনা। মনে পড়বে শৈশব। গন গনে উনুনের সামনে মধ্যবয়সী এক মহিলা। তার মা। প্রশান্ত মুখচ্ছবি। কোথাও লেখা নেই—ডারলিং আই অ্যাম টুউ টায়ারড। হনুমান্থিয়া আজ অফিসে আমায় চটকে ছেড়ে দিয়েছে গো। চাটুতে গরম রুটি। উনুনে পড়ে পেট ফুলে উঠছে ফোঁস করে। গমের আটার পোড়া পোড়া, মিষ্টিমিষ্টি গন্ধ। অদূরে ধ্যানস্থ সুখী বেড়াল। চিকেন নয়, চৌ নয়। কুমড়োর ছক্কা আর গরম রুটি।

জিল বলবে, 'ও জ্যাক ডোন্ট বি প্রাচীন। প্লিজ পাস ওভার দি ঝোল।' চিকেন কারির সুদৃশ্য পোরসিলেন-বাটি ঠেলে দেবে ঘুম ঘুম ক্লান্ত জিলের দিকে। গরম হয়েছে ; কিন্তু তাপ সমান ভাবে সবদিকে ছড়াতে পারেনি। মাংসর টুকরোর খাঁজে খাঁজে গত তিন দিনের জমাট ঠাণ্ডা থমকে আছে। এর নাম, চিকেন হট অ্যাণ্ড কোল্ড। জিল বলবে, 'জ্যাক ডারলিং প্লিজ ক্লিন দি টেবল। গিভ মি এ বড়ি। অফুল মাথাধরা।'

জ্যাক বলবে, 'জিলু সোনা কি পেলুম আমি জীবনে!'

'জ্যাক সোনা শোননি গান, সময় পাল্টালেও বরাত কি ঘোচে!' 'মা আমায় ঘুরাবি কতো। এমন চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো।'

আংটি ও অনামিকা

সুন্দর, ফর্সা, চম্পাকলি আঙুলে, লাল, নীল অথবা ফিকে হলুদ কি সাদা পাথর বসানো একটি আঙটির কোনও তুলনা হয় না। অনামিকা আর আংটি, যেমন জীবন আর যৌবন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের হাত আর বাঁশি। সেকালের নাক আর নোলক। চুল আর খোঁপা। ব্রেড অ্যান্ড বাটার। বাঁধাকপি আর ভেটকি।

আগেকার বাংলা যাত্রায়, এখনকার ইংলিশ মিডিয়াম যাত্রায় নয়, নিয়তির ভূমিকা থাকত। মাঝে মাঝেই তিনি আসরে দু'হাত তুলে ছুটে আসতেন চরিত্রদের সাবধান করতে। তাঁর সমস্ত সতর্কবাণী উচ্চারিত হত সঙ্গীতে। তারস্বরে গান ধরতেন—'ও পথে বাড়াস নে তুই পা।' পা বলতেন এই ভাবে পাহা।

আমাদের জীবনে নিয়তি তো একবারই আসেন। কোনও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন না। শুধু ফুস করে ফুঁ মেরে দেন। দীপ নিবে যায়। জীবন যাত্রার পালা হলে, অনামিকায় আংটি পরাবার সময় নিয়তি গেয়ে উঠতেন, 'ও পথে বাড়াস নে তুই পাহা।'

রাত প্রায় বারোটা। দোর তাড়া সব বন্ধ হয়েছে। সব আলোর সুইচ অফ করা হয়েছে কিনা দেখা হয়ে গেছে। সিঁড়ির তলায় খাঁজে খোঁজে অবাঞ্ছিত তৃতীয় ব্যক্তির সন্ধান শেষ হয়েছে। গ্যাসের মুণ্ডু কলের মাথা চেক করা হয়েছে। মেজ মেয়ে বালিশের পাশে রেডিও খুলে ঘুমোয়। রেডিওর ক্যাড়ক্যাড়ানি বন্ধ করতে করতে মন্তব্য করা হয়েছে, 'নবাব নন্দিনী। শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে গোবেড়েন না খেলে স্বভাব পাল্টাবে না।' ছোট ছেলে ঘুমোবার আগে বই পড়ে। কিছুক্ষণে মধ্যেই বই তার বুকে পড়ে। তারপর সে বই সমেত পাশ ফেরে। বই তখন প্রায় এগ রোলের দশা পায়। সেই বই দেহের তলা থেকে টেনে বার করতে করতে স্নেহের তর্জন হয়েছে—'দেখবো দেখবো বউ এসে কেমন করে।' ঘরে ঘরে আলো নিবেছে। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ হল। ঘাড়ে পাউডার চাপল। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বন্ধনী আলগা হল। আলো নিবিয়ে বিছানায়। উদ্দেশ্যে নমস্কার। সেই নাট্য পরিচালককে, যাঁর কৃপায়

আজকের পালা শেষ হল।

খোঁপা আলগা করে বালিশে মাথা। বুকের ওপর এলিয়ে আছে পাখির ডানার মতো সংসারের হাল ধরার ক্লান্ত দুটো হাত। সব ঠিক আছে। আমি আছি, স্বামী আছে, ছেলে মেয়েরা আছে। বিছানা, বালিশ, মশারি, এমন কি ম্যাওটাও তুলোর বলের মতো টিভির মাথায় ধ্যানস্থ। থিয়েটারের পুরো ইউনিটটাই, ড্রেস, মেক-আপ, মিউজিক, লাইট সমেত গদিতে ফিরে এসেছে। আবার পালা শুরু হবে কাল সকালে।

তবু যেন মনে হচ্ছে, কি একটা নেই। মিসিং।

আবার শুরু হল স্টকচেকিং। এবার এজি বেঙ্গলের বাঘা অডিটারের কায়দায়। জানালার ধারে, ডিভানের, পিকলু বাজাচ্ছে নাকে স্বামী অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। পাশের ঘরে ছেলে। তার পাশের ঘরে দুই মেয়ে। নমিতা আর শমিতা। খাবার ঘরের মেঝেতে শঙ্করী। মানুষের স্টক ঠিক আছে। জীব জগতের স্টক? বেড়াল টিভির মাথায়। ছটা মুনিয়া খাঁচায়। রান্নাঘরে আলু আছে, পটল আছে, ঢ্যাঁড়স আছে। ফ্রিজে এক চাকা মাছ, একটা মুরগীর ঠ্যাং, আধ বোতল স্কোয়াশ, মাখমের অর্ধচন্দ্র, সাতটা পঞ্চমুখী জবা। কাল দুপুরে শিলে বেটে, মা মেয়েতে মাথায় মেখে বসে থাকতে হবে দু ঘণ্টা। পঞ্চমুখীর অসীম ক্ষমতা। চুল পরচুলের মতো চিটিয়ে যাবে। চিরুনি দিয়ে ধীরে ধীরে জট



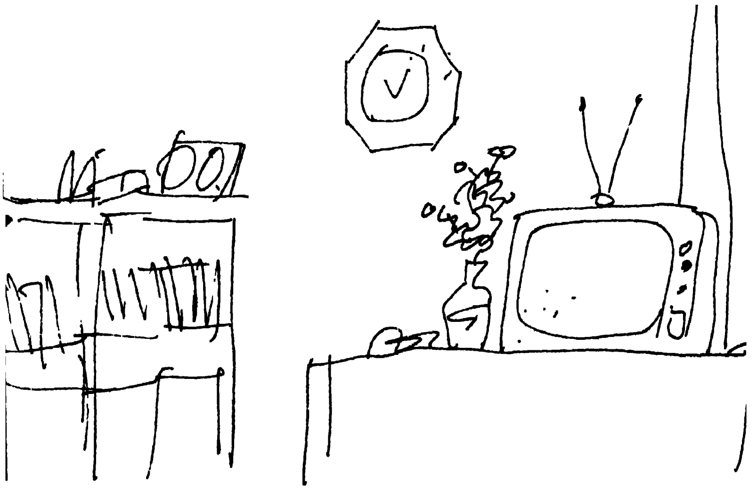
ছাড়াও। সাতদিনে সাত কোটি চুল বেরোবে। কন্যা হবে কেশবতী।

আমার আংটি! বুকটা ধড়াস করে উঠল। অনামিকায় পোখরাজ বসানো দেড় ভরির আংটি ছিল। গেল কোথায়! দাগ আছে কিন্তু দাগাবাজ নেই। ও জানতে পারলে আজ মেরে ফেলবে। এই নিয়ে সাতবার হারাল। সেভেন টাইমস। প্রত্যেকবারই পাওয়া গেছে অনেক জল ঘোলা করে।

একবার পাওয়া গেল সাবানদানি থেকে। একবার উঠল সাবান জলের বালতি থেকে। একবার বেরলো লুচির•লেচি থেকে। কোলাঘাটে সদলে সব পিকনিকে গিয়েছিল শীতকালে। লুচির ময়দা ঠেসছিল। খুলে চলে গিয়েছিল ময়দার তালে। লেচি কাটা হয়ে গেল। বেরলো বেলতে গিয়ে। একবার চলে গিয়েছিল প্যানে। অমল হাতে রাবার গ্লাভস পরে তুলে এনেছিল। আটকে ছিল 'ইউ'-এর মোচড়ে। আর কিছুক্ষণ পরে মনে পড়লে চলে যেত সেপটি-ট্যাঙ্কে।

'আজ আবার কোন চুলোয় ফেললুম!'

পা টিপে টিপে বাইরে। মধ্যরাতে নিজের বাড়িতেই চোরের মতো ঘুরছে সুন্দরী। কেউ যেন না জানতে পারে! কেউ যেন না জেগে যায়! দেড়ভরি সোনা, মূল্যবান পোখরাজ। এই প্রথম অনুভব করা গেল, চোরেদের কেমন লাগে! বুক টিপটিপ করে। পা কাঁপে। দেয়াল ঘড়ি খিটখিটে শাশুড়ীর মতো



কিটকিট করছে। পা ফেলতে হচ্ছে সাবধানে। হাতকে বশে রাখতে হচ্ছে। হাত লেগে ফুলদানি, গেলাসমেলাস উলটে না পড়ে শব্দ করে।

বাথরুমে নেই। সাবানদানিতে নেই। পাউডারের কৌটোতে নেই। জর্দার খালি কৌটো খালি। আয়নার পাশে নেই। পা টিপে টিপে ছাদে। গাছে জল দেবার সময় খুলে পড়েনি তো! মাঝ রাতের ভৌতিক ছাদ হাহা করে হাসছে। পঞ্চমীর চাঁদ আকাশের গায়ে রুগ্ন মেয়ের মুখের মতো। ছাদে গাছ আছে, ছেতরে আছে টিভি-মাচা। কোণে একটা ভাঙা বোতল, গোটা দুই ফিউজ বালব। স্ট্র্যাপ ছেঁড়া বহুকালের একপাটি হাওয়াই চপ্পল রোদে পুড়ে জলে ভিজে বিবর্ণ সংগ্রামীর মতো একপাশে পড়ে পড়ে স্লোগান ছাড়ছে—এ লড়াই বাঁচার লড়াই। থোকা থোকা ফুটে আছে রঙবেরঙের দোপাটি। সব আছে। নেই আংটি। একটা উচ্চিংড়ি অদৃশ্য স্থান থেকে প্রখর সুরে পাখার শব্দ তুলছে যেন হোলনাইট ফাংশানের ক্ল্যাসিক্যাল আর্টিস্ট।

একদিন গেল, দু দিন গেল। কেউ জানে না কি হয়েছে। বড়ই বিমর্ষ। বৈষ্ণব কবি হলে বলতেন, 'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যাথা'। তালতলার জ্যোতিষী আশ্বাস দিলেন, 'বাড়িতেই আছে। বেশি দূরে যায়নি। মনে করার চেষ্টা করুন, ঠিক খুঁজে পাবেন।'

মন! মনেই যদি করতে পারবো, তাহলে আর হারাবে কেন!

শেষে আত্মসমর্পণ, 'হ্যাঁ গো, আমার আংটিটা কি তুমি পেয়েছ?'

'আবার হারিয়েছ?'

কথা নেই। দুটি জলভরা চোখ। ঠোঁট কাঁপছে, পাতলা দুটি ঠোঁট।

'আমার আঙুলে এটা কি? কার আংটি!'

চোখে জল, মুখে হাসি।

'আর কি সে বয়েস আছে? বলো? যে তুমি আমার হাত নিয়ে খেলা করবে! যে হাত একদিন তোমার হাত ধরে ঘরে তুলেছিল! অধরাতেই এখন আমরা ধরা আছি তাই না!'

ফোর এগেন

বেঁচে থাকাটা কোনও কালেই খুব সুখের নয়। একালে তো এক যন্ত্রণা। অনেকটা গরম জলে পা ডোবানোর মতো। খুব উপকারী নিঃসন্দেহে কিন্তু অসহ্য। যতবার জন্মাবো ততবারই পাপক্ষয় হবে, আবার নতুন পাপও জমবে। কে কবে সারা জীবনই পুণ্য কর্ম করে যেতে পারেন। মানুষের স্বভাব বেড়ালের মতো। পাত থেকে থাবা মেরে মাছ তুলে নিতে গিয়ে গাঁট্টা খেল। সরে গিয়ে চোখ বুজিয়ে বসে রইল তপস্বীর মতো। ও মা আবার এগিয়ে এল গুটি গুটি। আবার থাবা মারার চেষ্টা। বেড়াল কতবার শুনেছে, নোলায় ছ্যাঁকা দেওয়া হবে। শুনেছে, ভুলেছে করেছে, মেরেছে, সরেছে, ভুলেছে আবার এসেছে। দুধের ডেকচির ঢাকা সরিয়ে দুধ খেয়েছে চুকুর চুকুর। বাজারের থলে থেকে মাছ মুখে নিয়ে, জানালা গলে পালিয়েছে। খাঁচার ওপর উঠে থাবা মেরে পোষা পাখির মুণ্ডু ছিঁড়েছে।

পাপ কাকে বলে হাজার বছর ধরে তার ফর্দ তৈরি হয়েছে। ফর্দ খুব একটা বিশাল নয়। পাপকর্মের সংখ্যা হয়তো গোটা দশেক, আর এই দশ কর্মার চক্রেই মানুষ ঘুরবে ঘুরোন চাকির মতো। পাপের ফের থেকে কিছুতেই পারবে না বেরিয়ে আসতে।

বলা হল, দ্যাখো, কথায় কথায় মিথ্যে কথা বোলো না। 'মিথ্যে কথা বলা পাপ। মিথ্যাবাদীকে কেহ কখনও বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদী ভুলিয়া সত্য কথা বলিলেও সকলে মিথ্যা ভাবিয়া থাকে।' ঈশ্বরচন্দ্র এই ভূমিকার পরেই রাখাল বালকের গল্প বললেন। আমরা পড়ে পড়ে তুলোধোনা করে ফেললুম। সত্যবাদী কিন্তু হলুম না। একালের ছেলেদের ওই সব নীতি-গল্প আর পড়তে হয় না। যুগ পালটেছে, পাঠ্যও পালটে গেছে।

সেই ছেলেবেলায় অঙ্কের গৃহশিক্ষককে অঙ্ক সারা দিনেও কষা হয়নি বলে, বলেছিলুম, পেট ব্যথা করছে স্যার। করুণ মুখচ্ছবি। পেটে চেপে ধরে মাঝে মাঝে দু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছি। নিখুঁত, নিপুণ অভিনয়। শিক্ষকমহাশয় বললেন, 'যাও তাহলে জোয়ানের আরক খেয়ে আজ শুয়ে পড়।'

সেই রাতেই ছিল মোহরবাবুর মেয়ের বিয়ে। বড় লোক খুব ঘটা। পংক্তি ভোজনে খেতে বসেছি। গরম গরম রাধাবল্লভী পাতে পড়েছে। মাছের চপ আশেপাশে ঘুরছে। গন্ধে নোলায় জল এসে যাচ্ছে। রাধাবল্লভীর সঙ্গে ঘুগনি পরিবেশন করেছে। মুখে তুলতে যাচ্ছি। হঠাৎ পেছন থেকে কানধরে কে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে—'হতভাগা! পেটের ব্যাথায় পড়তে পারলি না এখন বসেছিস পাতে। অ্যায়! হাঁক পাড়লেন আমার মাস্টারমশাই। মোহরবাবুর বড় ছেলে ছুটে এল। মাস্টারমশাই বললেন, 'খোকা, ওই মাটির গেলাসে যে জল আছে, সেই জলে দু'খাবলা নুন ফেল, আর বড় একটা পাতিলেবু রস করো।'

জোঁদা টক, নুনে যবক্ষার সেই বস্তু খেয়ে, কানমলা, আর চাঁটি যেন ভোজশেষের পানের খিলি, ফিরে এলুম বাড়িতে। পড়ে রইল বল্লভী, নারকেল দেওয়া ঘুগনি। মাছের চপ আসছিল, তারপর আরও আরও সব। সে কি আপশোষ!

সেই শিক্ষা অবশ্য কোনও কাজে লাগল না। জীবনে মিথ্যের ফাউণ্ডেশান ফোর্ড ফাউণ্ডেশানকেও হার মানায়। বাঘ, সিংহ, বেড়াল হায়নার মতো, মানুষেরও কিছু স্বভাব আছে বা সহজে বদলানো যায় না। বাঘের বাচ্চাকে ঘি আলোচাল খাওয়ালে সে কি শূয়োরের বাচ্চা হবে। ওই জন্যেই তো বলে, 'স্বভাব না যায় মলে।' মরলেও স্বভাব যায় না। ত্রৈলোক্যনাথ ডমরু চরিতে লিখেছিলেন—বিশাল এক কুমির আচমকা ডাঙ্গায় উঠে এক তরকারিওয়ালীকে তার আনাজের ঝুড়ি সমেত গপ করে গিলে তলিয়ে গেল জলে। অনেক দিন



পরে সেই কুমির মারা পড়ল। পেট কেটে দেখা গেল, সেই কুমিরের পেটে, চুবড়িটাকে উলটে সেই আনাজওয়ালী বসে বেগুন বিক্রি করছে আর কনুই নেড়ে নেড়ে সোনার বাউটি দেখাচ্ছে।

সংসারে একজনকে মিথ্যে কথা বলা যায়, শাস্ত্রেরও মনে হয় সমর্থন আছে, সে হল স্ত্রী। পুত্রকে বলা উচিত নয়। পুত্রের ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে যাবে। ছেলে যদি প্রশ্ন করে—'তোমার কাছে দুটো টাকা আছে?'

টাকা যদি থাকে তাহলে বলতে হবে—'হ্যাঁ, আছে, তবে তোমাকে দোব না কারণ তোমার স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে।'

স্ত্রী যদি প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ গা দশটা টাকা হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলতে হবে, 'দশ টাকা! তোমার দেওয়া পেনসানে আমার মাস চলে জানই তো!'

মিথ্যেকে তৈলাক্ত করে ছাড়া হল। সত্যিই কি আর দশটা টাকা ছিল না। এইভাবে বললে নারীজাতি বেশ খুশি থাকে। নারীজাতিকে খুশি রাখার নির্দেশ শাস্ত্রে আছে। নারী আদ্যা শক্তি।



এইবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমাকে তো সারা মাসের খরচ হিসেব করে দিয়ে দিয়েছি রানী।'

'ওই যে তুমি বললে, আজ একাদশী, মাকে যেন দই মিষ্টি এনে দেওয়া হয়। আমার হাতও তো খালি!'

'তোমার হাতও খালি। সারামাস চালাবে কি করে?'

'চালাতে হবে।' এমন একটা মুখ করলে যেন প্রেসিডেন্ট রেগন বেলফাস্ট ক্রাইসিস নিয়ে ভেবে পড়েছেন।

আসলে ওটাও মিথ্যে। স্বামীও মিথ্যে, স্ত্রীও মিথ্যে। মিথ্যের মালসায় সংসারলতাটি দুলছে। খুন কা বদলা খুনের মতো, মিথ্যাকে বদলা মিথ্যা।

কত বার মানুষকে বলা হল, লোভ পাপ। ছড়া তৈরি হল, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। কে শুনলে। তালের বড়া খাইয়া নন্দ অম্বলেতে মরিল। পৃথিবীতে লোভনীয় বস্তুর শেষ আছে! লোভী না হয়ে উপায় আছে! অর্থনীতিক বলবেন, আরে লোভ আছে বলেই কনজিউমার ইন্ডাস্ট্রি বেঁচে আছে। এমন একখানা শাড়ি করে চোখের সামনে দুলিয়ে দিলুম, তিন লাখ মহিলার তে-রাত্তির ঘুম চলে গেল।

সব শেষে যা হল, সে বড় সাংঘাতিক। বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে বউ দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল। নিজের বছর দশেকের পুরনো বউকে আর ভাল লাগছে না—নাক থ্যাবড়া, চোখ ছোট, ঢিপ কপালী, কটুভাষী। হায়, এ আমি কি করলুম। আমারও হত। আমিও কত কি পেতুম। হায়।

স্ত্রীও বলছে, হায়, এ আমার কি জুটল বরাতে।

স্বামী বলছে, হায়, এ আমার কি জুটল বরাতে।

আর এই হায় হায় করতে করতেই দিন হারাতে থাকে। পাপ বাড়তে থাকে। অবশেষে একদিন হুস্ করে হাওয়াই। আবার ফিরে এসে আবার সেই একই অনুক্রম। যেমন আধুনিককালের ভাষায় বলে—'ফের এগেন!'

সাক্ষাৎকার

মা তুমি এলে ?

হ্যাঁ বাবা। কেমন সব আছিস !

কেমন দেখছ মা ?

কেমন যেন পাগলাটে হয়ে গেছিস।

ঠিক ধরেছ মা। আধ-পাগলা গোছের। এক একটা দিন যাচ্ছে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। সার্জারি উইদাউট অ্যানেসথেসিয়া। গতবার তুমিও গেলে বড় মেয়েটা চলে গেল আন্ত্রিকে।

সে আবার কি রে ? তান্ত্রিক শুনেছি, আন্ত্রিকটা কি ?

যান্ত্রিক মা। যান্ত্রিক গোলোযোগ। রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে পড়লে সবই যায়। সুখ যায়, শান্তি যায়। জন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তুমি মা এখানকার এক ফোঁটা জলও যেন খেও না। ভাইরাসে ভর্তি। তেষ্টা পেলে চা খেও। কেমন ? জল খেয়েছ কি মরেছ।

পাগলা। আমি আবার মরব কি ! আমি তো দেবী ! দেবী দুর্গা।

এ দেশ সব পারে মা। সব দেব-দেবীই প্রায় শেষ করে এনেছে। তুমি বেঁচে আছ চাঁদার জোরে। বারোয়ারী হয়ে। বাড়ির পুজো তো সব লাটে উঠে গেছে। দুর্গা-দালানে সব খাটাল বসিয়েছে। অসুরের বাহন মোষ সেথায় ফোঁস ফোঁস করছে। প্রাতে বাবুরা বালতি হাতে আসছেন স্বাস্থ্যের সন্ধানে। তোমার চরণামৃতের বদলে, ফুকো মারা দুধ। তোমার আরাধনায় তো মা এই আমাদের নিট পাওনা। ভিটে মাটি চাঁটি। ভায়ে ভায়ে কাজিয়া। মামলা। ভিটেয় ঘুঘু। কার্নিসে বটের চারা। শেষে 'সেল'। অবাঙালী ধন-কুবের সব গিলে নিলে। বাঙালী এখন চোষ বুড়ো আঙুল। নিজের দোষেই তুমি মা আদর হারালে। এখন এই রোডসাইড প্যাণ্ডেলে, বাঁশের মাচায়, যে যেমন সাজায় সেই সাজে দিন চারেক খাড়া থাক। অকথ্য ফিল্মি-গান শোনো সংস্কৃত-স্তোত্রের বদলে, আর দু চোখ ভরে দেখে যাও পেয়ার কাকে বলে। সুধাপান করিনে আমি সুরা খাই জয় বাঙালী বলে। সকাল থেকেই পা টলবে। সন্ধেবেলা চিৎপটাং।



আমরা খুব খেতে শিখেছি মা। পঞ্চ ময়ে ম্যাম্যা করছি।

কি কি খেতে শিখেছিস ?

ঘুষ খেতে শিখেছি। বেপরোয়া ঘুষ। চোলাই তো এখন ঘরে ঘরে। গাঁজা ভায়া ইওরোপ 'ফ্রুস' নাম নিয়ে বটতলা থেকে চারতলায় উঠে এসেছে। ছিলাম না নিলে আঁতেল হওয়া যায় না। 'আঁতলামো' আর 'মাতলামো' এখন যমজ ভাই। ঝাঁটা, জুতো, লাথি খেতে শিখেছি। এক সময় সারা ভারতে, দেশে-বিদেশে আমাদের খুব সম্মান ছিল। এখন আর নেই। বেড়ালের মত দ্যাখ-মার শুরু হয়ে গেছে। কত জায়গায় যে 'বাঙালী-খেদা' আন্দোলন শুরু হয়েছে মা ! ধরছে আর কোতল করে ছেড়ে দিচ্ছে। ঝড়ের এঁটো পাতার মতো পোঁটলাপুঁটলি বগলে একবার এদেশ একবার ওদেশ। নিজেরাই নিজেদের মেরে শেষ করে দিলে আবার কায়দা করে মিছিল বের করে—যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। আমেরিকা তুমি হাত ওঠাও। বিশ্ব নিয়ে ভেবে মরছি, চিল্লে চিল্লে গলা ভাঙছি, মিছিলে ঘুরে ঘুরে টেংরি খুলে যাচ্ছে, দূতাবাসের সামনে কুশ-পুত্তলিকা দাহ হচ্ছে, আর এদিকে ন্যাপলা ক্ষুর চালাচ্ছে পটলার গলায়। ভোমলা রোজ রাতে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বউ পেটাতে শুরু করে। আর মা তার শিশু-সন্তানটিকে বুকে চেপে ধরে ন'তলা থেকে রাস্তায় ঝাঁপ মারে।



তোদের এ অবস্থা কে করলে বাবা।

আমাদের অহঙ্কার মা। হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টো-ডে, এই আস্ফালনে ন্যাজ নেড়েছি যদ্দিন বৃটিশ ছিল। ফুলকো নুচি, মালাইকারী, শীতকালে সাঁওতাল পরগনা। যত না বীর তার চেয়ে বেশি বীরত্বের কথা। বাঘ মেরেছি, সায়েব মেরেছি, সাপেরে হেলায় খেলিয়েছি। আসলে আমরা বউ ছাড়া বিশেষ কিছু মারতে শিখিনি। সে যুগে আর একটা পেটাবার জিনিস ছিল, সেটি হল সন্তান। তাকে খড়ম পেটাও, পেটাও চ্যালা কাঠ দিয়ে, জুতো-পেটা করো। একালে সে বস্তুটি হাতছাড়া। সন্তান এখন সামাজিক সম্পত্তি। স্কুল থেকেই ট্রেনিং শুরু। কলেজে ঢোকার মুখেই পুরো পাকা। রকবাজ, কলকেবাজ, বোতলকুমার। শিক্ষা মানে তো, প্রিন্সিপ্যাল পেটানো, ভি সি ঘেরাও আর ফাঁকে ফোকরে সুস্মিতা, মধুমিতা, মালবিকার সঙ্গে সিনেমা, থিয়েটার, গঙ্গার ধার। আজকাল আবার তুই তোকারি চালু হয়েছে। সে বেশ মজা মা। প্রেম পাকিলে বিবাহ। বিয়ের পরেও বউ বলছে, 'শ্যামল, আজ ভাই মনে করে মাখন আনিস। তাড়াতাড়ি ফিরছিস তো।'

তা হলে, বেশ জমেছে, কি বল?

উঃ টেরিফিক। বোলচাল মারা বাঙালী এখন অন্য প্রদেশের দু'চোখের বিষ।

রকের ভাষায় ফালতু। আগে বড়াই করত, আমরা বড় লিখিয়ে। অন্য প্রদেশ আমাদের কান কেটে দিয়েছে। তামিল, তেলুগু, গুজরাতী সাহিত্য দেখিয়ে দিচ্ছে, ঢাক পেটালে শব্দ হয়, পেটানি থামালে থেমে যায়, পড়ে থাকে ঢাক। আগে বলত, নাটক করি ড্রামায়, স্টেজে বাঙালীর জুড়ি নেই। সে গর্ব গেছে। মারাঠী স্টেজ ম্লান করে দিয়েছে গর্ব। সিনেমায় নেতিয়ে পড়েছে। ট্যালেন্ট নেই। এমন সব প্রোডাকসান নামছে, হাফ ইন্টেলেকচ্যুয়াল, হাফ কমারশিয়াল, হাফ বম্বে, হাফ বাঙলা, সেকস, ভায়োলেন্স কষা কারি, ইন্টেলেকচ্যুয়াল দুম্বা। ভুরু কুঁচকে, হাত মুচড়ে, প্রেস কনফারেনসে হুইস্কির গেলাস নেড়ে যত জ্ঞানই দাও, মালে মাল নেই। মাল ছাড়া পয়মাল দেশেই যত দাপাদাপি গলাটাকে ভারি করে মুখটাকে গম্ভীর করে, একটা কথাই আমরা বলতে শিখেছি কেন কি হয়েছে ? আর তর্কে হেরে গেলে, একটাই কথা, বেশ করেছি। সব গর্ব গেছে মা। এখন সেরা গর্ব—আমি পাড়ার গুরু। অ্যাকসান করি। আমি সেই প্রবাদ খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে।

শোন শোন, এই নিজেকে নিজে গাল দেওয়াও তোদের জাতের ধর্ম। একটা স্টাইল। দেখিসনি—বাঙালী লেখক জাতকে গাল দিয়ে ইংরেজীতে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লিখে বিলেত মাতিয়ে দেশের সম্মান কাড়লে। তোরা বাপু জানিসও বটে। কি করলে কি হয় ভালই জানিস। কায়দার কপিকল বাবা। রাজনীতিটাও তোদের ধার করা। প্যান্টপরা মহাপুরুষ চাই, যে ন্যাপকিনে শৌচ করে। ইজম আর মতবাদ বিদেশী না হলে মনে ভরে না। সুর আর সুরা, দর্শন আর দর্পণ ফোরেন হওয়া চাই। দিশী পদ্মের চেয়ে বিদেশী লিলি অনেক ভাল। ব্যাজোর ব্যাজোর না করে, রেল কম্পানীর টিকিট কেটে বিদেশ বেড়িয়ে আয়। আমাকে নিয়ে যারা নাচে, তাদের নাচতে দে। আমি জানি রে ব্যাটা। দুর্গা আঁতেল দেবী নয়। তোরা বড়দিনে পার্কস্ট্রিটে নাচতে যা।

মা জ্বালা করছে

সংসারে জ্বালার শেষ নেই। এক তো হিয়া কা মাল হুঁয়া হয়েই আছে। কে যে করে ধরার উপায় নেই। চিরুনি কোথায় গেল কেউ জানে না। সবাই বলবে, ওই তো আয়নার কাছেই ছিল, বুরুশের বুকে মুখ শুঁজে পড়ে ছিল। আগে চিরুনির পুংলিঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গ ছিল। এখন স্ত্রীং পুং এক হয়ে লিঙ্গহীন। ছেলেদের সব লম্বালম্বা বিট্‌লেদের মত চুল হয়েছে। ছেলেরাও আজকাল মেয়েদের চিরুনিই ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। সরু দাড়া চুলে পথ পায় না। স্লিপ করে বেরিয়ে যায়। অফিস-টফিসে দেখি হিপপকেট থেকে হাফ হাত চিরুনি বেরিয়ে আসছে। কেয়ারির ঠেলায় অন্ধকার। চুল আজকাল আর কাটতে হয় না। ড্রেসিং। খরচও কম নয়। ছটাকা থেকে দশটাকা। যে সেলুন যেমন কামিয়ে নিতে পারে। কানের কাছে কাঁচির বাদ্যি। দশ টাকা গলে গেল। চুল যেমন তেমনি রইল। আজকাল আবার চান করেই চুল আঁচড়ানো চলে না। ফেলে রাখতে হয় ঘণ্টা খানেক। কি জ্বালা। কত রকমের নিয়ম বাবা। বাড়িতে ভাত খাওয়া অফিসে জল। এতে নাকি হজম ভাল হয়। বাড়িতে চান অফিসে চুলের কেয়ারি। স্বরাজ হয়ে সুবিধে বেড়েছে। একবার চাকরিতে ঢোকা, তারপর আর পায় কে। জ্বর হয়েছে সৌরভের। প্রশ্ন করা হল, 'এলেন কেন অফিসে ?' বল্লেন, 'এখন রেস্ট নেবার জায়গা পাবো কোথায় ।!' তা ঠিক বাড়িতে থাকলেই খেটে মরতে হয়। চা খাও। চুল আঁচড়াও। গল্প গাছা করে কেটে পড়। যে কোনও অফিসে একজন কি দু'জন খেটে মরেন বাকি সবাই সেই মূর্খদের কাঁধে রেখে বন্দুক দাগেন।

ফ্যামিলিতেও তাই। একজন খেটে মরে, বাকি সবাই ন্যাজ নাড়ে। একজন গোছায়, পরিষ্কার করে, যেখানকার জিনিস সেইখানে রাখার চেষ্টা করে, বাকি সবাই এলোমেলো করে দেয়। হিয়া কা মাল হুঁয়া। কিছু বলতে গেলেই অশান্তি। চিরুনি বেরলো টেস্টপেপারের ভেতর থেকে। একালে চুলে তেল দেবার চল নেই তাই বাঁচোয়া, নইলে টেস্টপেপার অয়েলপেপার হয়ে যেত। রোজই ফাটাফাটি। কে চুল আঁচড়ে চিরুনি থেকে চুল ছাড়ায়নি। কে সে!

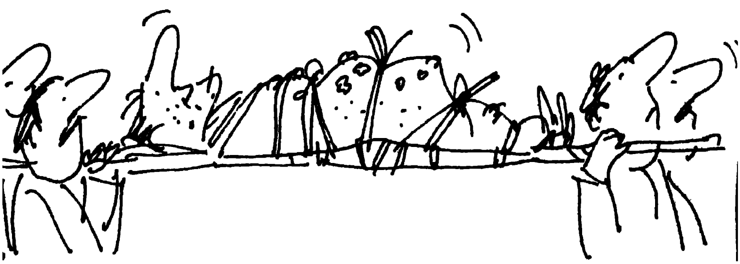
মেয়ে বলছে, 'মা তুমি। মা বলছে, 'না তুই। হাতা হাতি শুরু হয় আর কি! শেষে বলতে হয়, 'দোহাই বাবা, তোমরা চুপ করো। ফোরেনসিক-এ খবর দিচ্ছি, চুল অ্যানালিসিস করে বলে দিয়ে যাক—কার চুল? মায়ের না মেয়ের!

সাবানদানিতে জল। সেও এক জ্বালা। চৌকো রসমালাই। কার কীর্তি? কেউ জানে না। সাবানের যা দাম, এমন আরক হয়ে বসে থাকলে সংসারে যে লাল-বাতি জ্বলে যাবে ভাই। 'তোমরা একটু দ্যাখো না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'তোমার লবাব পুত্র, তোমার আদুরী কন্যাকে বলো।' বলাবলির মধ্যে নেই বাবা। বেশ জানি, 'কথায় কথা বাড়ে, টাকায় বাড়ে সুদ।' সংসার হল মৌচাক। মধুও আছে, হুলও আছে। খোঁচাখুঁচি করেছ কি মরেছ। ঠাকুরের কথা মেনে চলাই ভালো—পাঁকাল মাছের মতো থাকো। কচ্ছপের মতো থাকো। পিছলে পিছলে বেড়াও। স্লিপারি। গীতাও বলেছেন উদাসীনের মতো আচরণ করো। দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না। কেবল স্ত্রীর কথা শোনো। ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক।

তেমন কোনো সংসার-সমুদ্র পারকারী মহাপুরুষ থাকলে সংসারীদের জন্যে নতুন একটি গীতা-রচনা করতেন এই ভাবে :

শৃন্বন্তু বিশ্বে স্ত্রীয়াস্য স্বামী
পুত্রস্য পিতা
কম মাইনেস্য সরকারী চাকুরে ॥

কর্মযোগ : বৎস! কর্মযোগ হল, মুখ বুজে, বিনা প্রতিবাদে, বিনা অভিযোগে



সংসারের জন্যে করে যাও। ফলের প্রত্যাশা কোরো না। আদমই আপেল পেড়ে ইভকে খাইয়েছিল আর সেই শুরু। যুগ যুগ ধরে ইভরা বলে চলেছে—

'ধিনতাকের ব্যাটা তিনতাক
তুই দিতে থাক আমি খেতে থাকি
ধিনতাকের ব্যাটা তিন তাক ॥'

তোমার কাজ হল ফ্যুয়েল সাপ্লাই করা। ফ্যুয়েল হল কারেনসি নোট। ধারে খাটালে সুদ পেতে। সংসারে ঢাললে শুধুই উড়ে পুড়ে যাবে। অনুশোচনা কোরো না। রামকুমারবাবুর রেকর্ডটি কিনে আনো। সকাল সন্ধে বাজাও :

টাকা মাটি মাটি টাকা
আজিকে মন্ত্র নিলাম।
চাওয়া-পাওয়া সব ভুলে মা,

পরের লাইনটি রেকর্ডে আছে, তোর পায়ে আজ শরণ নিলাম। ওই লাইনটি বদলে দে, বল—ভূতের বেগার খেটে গেলাম। শেষ লাইনটা মনে মনে বলবি : মরণকালে ধুনি ছাড়া রবে না তো কিছুই পাশে। কর্মযোগ মানে জলযোগ নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে—জগজ্জননী খেতে দাও, তা হবে না। নির্জলা নিষ্ফলা কর্ম করবে। ফলাকাঙ্ক্ষা করবে ন। কেউ তোমাকে চাকাচাকা করে আপেল কেটে দেবে না। এগিয়ে দেবে না মিছরির পানা। একবারের বেশি দুবার চা চাইলে ভুরু কুঁচকে তাকাবে। শ্বশুরবাড়ির



সম্বন্ধী এলে হেসে হেসে, ফুল খেলে গুলশান গুলশান। চায়ের ফোয়ারা ছুটবে। হিংসে কোরো না। হিংসা তামসিকতা। সংসারের ওপর বিশ্বাস রাখো—তোমার সঙ্গে কথার খেলাপ করবে না। যখন তুমি খাবি খাবে, কেউ তোমার মুখে এক চামচে পানাপুকুরের জলও দেবে না। বেশ কিছু রেস্তো রেখে যাচ্ছ জানলে, তোমার পুত্র দরাদরি করে একটি খাট কিনে আনবে। নয়তো সেই চারচালা। নারকেল দড়ির বুনোনের ওপর শুয়ে, ফ্ল্যাট হয়ে, আকাশ দেখতে দেখতে, দুলতে দুলতে, ব্যালো হরি শুনতে শুনতে চলে যাও চিতার দিকে। কোনও প্রবীণ তোমার পুত্রকে হেঁকে বলবেন, 'বাবা মৃদঙ্গমোহন, একটু দুলকি চালে নিয়ে যা বাপ, তোর বাপের মাথাটা যে আসছে বছর আবার হবের ছন্দে চ্যাকের চ্যাকোর দুলছে।' ছেলে যে বেজায় বিরক্ত—কানে কথা ঢুকছে না। মৃদঙ্গমোহন মধুমালতীকে নিয়ে নাথবতী অনাথবৎ দেখার টিকিট কেটেছিল। বুড়ো ব্যাটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করলে।

বৎস! দুঃখে কোরো না। সখা কৃষ্ণকে স্মরণ করো, ভাবতে পারো, যাঁর শতেক গোপিনী, সারা জীবন যিনি যমুনা-পুলিনে বাঁশী ফুঁকে ফুঁকে লাভস লঝ্ঝরে করে ফেললেন, তাঁর শেষটা একবার ভেবে দ্যাখো। কি বিষণ্ণ মৃত্যু। কেউ নেই পাশে। কোথায় রাধিকে, কোথায় গোপিনী। গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। নিচে নামার ভরসা নেই। নিউ জেনারেশান বোতল বগলে বসে আছে। প্রকাশ্যে মদ্যপান, বেলেল্লাপনা, মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি। সে এক কেলেঙ্কারি। হই হই চিৎকার। চুল্লু লে আও, চুল্লু। সাট্টা চালাও সাট্টা। নিচে পঁচাশির পশ্চিমবঙ্গ, গাছের ডালে শ্রীকৃষ্ণ। আর একটু পরেই তীর এসে লাগবে পায়ে। মন্দ না, ব্যালকনিতে নেতা, তলায় জনতা, আর শেষটা সে তো মহাভারতেই রয়েছে।

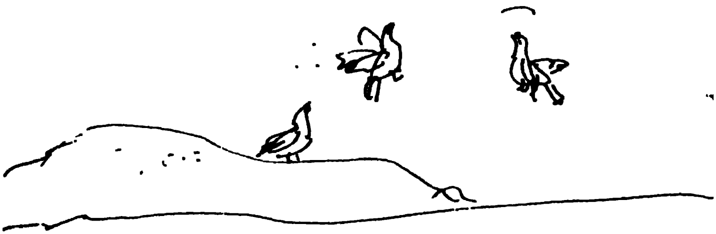
বৎস ঘাবড়ো না। সব পিতারই এই শেষ। পিতা শব্দটি এসেছে পেড়ে ফেলা থেকে। চিৎ করে ফেল আর দাড়ি ওপড়াও। বৎস! মনে রাখ, সব পুত্রকেই পিতা হতে হয়। সব নেতাকেই অবশেষে জন নেতা হতে হয়। মা ভৈঃ॥

কে তিনি

ঈশ্বরকে দেখিনি। কোনও দিন দেখাও হবে না। মৃত্যুর পর তাঁর দরবারে হাজির হবার আশাও নেই। ভায়া যমরাজ যেতে হবে। তিনি পত্রপাঠ সোজা নরকে ডেসপ্যাচ করে দেবেন। পাপের যা বহর। বাঁচার জন্যে কি না করেছি। রাইট অ্যাণ্ড লেফট মিথ্যা বলা। ধাপ্‌পা মারা। ছোটখাটো চুরি জোচ্চুরি। নির্যাতন। এমন কোনও বিবাহিত ব্যক্তি আছেন কি, যিনি স্ত্রী নির্যাতন করেননি! কিড়িরমিড়ির কথা। অন্তর টিপুনি। ঠেস মারা। সন্দেহ্ করা। হিসেবের গোলমাল হলেই প্রশ্ন করা—'তুমি আমার পকেট থেকে টাকা সরিয়েছ?' নিজের মাথার ঠিক নেই। হুঁসো! কোথায় কি করে বসে আছি। নিজেই খরচ করেছি, মনে নেই। সন্দেহ্ স্ত্রীকে। কেন? এত অবিশ্বাস কেন? এর নাম প্রেম! পুত্রকে বঞ্চনা করেনি এমন পিতা কমই আছেন। জামাকাপড় কেনার সময় নিজের জন্যে বেশি দামের, পুত্রের জন্যে কম দামের। স্ত্রীর জন্যে পুজোয় সাতশো কি হাজার টাকা দামের শাড়ি। কারণ সেখানে 'গিভ অ্যাণ্ড টেকে'র ব্যাপার। তুমি আমাকে প্রেম করো আমি তোমাকে প্রেম করিব। স্ত্রীতো আর শ্রীচৈতন্য নন, যে জগা-স্বামীকে, 'মেরেছ্ কলসির কানা' বলে ঝাপটে ধরবেন। সেখানে আয়নার মুখ দেখাদেখি। তোয়াজে না রাখলে মুখ তিজেল হাঁড়ি। সে হাঁড়িকে তো আদর চলে না। তাই মেওয়া আর মোহনভোগের ব্যবস্থা। পুত্র-কন্যার বেলায় ছলের অভাব নেই। তুমি ছাত্র, তোমার তো কাপ্তেনী চলবে না। প্লেন-লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং। নিজের রোজগারের পয়সায় কাপ্তেনী কোরো। কেউ কিছু বলবে না। ওভাবে কি হয়! মোটা জামাকাপড়, ভাত-ডাল, সংসারের সকলের জন্যে চালু না করলে আদর্শ বজায় থাকে না। ওকে আদর্শ বলে না। বলে ছলনা। আমাদের দেশের গণতন্ত্র আর সংবিধানের মতো। অফিসে টিফিনের সময় কাটলেট সাঁটাবো আর বাড়ির ব্যবস্থা পোস্ত, আলুভাতে, সন্ধেবেলায় ভালো মানুষের মতো মুখ করে বাড়ি ঢুকবো, আর বলব, উঃ খেটে খেটে জীবন গেল, একে বলে বঞ্চনা, অভিনয়, নিষ্ঠুরতা, উদাসীনতা।

পাপের শেষ নেই। এই মনে ঈশ্বরের দেখা মিলবে না। মন আর মুখ এক

করতে হবে। আদর্শের বাইরের ঘর ভিতরের ঘর নেই। একেবারে চণ্ডীমণ্ডপ। লুকোচুরি চলে না। ঈশ্বরের খাসমহল তো আর পার্লামেন্ট, অ্যাসেম্ব্লি নয় যে গলাবাজি করে এম পি, এম এল এ হয়ে ঢুকে পড়ব ! সে বড় শক্ত ঠাঁই। ঈশ্বর মন দেখেন। আর মন ! কলকাতার আবর্জনার ডাম্পকেও হার মানায়। গো-ভাগাড়। ভাগ্যিস ইউনিভারসিটি ভদ্দর লোক বলে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছিল ! আর ভাগ্যিস, ঈশ্বর মন লুকিয়ে রাখার জন্যে মানুষের দেহ দিয়েছিলেন, নয় তো গাধাতেও লাথি মেরে যেত। করুণাময় ঈশ্বর ! ক্যামোফ্লেজের ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন। ভেতরটা কে আর দেখতে পাচ্ছে ! বাইরে সবাই মানুষ। জামা-পেণ্টুল পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্যাটম্যাট করে।



পিটপাট ইংরেজী ঝাড়ছে।

বলে, বাঁচতে বাঁচতে পাপস্খালন হয়। বাজে কথা। যত বাঁচা যায় ততই মনটা দরকচা মেরে যায়। লাজলজ্জা, কোমল অনুভূতি, আদর্শ সব নষ্ট হয়ে যায়। তখন শুধু ভোগ আর উত্তেজনা। মন অন্য কিছুতে আর জাগতে চায় না। তারপর ব্যাটাকে রোগে ধরে। সংসারের ব্যাক-লগ। যৌবনে, মধ্যবয়সে ওড়ালে, পোড়ালে। নিজে বোতল মারলে আর স্ত্রী সামলালে ম্যাও। রোগে ধরলে সাত খুন মাপ। ডাক্তার বদ্যি, ওষুধ-বিষুধ। স্পেস্যাল ডায়াট। বাবা ! ফ্যামিলির আরনিং মেম্বার বলে কথা। রোগে ধরলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। প্রভু ! দেহ দিয়েই তো ভোগ করতে হবে। যৌবন, মদমত্ত যৌবন আমার ফিরিয়ে দাও



দয়াময় । তা কি হয় ! শুরুতেই দয়াময়ের রাস্তা না ধরলে, শেষকালে তিনি আর সাড়া দিতে চান না । ভাগ্যটাকে হয় প্রথম থেকেই তাঁর হাতে তুলে দিতে হয় নয়তো নিজেকেই নিজে তৈরি করে নিতে হয় । হয় বিশ্বাস, না হয় পুরোপুরি অবিশ্বাস । অবিশ্বাসীর রাস্তা বড় কঠিন রাস্তা । নিজেকে ঠিকঠিক ধরে রাখতে না পারলে একেবারে তালগোল । তখন ধুলো ঝেড়ে কোলে নেবার কেউ থাকবে না । বিদায়ের বেলাটি বড় করুণ হবে । অসম্ভব সংযম আর আত্মবিশ্বাস না থাকলে অবিশ্বাসীর শেষটা বড় ক্যাডাভ্যারাস ।

প্রথম থেকেই নিজের হাত তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলে বড় শান্তি । তিনি কে তা আমি জানি না । তবে এইটুকু জানি, তিনি এক জ্বলন্ত বিশ্বাস । তিনি আছেন, তার মানে আমি আছি । এই ভীষণ অনিশ্চিত এক পৃথিবীতে ক্যালকুলেশান চলে না । নিয়তির নিষ্ঠুর হাতুড়ি কখন আচমকা নেমে আসবে জানা নেই । এই সব আছে, এই আবার কিছুই নেই । এই বসে আছি গদিমোড়া চেয়ারে, মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন, এই পড়ে আছি ফুটপাথে । হিসেবের জগৎ এই অ্যাতোটুকু । বেহিসেবের জগৎ বিশাল বিপুল । চোখ দিয়ে কত দূর দেখা যায় । বুদ্ধি দিয়ে কতটুকু মাপা যায় ! শক্তি দিয়ে কতটুকু ধরা যায় ! তার চেয়ে, তোমার কর্ম তুমি করো মা !

এই মা, আমার আত্মবিশ্বাস ! হয়তো কিছুই নয়, তবু আমি একটা নির্ভরতা বোধ করি, নির্ভয় হতে পারি । আমার সহনশীলতা বাড়ে । আমার চঞ্চলতা কমে । আমার মনে হতে থাকে—কাম হোয়াট মে । যা হবার হোক । যা আসার আসুক । আমি ধরে আছি । কাকে ধরে আছি ? হয় তো নিজেকেই ধরেছি । সেই ধরায় সহজে আমি টলি না । ভাঙি না । দোমড়াই না । বিপথে যাই না । কি আমার পথ, কি আমার বিপথ, তা আমি নিজেই বুঝি । আমি জানি—আমার একটা লক্ষ্য আছে—সে লক্ষ্য হল নদীর মত মোহনার দিকে চলা—'হেসে কলকল, গেয়ে খলখল, তালে তালে দিয়ে তালি ।'

বিশ্বাসই আমার আনন্দ । বিশ্বাসই আমার শান্তি । বিশ্বাসই আমার রক্ষাকবচ ।

জানা অজানা

আমি একজন মানুষ। এই রকম মানুষ আরও কোটি কোটি গোটা পৃথিবীর গায়ে আষ্টে-পৃষ্টে বিজবিজ করছে। আমি কিন্তু আমাকে নিয়েই ব্যস্ত। সময় সময় মনে হয় আমি একাই মানুষ। ঈশ্বরের ওয়ার্কশপ থেকে এক পিসই বেরিয়ে এসেছিল। আমি খাবো, আমি পরবো, বেড়াবো, ঘুরবো, বকব, ধমকাব, ভোগ করব, চটকাবো, জ্ঞান দোবো, থুতু ফেলবো, নোংরা করব, নোংরামি করবো। সব আমি। আমিকে ঘিরে জগৎ ঘুরছে বনবন করে। আর আমি আমার দুর্বল হাত দিয়ে সব আঁকড়ে, আঁকড়ে ধরতে চাইছি। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ। গাড়ি, বাড়ি, নরম বিছানা, পাশবালিশ, মাথার বালিশ। সবই পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে আরও করিতকর্মার দখলে। শেষ পর্যন্ত, ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরি, কামড়া কামড়ি, আঁচড়া আঁচড়ি করে করে ক্লান্ত হয়ে একদিন বুঝতে পারছি—আমি অনেক মানুষের মধ্যে একটি মানুষ। যেমন অনেক বেড়ালের একটি বেড়াল, অনেক কুকুরের একটি কুকুর। কুকুরের ভাগ্য, বেড়ালের ভাগ্যের মতো, মানুষেরও ভাগ্য বলে একটা জিনিস আছে। আমি যখন হেলেদুলে, কেতা দেখিয়ে, কায়দা করে রাস্তা হাঁটি যারা আমার নাম জানে না, তারা বলে, একটা লোক যাচ্ছে। কি রকম লোক ! বেঁটে মতো, কালো মতো, রোগা মতো, টেকো মতো। যারা নাম জানে, তারা বলবে, ওই যে জগা যাচ্ছে। জগা বোস। মোড়ের মাথায় হলদে বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকে। ইনসিওরেনসে চাকরি করে। একটা ছেলে আছে, একটা মেয়ে আছে। ব্যাটা ধান্দাবাজ। খুব বোলচাল ব্যাটার। বড় বড় কথা। মানুষ থেকে বিশেষ একটি মানুষ হয়ে গেলুম জানা মানুষের চোখে। নাম, পদবী, ঠিকানা, পেশা, স্বভাব-চরিত্র নিয়ে আলাদা একটা ইউনিট। ওরা আমাকে আলাদা করার চেষ্টা করবে, আমিও আমাকে আলাদা করে রাখবো।

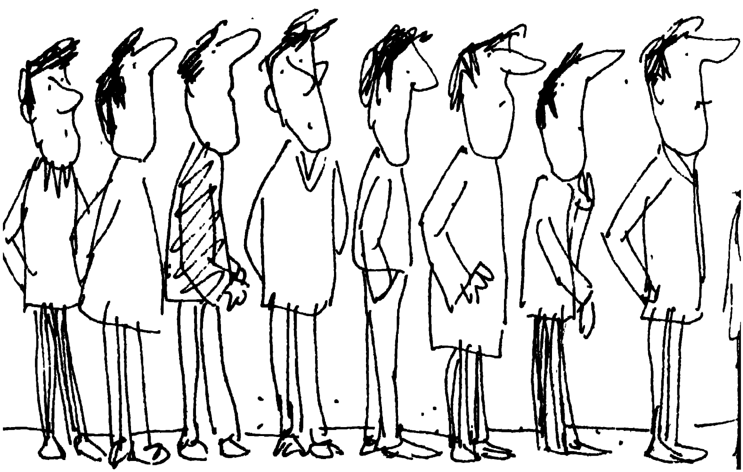
অথচ সাধারণ একটা ভাগ্য আমাদের সকলের ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। সেই পরিণতির উপর আমাদের কোনও হাত নেই। ভাগ্যের গামলায় আমরা রসগোল্লার মতো গিজগিজ করছি। মহাকাল

হাত বাড়াবে আর টপাটপ মুখে ফেলবে।

এইবার প্রশ্ন, ভাগ্য কি ? জীবনের প্রথম দিকটায় আমরা যখন নেশার ঘোরে মদমত্ত, তখন বলি ভাগ্য আবার কি। ভাগ্য কি, সেটা বোঝা যায় জীবন নিয়ে বেশ কিছুদিন ঘষটাবার পর। ভাগ্যের কিছুটা আমরা নিয়ে আসি। কিছুটা তৈরি করি আর বেশ কিছুটা ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে বসে।

কেউ জন্মায় রাজার ঘরে, কেউ জন্মে মরে চাকরের ঘরে। করার কিছু নেই। আমরা কেউই নিজের ইচ্ছেয় পছন্দ মতো ঘরে জন্মাতে পারি না। আমাদের যে যেখানে পারে টেনে আনে। ধনীর ঘরে জন্মালে প্রথম দিকটায় জমে ভাল। বেশ সুখে আর ভোগে থাকা যায়। মোটাসোটা, গাবলু গুবলু চেহারা হয়। হোক না হোক জবরদস্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়। তারপর বড় হয়ে বাপের বিষয়সম্পত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতেও পারি, আবার ফুঁকেও দিতে পারি। বড় হলে নিজের ভাগ্য কাজ শুরু করে। তখন ভাগ্য আর প্রবৃত্তিতে বিশেষ তফাৎ থাকে না। ওড়াবো, উড়বো, এ হল প্রবৃত্তি।

গরিবের ঘরে জন্মালে, সমস্যা নিয়েই জন্মানো। বহুত ঠেলাঠেলি করে উঠতে হবে বাঁচতে হবে। অন্য কোনও পথ নেই। অনেকটা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানর মতো। প্রখর বুদ্ধি আর খুব খাটবার ক্ষমতা থাকলে, যা হয় একটা কিছু হবে,



তবে বর্তমান পৃথিবীতে জাত বলতে যা বোঝায়, সেই জাতে ওঠা হয়তো যাবে না, যাকে বলে বড়লোকের জাত। জন্মসূত্রে পাওয়া ভাগ্য যাকে শাস্ত্র বলছেন প্রারব্ধ, সেই প্রারব্ধের হাত এড়ানো যায় না। কেউ জন্মেই লাখোপতি, কেউ জন্মেই শূন্যপতি।

বোকা, হাবা, গবা, 'ডান্‌স' হয়ে জন্মালে তো কথাই নেই। বীরের পৃথিবী, ধূর্তের পৃথিবীতে হামা দিয়ে বাঁচতে হবে। একে ভাগ্য বলব না মেকানিক্যাল ডিফেক্‌ট বলব জানি না। 'জেনেটিক'-ইঞ্জিনিয়াররা বলবেন, খুঁজে দেখ—ভাগ্য নয়, এ হল তোমার পূর্বপুরুষের দায়িত্বহীনতা। একটা ডিফেকটিভ জিন ঘুরতে ঘুরতে কোনও এক পুরুষে, কোনও এক সন্তানের ঘাড়ে এসে চেপেছে। তাই হয় সে পাগল, নয় সে জড়বুদ্ধি, নয় সে বিকলাঙ্গ। করার কিছু নেই। অতীত বর্তমানের ঘাড়ে এসে চাপলে কি আর করা যাবে!

ভাগ্য এক জটিল জগা-খিচুড়ি। ইতিহাস, অর্থনীতি, জাতীয় চরিত্র, সমাজব্যবস্থা, আমাদের অতীত, আমাদের বর্তমান, স্থান, কাল সব মিলিয়ে এমন এক জিনিস, এমন এক তালগোল, একটা থেকে আর একটাকে সহজে ছাড়ানো যাবে না। ছাড়াতে পারলে জোর গলায় বলা যেত ভাগ্য বলে কিছু নেই।



মানুষের ভাগ্য মানুষ নিজে। যেমন সায়েবরা বলে—ম্যান ইজ দি মেকার অফ হিজ ওন ফেট।

প্রথমে আবার সেই আমি। শুয়ে বসে গালগল্পে যৌবন ম্যাদা মেরে গেল। হ্যাহ্যা করে কেটে গেল জীবনগঠনের কাল। রোজগারপাতি নেই, স্থায়ী জীবিকা নেই, দুম্ করে এক বিয়ে। এসে গেল অষ্টগণ্ডা পঙ্গপাল। নিজের ভাগ্য ঘোরতর দুর্ভাগ্য হয়ে বর্তে গেল বংশধরদের ঘাড়ে। প্রবীণ বয়েসে ছেঁড়া ট্যানা পরে বসে বসে দেখ—মেয়ে গেল নাচতে, ছেলে গেল ভাঙতে। হাঁপাও আর দ্যাখো আর বলো, সবই ভাগ্য।

প্রথমে দেশ ও জাতির ভাগ্যের সঙ্গে জড়াল নিজের ভাগ্য। যেমন কলকাতায় জন্মে কি হল! পথ দুর্ঘটনায়, বাস থেকে পড়ে মরার যোগ বেড়ে গেল। সম্ভাবনা একশোতে এক তো বটেই। শ'খানেক বার বাসে ওঠা নামা করায় একবার অন্তত মরতে মরতে বাঁচা। হয় তো কম করে বলা হল। সম্ভাবনা আরও বেশি। হয়তো একে এক। পড়ে না মরাটাই ভাগ্যের ব্যাপার।

যেমন এ দেশে মেয়েদের বউ হওয়া মানেই নির্যাতিতা হয়ে মরা। না মরাটাই অ্যাকসিডেন্ট। যেমন, এদেশে চাকরিবাকরি না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এদেশে জন্মানো মানেই ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো। এদেশের চাকরি মানেই—আজ আছে কাল নেই। চাকরি মানে ডিসগাইসড অ্যান এমপ্লয়মেন্ট। মানুষের মতো বাঁচতে হলে যা মাইনে হওয়া উচিত, যা উপার্জন করা উচিত, তা হবে না। ওই কোনোরকমে দিন আনা দিন খাওয়া। কাছা দিলে কোঁচা হবে না। নুন আনতে পান্তা ফুরোবে। এই আর কি।

এই ভাগ্যের সঙ্গে সিকি পরিমাণ নিজের ভাগ্য জুড়ে তৈরি হল জীবন। এইবার সেই জীবন জড়াল অন্য জীবনের সঙ্গে। ফলে ভাগ্যের সিঁড়ি এই ভাবে নামছে—ভাগ্য, দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগাতর, দুর্ভাগাতম। কেউ একটু ভাল আছি, ভাবছি আর কি! আসলে ভাগ্যের ঘেরাটোপে মানুষ নামে যে প্রাণী, তার জীবন বড় অনিশ্চিত।

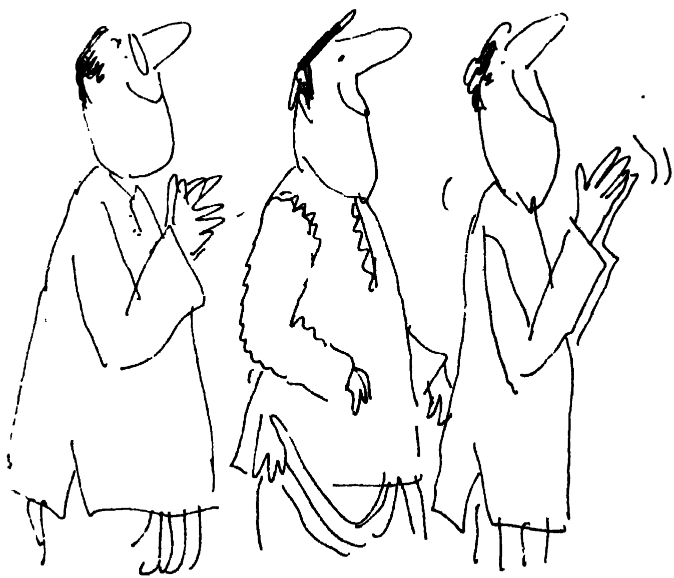
কয়েক ফোঁটা তেল

জামাইষষ্ঠীর বদলা হল ভাইফোঁটা। ষষ্ঠীতে বাবাজীবন ফাঁক করে দিয়ে গেছেন, এইবার বাবাজীবনের পালা। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে তিন শ্যালক হাসি হাসি মুখে টেরি বাগিয়ে হাজির। 'আরে এসো এসো'। কোমর বেঁধে বোন ঘুরছেন। চরকিপাক খাচ্ছেন। কি আনন্দ! বড়দা, মেজদা, সেজদা তিন দাদাই এসেছেন—একেবারে চূড়ামণি যোগ। সোমবার পূর্ণিমা, লক্ষ্মীপূজা আবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। বড় বাইরেই থাকেন। কোনোবার আসেন না, এইবার এসে পড়েছেন। কি ভাগ্য! মেজদা ছুটি পায় না, এ বছর পেয়ে গেছেন, কি ভাগ্য! বড়দার সুগার। তিনি আবার খাজা, গজার ওপর ফোঁটা নেবেন না। সোয়াবিনের পকোড়া সহ ফোঁটা। এই হল প্রাথমিক পর্ব। এরপর যা হবে সব প্রোটিন। মাছ-মাংসের খেলা। ফাইন ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবির কাপড়। প্রথামত প্রণামী।

টানাটানির সংসারে একটু বাড়তি চাপ পড়ে যায় ঠিকই; তবে বড় আনন্দের। এই মেলামেশা, ভাব ভালোবাসা। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক তো শুকিয়ে চামচিকির মতো হয়ে গেছে। পথেঘাটে তো বেরোবার উপায় নেই। দু পা চলতে না চলতেই ঠোকাঠুকি। এক তো সংখ্যায় আমরা এমন বেড়েছি, পোকার মত গিজগিজ করছি। পোকার তেমন বোধ নেই, ভাষা নেই, আমাদের বোধ আছে, ভাষা আছে। সেইটাই সমস্যা। খেয়োখেয়ি, খোঁচাখুঁচি লেগেই আছে। একালের একটিই কথা—'কেন?' কেন সরাবো? কেন তোমাকে আগে যেতে দেবো? কেন তোমাকে আগে নিতে দেবো? আর একটি কথা, 'কে তুমি হরিদাস পাল?' রামের চোখে শ্যাম হরিদাস পাল। শ্যামের চোখে রাম। হরিদাস পালের সংসারে যে সব ভালো ভালো মানবিক-বৃত্তি ছিল সব ড্রাই হয়ে গেছে। এ সব নিয়ে কেউ আর মাথাও ঘামায় না। মাথা ঘামাবার ব্যাপারও নয়। যে ভাবে হোক বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। সে বাঁচার আনন্দ থাক আর না থাক কিছু যায় আসে না। বাঁচার চার্মটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সব যেন মেকানিক্যাল। বিছানা ছেড়ে ওঠো। যা হয় কিছু বাজার করো। হাঁসফাঁস

গেলো। ছোটো কর্মস্থলে। ফিরে এসো। চার দেয়ালের সংসারে। এর অ্যানিমিয়া। ওর ডায়েরিয়া। নিয়মমাফিক পরচর্চা। অন্যের উন্নতির কথা ভেবে ঈর্ষার মৃদু আঁচে তন্দুর হতে হতে ঘুমিয়ে পড়া।

বেঁচে থাকার এই একপেশে ব্যবস্থায় ভালো লাগার উপাদান হল, ইলেকট্রনিক্স—টিভি, টেপ, ট্র্যানজিস্টার। হালকা সাহিত্য। হালকা ছাড়া অন্য কিছু মাথায় ঢুকবে না। ভালো লাগবে না। হাই উঠবে। সাধ্য-সাধনার যুগ চলে গেছে। যা সেধে রপ্ত করতে হয় তা দূরেই থাক। সেই কারণে সঙ্গীতের এই হাল। সুন্দর কণ্ঠের অভাব নেই ; কিন্তু গান যেন কুস্তি ! গোট দশেক বাজনা আর গাইয়েতে মিলে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই। ভঙ্গিটা 'আয় ব্যাটা মেরে শেষ করি।' ঢিমে তালের সুরেলা সঙ্গীত আমাদের ঝিম মারা জীবনকে নাড়া দিতে পারে না। সহজ সুর কেটে গেছে, চাই অসুস্থ উত্তেজনা। দুলকি চালের ঠুংরি শুনে বলবে—কি প্যানপ্যান করছে ! আর আকাশ বাতাস ফাটানো 'রামা হো হো





হোঃ শুনে প্রবীণও দুলে উঠছেন। রেকর্ড-প্লেয়ারের ওয়াটেজ বাড়ছে, বাড়ছে স্পিকারের আকার-আকৃতি। এক একটার বাঘের খাঁচার সাইজ। ফুল ভল্যুমে চললে গায়ে চুন-বালি খসে খসে পড়বে। জগৎ সংসার এবং নিজেকে ভুলে থাকার শ্রেষ্ঠ উপায় হল, তালগোল পাকিয়ে থাকা। শব্দ এই ব্যাপারে ভীষণ সাহায্য করতে পারে। স্নায়ু উত্তেজিত হতে হতে এমন একটা অবস্থায় আসবে যে সময় মানুষকে বলা যায়—এই ছেলেটা ভেলভেলেটা। ঘোরলাগা অবস্থা। হোলির সময় যেমন ঢোল বাজাতে বাজাতে হয়—খাঁই খ্যাচা, খাঁই খ্যাচা, রামা হো, রামা হো একেবারে অন্য জগতে। শব্দ আমাদের অবশ করে। হার্টফেলও করিয়ে দিতে পারে। যাঁরা জোরে চিৎকার করে কথা বলেন, তাঁরা পরে কালা হয়ে যান।

আমরা তো হাবা, কালা, বোবাই হতে চাই। যে কোন ভালো কিছু শুনতে

চায় না, যে মুখ ভালো কিছু বলতে চায় না, সেই কান আর মুখ থাকাও যা, না থাকাও তাই। পরচর্চা, আর পরনিন্দায় আমাদের মুখ আর কান বড় আনন্দ পায়। আমাদের সংস্কৃতি তাই শলাকার চেহারা নিচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে পুজোর যা চেহারা হচ্ছে! এই যে হালফিল কালীপুজো গেল, এর নাম পুজো। সেই যেমন বলে, লোকটা শেষে কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে মরে গেল, এই জাতটারও সেই অবস্থা যেন—ধ্যাড়াস ধ্যাড়াস করে ফেটে গেল। বাঙালী ফাটছে। ভোর পাঁচটা থেকে মাঝ রাত, লাগাতার তিন মাস ধুমধাম, শুধু বাজি। বাঙালীর আর কোনও কাজ নেই।